বাংলাদেশের
ভূ-রাজনীতি

কয়েকটি সাম্প্রতিক সমস্যা

ট্রানজিট, এশিয়ান হাইওয়ে
দঃ তালপট্টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম
উপ-আঞ্চলিক জোট
বিজাতি-তত্ত্ব
ইত্যাদি

ড. মোহাম্মদ আবদুর রব

পুস্তক পরিচিতি ঃ "বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতি ঃ কয়েকটি সাম্প্রতিক সমস্যা"–ভূ-রাজনীতির উপর এদেশে প্রকাশিত প্রথম বই হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর, এদেশের আবস্থানিক গুরুত্বের কারণে এদেশকে নিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের মধ্যে এক গভীর স্বার্থ-সংঘাতের ষড়যন্ত্র সূচিত হয়েছে। বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌমাঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামকে তথাকথিত "শান্তিচুক্তি"র মাধ্যমে দেশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করার সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। "৩০ বছরের পানিচুক্তি" সম্পাদনের মাধ্যমে ভারতকে আমাদের আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গা-পদ্মার পানির অবৈধ আত্মসাৎকরণকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এখন এদেশের বুকের উপর দিয়ে ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট-এর ছদ্মাবরণে ভারতকে তার বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ উঃ-পূর্ব অঞ্চলের সাতটি ভূ-পরিবেষ্টিত রাজ্যে সৈণ্য, অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যাদি পারাপারের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। এসকল তৎপরতা দেশ ও জাতির জন্য আত্মঘাতি ও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। একই কারণে পরাশক্তি মার্কনিদের খ্রিষ্টবাদী পাশ্চাত্যের সহযোগিতায় বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ. জাতিসংঘ ও এসকাপের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে এশিয়ান হাইওয়ে ও ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়েকে পরিবর্তিত ঘুরাপথে নিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থকে দারুণভাবে আঘাত করার আয়েজনও প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।

www.pathagar.com

এসবই ভারতের স্বার্থে। চট্টগ্রাম বন্দর নিয়েও আন্তর্জাতিক ছিনিমিনি খেলা চলছে। বাংলাদেশের সার্বভৌম সমুদ্রাঞ্চলে জেগে ওঠা গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দঃ তালপট্টি ভারত অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। দেশের সরকার নীরব। জাতি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস, নামমাত্র মূল্যে বিদেশি বেনিয়াদের কাছে বিক্রি করে দেয়ার আয়োজনও প্রায় শেষ। দেশের এ'হেন বিপন্ন পরিস্থিতিতে ড: আবদুর রব-এর কলম থেকে আত্ম-বিস্মৃত নিদ্রা-বিভোর জাতিকে জাগাতে বেরিয়ে এসেছে "বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতি" নামক পুস্তকখানা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতি

[Geo-Politics of Bangladesh]

ডক্টর মোহাম্মদ আবদুর রব
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আদিযা প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ নাসিম আখতার খান
আদিযা প্রকাশনী, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক

প্রকাশকাল ঃ প্রথম সংস্করণ আগস্ট, ১৯৯৯ ইং

প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা ঃ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান
গণ-যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান
ডটপ্লাস লিঃ

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ হক প্রিন্টার্স
১৪৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৩০০৪২

মূদ্রণে ঃ চৌকস প্রিন্টার্স লিমিটেড
১৩১ ডিআইটি এক্সঃ রোড ঢাকা-১০০০,
ফোন-৪১৯৬৫৪

মূল্য ঃ ১৬০ টাকা
US $ 5

প্রাপ্তিস্থান
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Bangladesher Bhu-Rajniti (Geo-Politics of Bangladesh) By Dr. Mohammad Abdur Rob. First Published : August, 1999. Published by Nasim Akhter Khan. Copyright : Author. Cover : Arifur Rahaman. Management : Mohammad Mehedy Hasan. Graphics : Dot Plus. Compose : Haq Printers. Printing : Chowkash. Price : Taka 160. (US $ 5).

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার মরহুম ওয়ালিদ

মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুন্ নূর—

যিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের আজাদি, আবাস ও ইজ্জতের জন্য নিজের রক্ত ঝরিয়েছিলেন এবং বিশ্ব-মুসলমানের হারানো গৌরব ফিরে পাবার জন্য ছিলেন সদা সচেষ্ট।।

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

সমাজতান্ত্রিক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার (Uni-polar Global System) অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে এশিয়ায় ভারত এবং চীন ভবিষ্যৎ নব্য পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে চলেছে। এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্ব যখন একবিংশ শতাব্দীকে বরণ করতে চলেছে, তখন ভারত মহাসাগরের প্রবেশ পথে বঙ্গোপসাগরের উপকূল জুড়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশ তার অত্যন্ত তাৎপর্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য সমগ্র বিশ্বের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর, এদেশের আবস্থানিক গুরুত্বের কারণে এদেশকে নিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের মধ্যে এক গভীর স্বার্থ-সংঘাতের ষড়যন্ত্র সূচিত হয়েছে। বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌমাঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামকে তথাকথিত 'শান্তিচুক্তি'র মাধ্যমে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। '৩০ বছরের পানিচুক্তি' সম্পাদনের মাধ্যমে ভারতকে আমাদের আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গা-পদ্মার পানির অবৈধ আত্মসাৎকরণকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এখন এদেশের বুকের উপর দিয়ে ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট-এর ছদ্মাবরণে ভারতকে তার বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি ভূ-পরিবেষ্টিত রাজ্যে সৈণ্য, অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যাদি পারাপারের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। সরকার জনগণকে ট্রান্সশিপমেন্ট-এর নামে ট্রানজিটকে গলধঃকরণে বাধ্য করার জন্য ট্রানজিট ফি বাবদ প্রাপ্ত কিছু সুযোগ-সুবিধাকে ব্যাপকহারে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে সরকারি ও তাবেদার প্রচার মাধ্যমে মিথ্যা প্রচারণার ঝড় তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। সামান্য কিছু ট্রানজিট ফি'র মুটে-মজুরির বিনিময়ে এর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব তথা রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক, পারিবেশিক পরিস্থিতি ও স্বাস্থ্যের উপর নেমে আসবে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ। এসকল তৎপরতা দেশ ও জাতির জন্য আত্মঘাতি ও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

একই কারণে পরাশক্তি মার্কিনিদের খ্রিস্টবাদী পাশ্চাত্যের সহযোগিতায় বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ. জাতিসংঘ ও এসকাপের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে এশিয়ান হাইওয়ে ও ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়েকে দূরবর্তী ঘুরাপথে নিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থকে দারুণভাবে আঘাত করার আয়োজনও প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এসবই ভারতের স্বার্থে। চট্টগ্রাম বন্দরকে নিয়েও আন্তর্জাতিক ছিনিমিনি খেলা চলছে। বাংলাদেশের সার্বভৌম সমুদ্রাঞ্চলে জেগে ওঠা গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় দ্বীপ দঃ তালপট্টি ভারত অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। ভারতের তাবেদার, স্বার্থরক্ষাকারি ও নতজানু সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব। জাতি

www.pathagar.com

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস নামমাত্র মূল্যে বিদেশি বেনিয়াদের কাছে বিক্রি করে দেয়ার আয়োজনও সম্পন্ন।

দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিয়ে জাতিকে শেকড়হীন, মেরুদণ্ডবিহীন করার জন্য এবং যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য গণমাধ্যম দ্বারা চালানো হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়,১৭৫৭-র পলাশীর বিপর্যয়, ১৮৫৭-র আজাদির জাগরণ ও জিহাদ, বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা লাভ প্রভৃতি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শুধুমাত্র একাত্তরের উপর আলোকপাত করে তরুণ সমাজকে খণ্ডিত ও বিভ্রান্তিকর ইতিহাস শেখানো হচ্ছে। সাতচল্লিশের বাস্তব সম্মত দেশ বিভাগ ও দ্বিজাতি-তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিষবাষ্প ছড়ানো হচ্ছে। যে দ্বিজাতি-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জন্ম হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের এবং এখনো স্বাধীন সত্ত্বায় টিকে আছে।

ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে আমরা দেখেছি কিভাবে একটি মুসলিম জনপদের অধিকাংশকে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে। তারা এখন ইন্দোনেশিয়া থেকে আলাদা হতে চায়। অদূর ভবিষ্যতে ওটি যে 'ইসরাইল' হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সারা বিশ্বে এ প্রক্রিয়া চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকেও পাশ্চাত্য ও তার দোসর ভারত 'ইসরাইল' বানিয়ে এ অঞ্চলে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কসোভোবাসী অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি, আল্লাহ না করুন, সেরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তবে বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দেয়া ছাড়া উপায় থাকবেনা। অথবা গোটা দেশ তখন বধ্যভূমি হবে। হবে আরেক কাশ্মির, কসোভো কিংবা চেচনিয়া-দাগেস্তান।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিল। হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলেছিলেন। তাঁরা আজ শেখ হাসিনাকে শান্তি পুরস্কার দিচ্ছেন। কারণটা খুবই সোজা। তারা যাতে সেখানে নির্বিঘ্নে তাদের আধিপত্যবাদী কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন এবং ভবিষ্যতে আর একধাপ অগ্রসর হয়ে আর একটা চুক্তি-স্বক্ষর করাতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।

দেশের এ'হেন গভীর দুর্যোগময় বিপন্ন পরিস্থিতিতে যেসকল মহান দেশপ্রেমিকগণ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং এই ভূ-খণ্ডের মুসলিম জাতির অস্তিত্ব নিয়ে যারা গভীর চিন্তামগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাদেরকে কিঞ্চিত আশার বাণী শোনাতে আমার এ বই রচনার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

দীর্ঘদিন থেকে ট্রানজিট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, দঃ তালপট্টি ইত্যাদি বিষয়ের উপর বই লেখার জন্য বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে তাগিদ আসছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের আগ্রহে সাড়া দিয়ে আমাকে বইখানা প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হল। প্রকাশনার মূলধন টাকা-পয়সা ইত্যাদির অভাবে প্রকাশনার কাজ বারবার পিছিয়ে যায়।

www.pathagar.com

অবশেষে আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, সুহৃদমহলের মহানুভবতায় এবং তাদের আন্তরিক সহযোগিতায় বইখানা আলোর মুখ দেখল। আমার প্রিয় এসব শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদদের নি:স্বার্থ সহযোগিতায় আমি অভিভূত ও তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্‌ তাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুণ।

বইখানা প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমি আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে যে অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়েছি সেজন্য তাদের ধন্যবাদ। প্রথমেই আমি আমার অতি আদরের অনুজ ডাঃ আব্দুল হাই মিনার, আব্দুল মুজিব গুলজার এবং আব্দুল হাফিজ আব্দার এর কথা স্মরণ করছি। আমার বোন হাজেরা খাতুন (বুবু), সালমা খাতুন (মানি), আমিনা খাতুন (হানি) এবং সা'রা খাতুন (সুহিনী মনি) তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমার স্নেহময়ী জন্মদাত্রী আম্মা মোসাম্মাত সাইফা খাতুন এর দোয়া সবসময় আমার জীবনে চলার পথে অন্যতম পাথেয়। সবাইকে এ প্রকাশনালগ্নে স্মরণ করছি।

আমার সংসার জীবনে ঘুম ভেঙ্গেই যে ক'টি মায়ামাখা মুখ আমাকে জীবনে চলার পথে শক্তি যোগায়, আমার সেই অতি প্রিয় সহধর্মিনী মোসাম্মাত নাসিম আখতার খান (সানি) আমার পুত্র আসিফ, কন্যাদ্বয় দিয়া ও যায়নাবঃ তাদের প্রতিও আমার অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা। মোসতাক, মাহবুব, শরিফ, তারেক, ফারুক–আমার এই স্নেহাস্পদ ছাত্র-গবেষকবৃন্দ যারা গবেষণাগারের দেয়াল ডিঙ্গিয়ে এতদিনে আমার পারিবারিক সদস্যে পরিণত হয়েছে তাদের সহযোগিতা আমাকে অনুপ্রানিত করেছে। তাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহ-মমতা, ইয়াদগারি এবং ভালবাসা।

আমার স্নেহভাজন গবেষণা সহকারি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান দেড় বছর ধরে পড়ে থাকা পাণ্ডুলিপিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে তার পূণ্যময় উপস্থিতি দ্বারা। তার প্রতি আমার আন্তরিক দোয়া ও ভালবাসা। আল্লাহ্‌ তার হায়াৎ দারাজ করুণ। সব শেষে আমি এ বইটির প্রকাশনায় জড়িত কুশলীবৃন্দ হক প্রিন্টার্সের শ্রদ্ধেয় সিরাজ ভাই, চৌকসের সুলতান ভাই, প্রচ্ছদ শিল্পী আরিফ ভাই'র প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্‌ সবাইকে যেন যোগ্য প্রতিদান নসিব করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বইয়ের ছত্রে-ছত্রে যেসব মুদ্রণ-প্রমাদ, ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে তার জন্য পাঠকের কাছে আমি পূর্বেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ্‌ হাফিজ।

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রব
সহযোগী অধ্যাপক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ ঃ আগস্ট ২৪, ১৯৯৯ইং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচী

১. ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিটঃ ভূ-রাজনৈতিক পর্যালোচনা — পৃষ্ঠা ১-৪২

ট্রানজিট ঃ ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত
ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট ইস্যুর ইতিহাস ও ধারা
বিশ্বের নানা দেশের ট্রানজিট ব্যবস্থার উদাহরণ
ট্রানজিট বিষয়ে সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়া
ভারতের ট্রানজিট প্রস্তাবের রূপরেখা
ট্রানজিটের স্বার্থ ও লাভ-ক্ষতি
ট্রানজিটের স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া
ট্রানজিটের রাজনৈতিক ও আইন-শৃংখলা সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া
ট্রানজিটের ভূ-রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা প্রেক্ষিত
চট্টগ্রাম বন্দর ও ট্রানজিট ইস্যু
উপসংহার

২. এশিয়ান হাইওয়েঃ সমৃদ্ধির মহাসড়ক না গোলামির চোরাগলি — ৪৩-৫৮

কী এই এশিয়ান হাইওয়ে
এশীয় মহাসড়কের রূপরেখা
এশিয়ান হাইওয়েতে বাংলাদেশের লাভ-ক্ষতি
পরিবর্তিত এশিয়ান হাইওয়েঃ ষড়যন্ত্রের মহাসড়ক

www.pathagar.com

৩. ট্রানজিট, ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে ও এশিয়ান হাইওয়ে ঃ বাংলাদেশের ও আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির নিরীখে পর্যালোচনা ৫৯–৬৭

৪. দক্ষিণ তালপট্টি বিতর্ক ঃ একটি ভূ-রাজনৈতিক পর্যালোচনা ৬৯–৯০

দক্ষিণ তালপট্টির অবস্থান ও ভূ-রূপতত্ত্ব
দক্ষিণ তালপট্টির ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব
দক্ষিণ তালপট্টি-নিউমূর বিতর্ক ঃ ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস
দক্ষিণ তালপট্টি/ নিউমূর দ্বীপের মালিকানা নির্ধারনে
ভারত ও বাংলাদেশের যুক্তি-পাল্টাযুক্তি
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের মালিকানায় বাংলাদেশের দাবির যৌক্তিকতা
উপসংহার

৫. পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি ৯১–১৩৮

ভূমিকা
পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ভূগোল
পাবর্ত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা-তত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব
জনসংখ্যা তত্ত্ব

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সম্পদ সম্ভাবনা ১০২

ভূমি সম্পদ
কৃষি সম্পদ
মৎস্য সম্পদ
বনজ সম্পদ

www.pathagar.com

খনিজ সম্পদ
জলবিদ্যুৎ
পর্যটন সম্পদ
পাবর্ত্য চট্টগ্রামঃ ভূ-রাজনীতি
ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস

পাবর্ত্য-চট্টগ্রামের বিভিন্ন শক্তির ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ ১২৫
বাংলাদেশের স্বার্থ
মায়ানমারের স্বার্থ
ভারতের স্বার্থ
চীনের স্বার্থ
উপসংহার

৬. সার্ক বনাম উপ-আঞ্চলিক জোট ঃ ভূ-রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের নতুন মাত্রা ১৩৯–১৪৮
ভূমিকা
কী এই উপ-আঞ্চলিক জোট
কেন এ জোট মানা যায়না

৭. গণমাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ পরিপ্রেক্ষিত বিপন্ন বাংলাদেশ ১৪৯–১৫৫

৮. দ্বিজাতি-তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা ১৫৭–১৬১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট : ভূ-রাজনৈতিক পর্যালোচনা

ট্রানজিট ঃ ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

দক্ষিণ এশিয়ার দু'প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিরাজিত অসংখ্য ভূ-রাজনৈতিক সমস্যা এবং বিবাদ-বিসম্বাদের সাথে সম্প্রতি ট্রানজিট সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য এ নতুন সমস্যাটির ইতিহাস বা সূচনা প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পুরোনো-১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসনাবসানের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। ভারতিয় উপমহাদেশের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের স্বতঃস্ফূর্ত দাবি ও সংগ্রামের ফলে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পূর্বাংশে প্রায় হাজার মাইল ব্যবধানে জন্মলাভ করে নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তান। সার্বভৌম পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় অংশ যা পরবর্তীতে 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামে পরিচয় লাভ করে তা বর্তমানে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে সগৌরবে স্থান করে নিয়েছে। আর স্বাধীন বাংলাদেশের এ ঐতিহাসিক অভ্যুদয় ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভক্তি, পাকিস্তানের জন্ম, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ এবং একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাংশে, বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূলে বিশ্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান জুড়ে নিজের সার্বভৌম অস্তিত্বের উপস্থিতিই বর্তমান ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার সকল ভূ-রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও ট্রানজিট সমস্যার মত সকল জটিলতার জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের সার্বভৌম অবস্থানের জন্য বৃহত্তর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতকে, যা ক্ষুদ্রায়তন বাংলাদেশকে প্রায় তিন দিক থেকে স্থলবেষ্টিত (Land Locked) করে রেখেছে, তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি ভূ-বেষ্টিত রাজ্য আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল, মেঘালয় এবং ত্রিপুরার সঙ্গে দেশের বৃহদাঞ্চলের সহজ সংযোগ ও

www.pathagar.com

যোগাযোগ লাভে দারুণভাবে অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই ভারতের ঐ সাতটি অঙ্গরাজ্য, যা 'সাতবোন রাজ্য' বা 'Seven Sister States' নামে পরিচিত, সেগুলো ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার তথা সমস্ত বৃহত্তর ভারত থেকে প্রায় ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা-পরিস্থিতির মত অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থানের জন্যই ভারতের ঐসব রাজ্য কলকাতা, বিশাখাপত্তম বা চেন্নাই (মাদ্রাজ) সমুদ্র বন্দরের সাথে কোন সমুদ্রপথ বা নৌপথ সংযোগের সুবিধা লাভ করতে পারছে না। শুধুমাত্র নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যকার ১৬/১৭ মাইল প্রস্থের বহুল আলোচিত সংকীর্ণ ভূ-খণ্ড 'শিলিগুঁড়ি করিডোর' ভারতের বৃহদাঞ্চলের সঙ্গে ঐ সাতটি রাজ্যের সংযোগ রক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। হিমালয় পর্বতের পাদদেশীয় শিলিগুঁড়ি, দার্জিলিং ও কুচবিহার জেলাত্রয়ের মধ্য দিয়ে দারুণ অসুবিধাজনক ও নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে ঐ করিডোর বা সংকীর্ণ সংযোগপথেই ভারতের নর্থ-ইস্টার্ণ রেলওয়ে ও সড়ক পথে ভারতকে তার প্রায় পাঁচ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত, বিপুল সম্পদ সমৃদ্ধ অথচ দারুণভাবে বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ ঐ সাতটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে হচ্ছে। অবশ্য যুদ্ধের সময় ছাড়া (যেমন-১৯৬৫, ১৯৭১) ভারত বাংলাদেশের উপর দিয়ে নিয়মিত বিমান যোগাযোগ ও পরিবহন বজায় রাখছে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের মধ্যে একমাত্র আসাম ও মনিপুর ছাড়া অন্য কোন রাজ্যেই ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির সময় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। ঐ সব রাজ্যের প্রায় সব ক'টিতেই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা যেমন-অহম, বোড়ো, নাগা, লুসাই, ত্রিপুরা, কুকি, খাসিয়া, মিরি, মিসমী, আভর, চাকমা, গারো, মনিপুরী ইত্যাদি অসংখ্য আদিবাসী ও উপজাতীয় বাস করেন। আসামে ও ত্রিপুরায় বিপুল সংখ্যক বাংলাভাষা–ভাষী মুসলিম ও হিন্দু বসবাস করছে। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও বরাক উপত্যকায় বর্তমানে প্রায় এক কোটি বাংলাভাষা–ভাষী মুসলমান স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তারা আসামের জনসংখ্যার প্রায় ৩৫%-৪০% ভাগ। তাছাড়া 'শিলিগুঁড়ি করিডোর' থেকে শুরু করে দার্জিলিং জেলা ও পার্শ্ববর্তী কিছু স্থান জুড়ে 'গোর্খাল্যান্ড, অঞ্চলে নেপালের গোর্খা উপজাতীয়রা বসবাস করছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সুভাষ ঘিসিং-এর গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন আর স্বাধীনতাকামী

www.pathagar.com

বোড়োদের ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র তৎপরতা ও গেরিলাযুদ্ধ ভারতের ঐ অঞ্চলের বর্তমানের অত্যন্ত নাজুক যোগাযোগ ও সংযোগ ব্যবস্থাকে আরো বিপদাপন্ন ও সংকটময় করে তুলেছে। তাছাড়া রয়েছে নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ভারতের এককালীন জানি-দুশমন চীনের অনিশ্চিত কৌশলগত ও প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি ও তৎপরতার সম্ভাবনা। চা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, ইউরেনিয়াম, পানিবিদ্যুৎ আর বিপুল জনসম্পদে সমৃদ্ধ ঐসব উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো ভারতের মোট জাতীয় রাজস্ব ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে বিপুলভাবে অবদান রাখলেও কেন্দ্র সব সময়ই ঐ অঞ্চলের উন্নয়নে রয়েছে লক্ষ্যণীয়ভাবে উদাসীন। আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল প্রভৃতি অঞ্চলে অস্থানীয় ভারতিয়রা বিপুল বসতি স্থাপন ও জনস্থানান্তর প্রক্রিয়ার (Resettlement and Immigration) মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে এবং ঐসব স্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-স্থাপনা তথা অর্থনীতির সিংহভাগই নিয়ন্ত্রণ করছে হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী, শিখ ও বাঙালি পুঁজিপতিরা। ত্রিপুরা ও অরুণাচলে অস্থানীয়রা স্থানীয় আদিবাসীদের জনসংখ্যাকে পেছনে ফেলে সংখ্যাগুরু হয়ে উঠেছে। চা বাগানগুলোর (প্রায় ৮০০/৯০০ ছোট বড় বাগান) নিয়ন্ত্রণেও রয়েছে অস্থানীয়রা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও ঐ অঞ্চল দারুনভাবে পশ্চাদপদ। ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠরোগ, কলেরাসহ নানা ক্রান্তীয় রোগবালাই (Tropical Diseases) আসাম ও অন্যান্য রাজ্যসমূহের স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে খুবই ভঙ্গুর ও দুর্বল করে রেখেছে। বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় দু' আড়াই গুণ বড় আয়তনের ঐ অঞ্চলে রয়েছে মাত্র ২/৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২/৩টি মেডিকেল কলেজ। বর্তমানের উচ্চতর গণমাধ্যম সুবিধার যুগে ভারতের ঐ অঞ্চলের এমন করুণ পশ্চাদপদতার চিত্র স্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও তরুণ প্রজন্মকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দারুনভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে এবং এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদলে আসামসহ সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শুরু হয়েছে (সত্তরের দশকের শেষাংশ থেকে) তুমুল গণজাগরণ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। যার সম্মিলিত প্রকাশ সাম্প্রতিককালের 'উলফা' (U.L.F.A.) বা সম্মিলিত আসাম মুক্তিফ্রন্ট (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট ফর আসাম) আন্দোলন। আর ঐসব আন্দোলন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা ভারতকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে আসাম ও ত্রিপুরাসহ সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে যোগাযোগ ও সরবরাহ-

www.pathagar.com

সংযোগের জন্য বর্তমানে আরো বেশি করে সচেতন ও তৎপর করে তুলেছে। একটু গভীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সত্যিকার বুদ্ধিবৃত্তিক আলোকে যদি আমরা ভারত-বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ট্রানজিট সমস্যাকে পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষণ করি তবে এ সমস্যার অর্থনৈতিক গুরুত্বকে ছাপিয়ে তার ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত বাস্তবতাই বেশি প্রকট হয়ে উঠবে।

বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত 'ট্রানজিট' কী?- দেশের অনেকেই পুরোপুরি না বুঝে অথবা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে ট্রানজিট বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন। বিশেষ করে এদেশের বেশির ভাগ সংবাদপত্র ও সাময়িকী ঐ বিষয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত অসত্য ও কল্পনাশ্রিত রিপোর্ট প্রকাশ শুরু করেছে। এদের এক পক্ষ ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার পক্ষে এবং অন্যপক্ষ না দেয়ার পক্ষে বহু যুক্তি তর্কের অবতারণা করছেন। ট্রানজিটের পক্ষাবলম্বীগণ এর দ্বারা দেশের হাজার কোটি টাকার আর্থিক লাভের সম্ভাবনার কথা নানাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, আর বিপক্ষ দল ট্রানজিটের ফলে দেশের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব বিপন্ন হবে বলে জাতিকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন। কিন্তু এদের কারোরই ট্রানজিট ইস্যুর নানা টেকনিকেল দিক, বিশেষ করে এর ভূ-রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বাস্তবতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই বা থাকলেও তাঁরা স্বেচ্ছায় তা এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছেন। বক্ষ্যমান নিবন্ধটিতে ট্রানজিট ইস্যুর কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

'ট্রানজিট' ইংরেজী Transit শব্দেরই পরিচিত ও সর্বজনগ্রাহ্য রূপ। ট্রানজিট বলতে বাংলায় 'পারাপার সুবিধা' বুঝায়। ট্রানজিট (Transit) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "Process of going or conveying across, over or through" (Hawkins, 1981)। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের উপর দিয়ে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভূ-খণ্ডসমূহে জন, যন্ত্র ও পণ্য পারাপারের সুবিধা লাভকেই বর্তমানের বহুল আলোচিত 'Transit Facilities' বা 'ট্রানজিট সুবিধা'কে বুঝানো হয়ে থাকে। অন্য ভাষায়, "Transit facilities mean that India would use the territories of Bangladesh including Chittagong port for movement of men, machines and materials through specific routes by land

www.pathagar.com

to its seven eastern states" (Ali, 1996)। এ ট্রানজিট সুবিধার আওতায় (চুক্তি বাস্তবায়িত হলে) ভারত তার পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য যে কোন প্রদেশ থেকে মালামাল ও পণ্য বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর (চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর), নৌপথ, রেলপথ এবং বিশেষভাবে স্থলপথ ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি বাংলাদেশের সার্বভৌম জমিনের উপর দিয়ে 'সর্টকার্ট' পন্থায় দ্রুত, লাভজনক ও কৌশলগত সুবিধাজনকভাবে তার স্থলপরিবেষ্টিত বিচ্ছিন্নপ্রায় এবং ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদপ্রবণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যে সহজেই পারাপারের সুযোগ পাবে এবং বিনিময়ে বাংলাদেশ লাভ করবে আপাতঃদৃষ্টিতে লাভজনক কিছুটা আর্থিক সুবিধা-প্রায় ৭০০/৮০০ কোটি টাকার ট্রানজিট ফি (Centre For Policy Dialogue, 20-22 May, 1995)।

ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট ইস্যুর ইতিহাস ও ধারা

১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পরে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ভারত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে (অবিভক্ত আসাম প্রদেশ) নানা ধরনের ভোগ্যপণ্য পারাপার করতে পারতো। ১৯৪৮, '৪৯ ও '৫০ সাল এমনকি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ভারতের পণ্যবাহী স্টিমার ও বার্জসমূহ কলকাতা বন্দর থেকে শুরু করে সুদূর এলাহাবাদ, পাটনা থেকে নানা ধরনের পণ্য নিয়ে পদ্মা, যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) ও মেঘনা-কুশিয়ারা-সুরমা নদীপথ ধরে আসাম ও বরাক উপত্যকার নানা বন্দরে ও শহরে মালামাল আনা-নেয়া করতে পারত। ১৯৬০-এ ভারতে সংঘটিত নৃশংস মুসলিম নিধনযজ্ঞ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক খারাপের দিকে যায় এবং ভারত তার ওপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমানসমূহের উড়ে যাওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করতে থাকলে বাংলাদেশের উপর দিয়ে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ভারতের স্থল ও নৌ-ট্রানজিট প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬২ সালে চীন ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করে মাত্র ৩/৪ দিনের মধ্যে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের NEFA ও আসামের বিপুল এলাকা দখল করে তড়িৎ গতিতে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীর পর্যন্ত এলাকা কব্জা করে নিলে ভারতকে তীব্রভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের উপর দিয়ে সামরিক মালামাল, রসদ ও সৈন্য পারাপারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে হয়। কিন্তু ততদিনে পাকিস্তান-চীন সম্পর্ক 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র'-এ নীতির ভিত্তিতে

www.pathagar.com

খুবই জোরালো হয়ে ওঠে এবং ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের (সেপ্টেম্বর ৬-১৭) পর পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে যায় ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার সকল পারাপার বা ট্রানজিট সুবিধা। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সাল থেকে ভারত বাংলাদেশের মধ্যকার স্থল ও নৌ-যোগাযোগ আবার স্থাপিত হয় এবং একই বছর স্বাক্ষরিত চুক্তি বলে ভারত বাংলাদেশের পাঁচটি নদীবন্দর ব্যবহারের সুযোগ পায়। পরবর্তী বছরগুলোতে নিয়মিতভাবে ঐ চুক্তি নবায়ন হতে থাকে এবং ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির আওতায়ও (২৫ বছর মৈত্রী চুক্তি'র সূক্ষ্ম প্রটেকশানে) ভারত সীমিত রূপে বাংলাদেশের উপর দিয়ে অনিয়মিতভাবে আসাম, ত্রিপুরা ও অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গ (কলকাতা) ও অন্যান্য ভারতিয় রাজ্যের পণ্য ও মালামাল পারাপারের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতিয় মালবাহী ট্রাকসমূহ দেশের নানা সড়ক পথে বিশেষ করে বেনাপোল, দর্শনা, হিলি, তামাবিল (সিলেট), জকিগঞ্জ-সুতারকান্দি প্রভৃতি সীমান্ত ফাঁড়ির পথ দিয়ে নিয়মিত উভয়পক্ষের অনুমতিক্রমেই দেশের (বাংলাদেশের) অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে আগে ঠিক করা বাংলাদেশি ট্রাকের সাহায্যে দেশের পূর্বাঞ্চলের (পশ্চিমের মালামাল) ও পশ্চিমাঞ্চলের (পূর্বাঞ্চলীয় পণ্য) সীমান্ত অতিক্রম করে চলে যায় পুনরায় ভারতিয় বিপরীত ভূ-ভাগে। তাছাড়া ভারতিয় রেলওয়ে ওয়াগনসমূহ পরিচয়-চিহ্ন ও হিন্দি নাম, নম্বর গোপন করে ছদ্মবেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর ও হিলি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বলে বিভিন্ন দায়িত্বশীল সূত্র থেকে খবর পাওয়া যায়। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিলোনিয়া সীমান্তের মালামাল বাংলাদেশের ফেনীর নিকটবর্তী বিলোনিয়া রেলওয়ে স্টেশন ও স্থল পথে ট্রান্সম্যান্টশীপের মাধ্যমে বাংলাদেশে ও ভারতে পাচার হয়ে যায় নিয়মিতভাবে। এমনকি বাংলাদেশের বিগত বিভিন্ন সরকারের আমলে গোপন চুক্তির বলে (২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তির আওতায়) বাংলাদেশের ভূ-ভাগের উপর দিয়ে ভারত বহু কনসাইনম্যান্ট সমরাস্ত্র ও সামরিক রসদাদিও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমুহে পারাপার করেছে বলে জানা যায়। ধারণা করা হয়, ঐসব সমরাস্ত্র ও রসদ পারাপারের অংশ হিসাবেই ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালের বিভিন্ন সময়ে ভারতের মেদিনীপুরে এবং বাংলাদেশের কক্সবাজার উপকূলে ভণ্ডুল হয়ে যায় ভারতের দু'টি সামরিক রসদ পারাপার বা পাচারের উদ্যোগ। এমনকি এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, বাংলাদেশের

www.pathagar.com

সরকার অন্তত কক্সবাজার-উখিয়ায় জনগণের হাতে ধরা পড়ে যাওয়া একাধিক ট্রাকভর্তি ভারতিয় সীল লাগানো সমরাস্ত্র ও গোলা-বারুদের গন্তব্য ও ট্রানজিট পারমিট' (গোপন চুক্তিভুক্ত) সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। আর সরকার এর সাথে জড়িত ছিল বলেই পরবর্তীতে গণ-অসন্তোষের ভয়ে তা' তদন্তের পরিবর্তে ধামাচাপা দেয়া হয়।

বিশ্বের নানা দেশে ট্রানজিট ব্যবস্থার উদাহরণ

ট্রানজিট ব্যবস্থা বিশ্বের বহু দেশে পরস্পরের মধ্যে চালু একটি অতি পুরোনো এবং সাধারণ দ্বি-পাক্ষিক কিংবা বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার অংশ। বিশেষ করে বিশ্বের স্থল পরিবেষ্টিত নানা দেশ তাদের পণ্য আমদানি ও রফতানির জন্য অন্য দেশের ভূ-ভাগ ও সমুদ্রবন্দর বা নৌপথ ব্যবহারের জন্য ট্রানজিট চুক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকে। এসব চুক্তির ফলে চুক্তিকারি দেশসমূহ আর্থিকভাবে লাভবান হয় এবং তাদের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা বহুলাংশে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত দেশগুলোর নাম বলা যায় ঃ এশিয়ার নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান, মঙ্গোলিয়া ; দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া ; আফ্রিকার চাদ, মালি, নাইজার, ইথিওপিয়া, জিম্বাবো এবং ইউরোপের সুইজারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং রাশিয়া থেকে সাম্প্রতিককালে আলাদা হয়ে যাওয়া বেলারুশিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ও মধ্য এশিয়ার পাঁচটি প্রজাতন্ত্র-কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরঘিজিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান। এগুলো সবই ভূ-পরিবেষ্টিত রাষ্ট্র বা Land-Locked Countries। ঐসব রাষ্ট্রসমূহকে তাদের প্রয়োজনীয় মালামাল, পণ্যসামগ্রী ও উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানি-রফতানির জন্য ট্রানজিট ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রসমূহের উপর দিয়ে বহিঃবিশ্বের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে হয়। এ দেশসমূহকে ভূ-পরিবেষ্টিত হওয়ার ফলেই বহিঃযোগাযোগের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের ওপর মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। আয়তনে ক্ষুদ্র, জনবলে দুর্বল এবং সম্পদ সমৃদ্ধিতে পশ্চাদপদ হওয়ার কারণে কোন কোন ভূ-পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রকে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ও শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে ট্রানজিটের জন্য নিতান্ত অসহায় থাকতে হয় এবং ঐসকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে বৃহত্তর শক্তিধর রাষ্ট্রের করুণার উপর নির্ভর করতে হয়। ক্ষুদ্র দুর্বল, পশ্চাদপদ এবং ভূ-রাজনৈতিকভাবে

www.pathagar.com

অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকার কারণে অনেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বও বহু সময় বৃহত্তর শক্তিধর প্রতিবেশীর দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। হঠাৎ করে বাণিজ্য ট্রানজিট বন্ধ করে দিয়ে ক্ষুদ্র ও দুর্বল স্থল পরিবেষ্টিত বহু রাষ্ট্রকে বৃহত্তর প্রতিবেশী প্রায় সময় আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হতে দেখা যায়। ফলে নিজ অস্তিত্বের স্বার্থেই ঐসব স্থল পরিবেষ্টিত বা ভূ-রাজনৈতিকভাবে বেকায়দায় অবস্থানপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহকে বৃহত্তর রাষ্ট্রের আনুগত্যকে মেনে নিতে হয় অথবা বিপরীত অবস্থায় বৃহত্তর ঐ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আক্রোশের আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ এখানে বৃহত্তর শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে উল্লেখ করলে ক্ষুদ্রায়তন, দরিদ্র ও স্থলবেষ্টিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, সিকিম ও ভুটানের কথা বলা যেতে পারে। সিকিম ঐ একই অবস্থার শিকার হয়ে প্রায় দু'যুগ আগে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। ভুটান প্রতিরক্ষা, অর্থ, যোগাযোগ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্ব ভারতের উপর ছেড়ে দিয়ে প্রায় আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা নিয়ে টিকে আছে এবং নেপালকে নিজের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার মত 'ঔদ্ধত্য' দেখাতে গিয়ে ভারতের বাণিজ্য অবরোধ, পরিকল্পিতভাবে উস্কে দেয়া অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দারুণ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু চরম বৈরিতা ও পরিকল্পিত চক্রান্ত বাস্তবায়ন করার পরও শুধুমাত্র ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা, জনগণের ধর্মীয় ও আদর্শিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বন্ধন এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতির কারণে ভারত পাকিস্তানকে বার বার আক্রমণ করেও এখন পর্যন্ত বশ মানাতে পারেনি এবং প্রায় ঐ একই কারণে বাংলাদেশও ভারত দ্বারা প্রায় দু'যুগ ধরে নিগৃহীত হয়েও (যেমন ফারাক্কা বাঁধ, দক্ষিণ তালপট্টি দখল, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, মুহুরীর চর দখল, চাকমা-সমস্যায় মদদ দান ইত্যাদি) অত্যন্ত সচেতনভাবে ও সফলতার সাথে ভারতের বহুমুখী আধিপত্যবাদী আক্রমণকে তীব্রভাবে প্রতিহত করে চলেছে। আবার বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণসমূহ বাস্তবতার তাগিদে এবং আর্থিক লাভ-ক্ষতির নিরিখে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অত্যন্ত স্বচ্ছ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ স্থল ও নৌ-ট্রানজিট ব্যবস্থা কাজ করে চলেছে। ভারসাম্যপূর্ণ এসব ট্রানজিট চুক্তির মাধ্যমে চুক্তিতে অংশগ্রহণকারি উভয়পক্ষই বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং স্বীয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। ইসিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ এমন সফল ট্রানজিট চুক্তি

www.pathagar.com

বাস্তবায়ন করে চলেছে। অপরদিকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক (ভাষা, জাতিতাত্ত্বিক ইত্যাদি) বন্ধন থাকার ফলেই সাম্প্রতিক কালে USSR থেকে সদ্য মুক্ত মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ ইরান, পাকিস্তান, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের সাথে গড়ে তুলতে যাচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘতম ট্রানজিট ব্যবস্থা। ঐ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে কার্যকর ও ফলপ্রসূ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও মালামাল পারাপারও শুরু হয়ে গেছে। ঐসব চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে প্রাচীন সিল্ক রুট (Silk Route) -এর পুনরুজ্জীবন ঘটতে যাচ্ছে বলেই গবেষকগণ মনে করছেন। ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক অপরিহার্যতা ঐ বৃহদায়তন ট্রানজিট উদ্যোগ গড়ে তোলার পেছনে মূল চালিকা শক্তি বা নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। বিশ্বের নানা ছোট-বড় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, সহনশীলতা ইত্যাদি সদগুণের অনুশীলন বজায় থাকলে এবং জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাসমূহ (যেমন সার্ক, আসিয়ান, ইকো, ইসি, ওআইসি ইত্যাদি) সত্যিকার কল্যাণধর্মী কার্যকারিতা লাভ করলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহজেই ফলপ্রসূ ও কার্যকর ট্রানজিট ব্যবস্থা গড়ে ওঠতে পারে। তাছাড়া প্রযুক্তির উন্নতি ও বিশ্ব জনসংখ্যার বিপুল বিস্ফোরণ বিশ্বের নানা দেশ নিজ নিজ প্রয়োজনের খাতিরেই ট্রানজিটের বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বের নানা অঞ্চল ও মহাদেশসমূহ জুড়ে জালের মত বিস্তার লাভ করছে বিশ্ব সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক (যেমন এশিয়ান হাইওয়ে, ওয়ার্ল্ড হাইওয়ে, ইউরোপীয়ান রোড নেটওয়ার্ক এবং ট্রান্স-আমেরিকান হাইওয়ে সিস্টেম)। ঐসব পরস্পর সংযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বের নানা রাষ্ট্রকে যুক্ত করে তুলতে কাজ করছে এবং ট্রানজিট ব্যবস্থার বাস্তবায়নে দারুণভাবে কাজ করতে শুরু করেছে।

ট্রানজিট বিষয়ে সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়া

১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে বিশেষ করে আসামের কুকড়াঝাড়ে এবং মনিপুর ও নাগাল্যান্ডের নানা স্থানে বোড়ো এবং কুকি ও ULFA ভুক্ত নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের চোরাগোপ্তা হামলা ও গেরিলা যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ভারতিয়

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী ও নানা নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর (যেমন BSF ও স্থানীয় কন্সটুবুলারি) অসংখ্য সদস্য ঐ হামলার শিকার হতে থাকে। বোড়োদের হামলায় N.E. Railway ও ঐ অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মুখোমুখি দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য সরকারসমূহকে বাস্তবতার তাগিদে আবার বাংলাদেশের উপর দিয়ে স্থল ট্রানজিট (সড়ক ও রেল) এবং চট্টগ্রাম বন্দর ও নৌ-সংযোগের প্রয়োজন নতুন ও জোরালোভাবে অনুভব করতে হয়। তারা ট্রানজিট ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের বিষয়ে স্থায়ী চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯৯৫ সালের কোন এক সময় বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে গেলে তাকে ভারতিয় প্রধানমন্ত্রী সার্ক-এর উদ্দেশ্যের আলোকে ফারাক্কা পানি বণ্টন সমস্যা ও ট্রানজিট সমস্যাকে এক সাথে বিবেচনা করার কথা প্রথম তুলে ধরেন। বেগম খালেদা জিয়া অবশ্য ফারাক্কা পানি সমস্যার সমাধানকেই প্রাধান্য দেন এবং ট্রানজিট বিষয়টি পরে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিবেচনা করবেন বলে এড়িয়ে যান। কিন্তু ট্রানজিট ইস্যুটি ভারত সরকারের কাছে ফারাক্কা পানি সমস্যার সমাধানের একটি মূল্যবান বিনিময় মূল্য বা চাবি হিসাবে দ্রুত প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং ঐ বছরের ভারতের নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই তারা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে স্বীয় ট্রানজিট স্বার্থকে ফারাক্কার পানির সাথে দর কষাকষির বিষয় হিসাবে জুড়ে দিতে থাকেন। এমনকি, গত জুলাই মাসে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভায় জরুরি পরিকল্পনা পেশ করার সময় বাংলাদেশের উপর দিয়ে রেল ও সড়ক পথে ত্রিপুরা ও অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের ট্রানজিট সংযোগ বিষয়টিও জুড়ে দেয়া হয় (দৈনিক গণশক্তি, ২৫ জুলাই)। ভারতের সংবাদপত্র মাধ্যমে জানা যায় যে, বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট বাস্তবায়নের প্রস্তুতি হিসাবে ইতোমধ্যেই ভারত উত্তর-চব্বিশ পরগণার বনগাঁ থেকে বেনাপোল সীমান্ত পর্যন্ত রেলপথ নবায়ন ও পুনঃসংযোজনের কাজ হাতে নিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৫ সালের পর থেকে বনগাঁ-বেনাপোল-যশোর রেলপথটি বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৭১-এর পর ঐ পথেই বাংলাদেশের বিপুল সমরাস্ত্র (পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত) ও কলকব্জা ইত্যাদি ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ ও ভারতের প্রতি মিত্র মনোভাবাপন্ন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করলে ভারতের ট্রানজিট ইস্যুটি

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গত জুলাই (১৯৯৬) মাসে ঢাকার দৈনিক "Daily Independent" পত্রিকাকে দেয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতিয় হাইকমিশনার দেব মুখার্জী ফারাক্কা পানি বণ্টন ও ট্রানজিট ইস্যু নিয়ে কথা বলেন। তিনি অবশ্য ইস্যু দু'টিকে একটির সাথে অন্যটিকে জুড়ে দেবার কথা এড়িয়ে যান। তাঁর ভাষায়, "India had no intention to link the water issue with transit facilities. The issue of transit for Indian goods to the north-eastern parts of India through Bangladesh has been discussed on and off for several years. The transit facility, if agreed, could provide substantial reveneu for Bangladesh and could lead to India investment in infrastructure of Bangladesh which would be beneficial to the people of this region" ... "for India transit was certainly important to maintain a smoth supply of goods to its eastern provinces" (The Independent, 26 July, 1996)। একই সাক্ষাৎকারে মিঃ মুখার্জী ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যে বহুদিন থেকে নৌ-ট্রানজিট চালু রয়েছে সে বিষয়েও স্বীকারোক্তি করেন এবং তা কিভাবে আরো বাড়ানো যায় তার উপায় বের করার উদ্যোগ নিতে আহবান জানান। ঢাকায় এক রাষ্ট্রীয় সফরে এসে (২৫ জুন, ১৯৯৬) ভারতিয় পররাষ্ট্র সচিব সালমান হায়দার বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের ট্রানজিট সুবিধা লাভের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "গঙ্গার পানির হিস্যা ও ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দান ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।" সালমান হায়দারের ঐ বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ফারাক্কা পানির হিস্যার সাথে ট্রানজিট সুবিধার দর কষাকষিকে সংযুক্ত করার ভারতিয় মনোভাবকেই প্রকাশ করে।

ভারতের স্বার্থে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য রাষ্ট্র বহুদিন থেকেই সুপারিশ করে আসছে। ঐসব রাষ্ট্র বাণিজ্যিক সুবিধা ও আর্থিক লাভালাভের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসলেও তারা অত্যন্ত চতুরতার সাথে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা নিরাপত্তার বিষয়টির গুরুত্বকে সব

www.pathagar.com

সময়ই সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়। ধারণা করা হয়, বিশ্ব রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য পরিবর্তনের আলোকে চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি ঠেকাতে এবং এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা (Uni-polar Global System) বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র রাষ্ট্রসমূহ ভারসাম্য শক্তির 'লেভারেজ' হিসাবে ভারতকে অখণ্ড ও শক্তিশালী রাখার জন্যই সম্পূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক (Geo-Political) কারণেই এমন ভূমিকা নিয়েছে। উল্লেখ করা যায় যে, গত ১৪ আগস্ট বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটেনের হাই কমিশনার পিজে ফাওলার এমনই এক সুপারিশ উপস্থাপন করেন (আহমদ, ২৩ আগস্ট ১৯৯৬)। ইউরোপীয় কমিশনের (ইসি) প্রতিনিধি এম ডুরি ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে একই সুরে ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের কথা তুলে ধরেন। পাশ্চাত্যের ঐসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ট্রানজিট বিষয়ে উপস্থাপিত সুপারিশ ও পরামর্শ থেকে সুস্পষ্টভাবে ট্রানজিট বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের স্বার্থ ও মনোভাবের প্রকাশ পায়। তাছাড়া ভারতও যে ট্রানজিটের জন্য ফারাক্কার পানিকে দর কষাকষির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, তাও এদের বক্তব্য থেকে ফুটে ওঠে।

ভারতের এই ট্রানজিট বিষয়ক আগ্রহ ও তৎপরতা বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের পূর্ববর্তী একাধিক সরকার বিভিন্ন চাপের ফলে যেভাবে '২৫ বছর মৈত্রী চুক্তি' প্রত্যাখ্যান বা নাকচ করতে পারেনি তেমনি ১৯৭২ ও ১৯৭৫ সালের মুজিব সরকার কর্তৃক সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি এবং সীমিত স্থল ও নৌ-ট্রানজিট চুক্তির অস্বীকার করতে ব্যর্থ হয়। একই কারণে ১৯৮০ সালের ৪ অক্টোবর জিয়া সরকারও অনুরূপ একটি বাণিজ্য চুক্তিতে আগে সম্পাদিত সীমিত ট্রানজিট ও বাণিজ্য ব্যবস্থা বজায় রাখতে বাধ্য হয় (তৃতীয় ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি, অক্টোবর, ১৯৮০)। সম্প্রতি বিগত ৯ আগস্ট দিল্লীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান ও ভারতিয় বিদেশ সচিব সালমান হায়দার দু'দেশের মধ্যকার ট্রানজিট ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন এবং বাংলাদেশি সচিব জনাব সোবহান সাপ্টা চুক্তির আলোকে ঐ সুবিধা প্রদানের কথা স্বীকার করলে দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী মহল ও রাজনৈতিক অঙ্গনে দারুণ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের বর্তমান নতুন সরকার তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টো অনুসারে ভারতের সাথে সম্পর্ক আরো জোরদার করার উদ্যোগ হিসাবেই ট্রানজিট বিষয়ে খোলামেলা উদ্যোগ গ্রহণে তৎপর

www.pathagar.com

হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঐ বিষয়ে বাংলাদেশের নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দেন যে, "এখন ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে এবং ফারাক্কার পানি সমস্যা কোনরূপেই ট্রানজিট ইস্যুর সাথে যুক্ত হতে পারে না" (The Independent, 17 Aug. 1996)। এর পূর্বেই বর্তমান সরকারি দলের অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন ভারতকে ব্যবহারের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর ও ট্রানজিট সুবিধার যৌক্তিকতার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আজাদ জনাব মহিউদ্দিনের ঐ বক্তব্যকে একজন দায়িত্বশীলের বক্তব্য বলেই সমর্থন করেন। ঐ থেকেই আওয়ামী লীগের ট্রানজিট সম্পর্কিত মনোভাব পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায়। উপরন্তু আওয়ামী বুদ্ধিজীবীগণ ও সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকাও জোরেশোরে ট্রানজিটের ব্যাপারে অনুকূল জনমত গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে উঠেপড়ে লেগেছে। বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভায় তারা ট্রানজিটের পক্ষে বক্তব্য রাখছেন। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ ছোট-বড় রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন মহল বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতকে সরাসরি ট্রানজিট প্রদান ও অবাধ সমুদ্র ও নৌ-বন্দর ব্যবহারের চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগকে সরাসরি নাকচ করে দিয়ে ট্রানজিট না দেয়ার জন্য জোরালো আওয়াজ তুলেছেন। তারা ঐ উদ্যোগের সাথে দেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনাকে জড়িত দেখছেন এবং একে একটি অশুভ চক্রান্ত হিসাবে অভিহিত করেছেন। আগস্ট ('৯৬) মাসের ২০ তারিখ বাগেরহাটে এক জনসভায় ভাষণদানকালে দেশের প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার মধ্যে একটি গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত দেখতে পাচ্ছেন বলে ঘোষণা দেন এবং জাতিকে তা রুখে দাঁড়ানোর জন্য আহবান জানান। (The Independent, 21 Aug. 1996)। বাংলাদেশের অন্যতম বড় ও সুসংহত দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীও ভারতকে ট্রানজিট প্রদানে সরকারকে বিরত থাকতে আহবান জানিয়েছেন। (Bangladesh Times, 21 Aug. 1996)। বিএনপি, জামায়াত, মুসলিম লিগ, জাগপা, বামফ্রন্টসহ প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই বাংলাদেশকে ভারতের ট্রানজিট দাবি না মানার জন্য জোরালো বক্তব্য রাখছে। এমনকি ট্রানজিট দিলে 'রক্ত দিয়ে তা রোখা হবে'

www.pathagar.com

বলেও কেউ কেউ বিবৃতি প্রদান করেছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ট্রানজিট ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আবার অস্থিরতা ও ভয়ঙ্কর নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে (দৈনিক মিল্লাত, ২২ আগস্ট, ১৯৯৬)।

ভারতের ট্রানজিট প্রস্তাবের রূপরেখা

ভারতের প্রস্তাবিত ট্রানজিট সুবিধাবলীর আওতায় বাংলাদেশের ভূমির উপর দিয়ে স্থল (সড়ক ও রেল) ও নৌপথে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অথবা মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তম বন্দর থেকে আনীত মালামাল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দূরবর্তী সাতটি রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মনিপুর ও অরুনাচলের বিভিন্ন স্থানে সরাসরি প্রেরণ করার কথা বলা হয়েছে। ভারতের শিল্পোন্নত রাজ্য গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লীসহ বিভিন্ন পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য ও বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষি প্রধান অঞ্চলের নানা ধরনের শিল্পজাত ও কৃষি পণ্যাদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের ভোক্তাদের কাছে পৌঁছাতে উত্তরবঙ্গের 'শিলিগুঁড়ি করিডোর' ঘুরে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে দুর্গম-পাহাড়ি পথ অতিক্রমপূর্বক সীমিত রেল ও সড়ক পথে পারাপার করতে হয়। এর ফলে ভারতকে প্রতিবছর শুধু পরিবহন খরচ বাবদ অতিরিক্ত পাঁচ থেকে সাত হাজার কোটি রূপী ব্যয় করতে হয়। তাছাড়া অত্যন্ত নাজুক ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে ঐসব রাজ্যে ভারতকে বিপুল সামরিক স্থাপনা পরিচালনা ও সৈন্য রসদ মজুদ সরবরাহ বজায় রাখতে হয়। বাংলাদেশের রেল, সড়ক ও নৌপথকে ব্যবহারের মাধ্যমে ভারত যদি সরাসরি সর্টকার্ট পথে ঐসব রাজ্যে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন পারাপারের সুযোগ পায় তবে হাজার হাজার কোটি রূপী ও প্রচুর সময়ের সাশ্রয় হবে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যাপারেও নিশ্চিত হয় এর মাধ্যমে খুব সহজেই। ভারতের ট্রানজিট প্রস্তাবের আওতায় ভারত সমুদ্র পথে আনীত তার মালামাল ও পণ্য প্রথমে চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস করে তা স্থানীয়ভাবে গড়ে তোলা নিরাপদ এবং সুপরিসর ওয়্যারহাউসে মজুদ করবে এবং পরে তা বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরায় যাবে অথবা সরাসরি ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলীয় নদীবন্দর সাব্রুমে (ফেনী নদীর উত্তরে) প্রবেশ করতে পারবে ছোট ছোট বার্জে করে। আর এখান থেকে স্থলপথে নতুন করে তৈরি সুন্দর সড়ক পথে চলে যাবে আসাম,

www.pathagar.com

মনিপুর, নাগাল্যান্ডসহ দূরবর্তী রাজ্যসমূহে। তাছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর থেকে তোলা পণ্য ও সামরিক সরঞ্জামাদি সহজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর দিয়ে কাপ্তাই, দিঘীনালা, বাঘাইছড়ি, মরিস্যা হয়ে কিংবা পূর্ব দিকের দুর্গম পাহাড়ি সড়ক দিয়ে মিজোরাম, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ড মনিপুরে চালান দেয়া সম্ভব হবে। ভারত নিজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রাম বন্দরকে প্রয়োজনমত ঢেলে সাজানোর কথা বলে তার উন্নয়নের প্রস্তাব দিয়েছে। তাছাড়া স্থল পথে ভারত বেনাপোল, দর্শনা, ইত্যাদি সীমান্ত দিয়ে সড়ক পথে দূরপাল্লার ভারি ট্রাক সহযোগে বাংলাদেশের উপর দিয়ে জন, পণ্য ও যন্ত্র তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে প্রেরণের সুবিধা পাবে। ভারত পশ্চিমের বর্ণিত সীমান্তসমূহ দিয়ে প্রবেশ করে বাংলাদেশের পূর্বাংশের কুমিল্লার কসবা, আখাউড়া, সিলেটের তামাবিল (মেঘালয়ের শিলং হয়ে আসামের গৌহাটি পর্যন্ত ও অন্যান্য দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার পথ), জকিগঞ্জ (কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ইত্যাদি হয়ে তিনসুকিয়া হয়ে অরুনাচল কিংবা ডিব্রুগড়, ডিগবয়, ইম্ফল, অইজল ইত্যাদি শহরসমূহে যাওয়ার জন্য কিংবা জুড়ি-পাথারিয়া সীমান্ত দিয়ে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন ও লাভজনক নিরাপদ পরিবহন, পণ্য ও জন পারাপার নিশ্চিত করতে পারবে। তাছাড়া রেলপথেও ভারত বাংলাদেশের উপর দিয়ে পণ্য ও যাত্রী (ওয়াগন, কনটেইনারসহ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাক ও লাইনের মাধ্যমে সুন্দর ও স্বার্থকভাবে খুব সহজেই পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সুবিধাজনক স্টেশনসমূহের মধ্যে চালু করতে পারবে। এ জন্য ভারত পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার বনগাঁ থেকে বাংলাদেশের বেনাপোল দিয়ে বর্তমানে পরিত্যক্ত লাইন চালু করে কুড়িগ্রাম হয়ে আসামে কিংবা আখাউড়া ও জুড়ি, বাল্লা লাইন হয়ে করিমগঞ্জ ও গৌহাটি পর্যন্ত এবং সেখান থেকে দূরতম তিনসুকিয়া পর্যন্ত ট্রানজিট (রেল) চালু করার আশা পোষণ করছে। ভারতের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় (হিন্দুস্থান টাইমস, টাইমস অব ইন্ডিয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি) এ বিষয়ে ভারতের রাজ্য বিধান সভার নানা আলোচনা সুস্পষ্টভাবে ভারতের এসব প্রস্তাবনাকে বিধৃত করেছে। ভারত ট্রানজিট প্রস্তাবনা প্রধানত তার পণ্য পরিবহনের সুবিধার কথা বললেও উপধারা হিসাবে এতে থাকছে- ঐসব লাইন (রেলপথ, সড়কপথ, বন্দর) নিরাপদ ও নিশ্চিত করার জন্য স্বীয় মেইনট্যান্যান্স ও ম্যানেজমেন্টের অধিকারের ধারা; চট্টগ্রাম বন্দরে সুবিধাবলী ও স্থাপনা সম্প্রসারণের প্রস্তাবনা এবং স্বাভাবিকভাবে ঐ ট্রানজিট চালু হলে তা হঠাৎ করে যাতে বাংলাদেশ একতরফাভাবে কোনদিন

www.pathagar.com

বন্ধ করে দিতে না পারে এমন শক্ত ও আমোচনীয় শর্তাবলী (যেমন ঃ ২৫ বছর মৈত্রী চুক্তি বিগত কোন সরকারই নাকচ কিংবা অস্বীকার করতে পারেনি)। ঐসব বক্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দেবমুখার্জীর গত ২৫ জুলাই (১৯৯৬)-এ The Independent পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাতকারটিতে। এতে মিঃ মুখার্জী বলেছেন, "The transit facility, if agreed, could provide substantial revenue for Bangladesh and could lead to Indian investment in infrastructure of Bangladesh which would be benificial to the people of this region" (The Independent, 26 July, 1996)। আর এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা এবং এর ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই ভারতকে লোক, প্রহরা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাছাড়া ঐ সমস্ত ট্রানজিট পথে ও বন্দরের স্থানে স্থানে ভারতিয় ড্রাইভার, হেলপার, ব্যবস্থাপক, নিরাপত্তা প্রহরী এবং অন্যান্য স্টাফদের আশ্রয়, বাসস্থানের এবং অন্যান্য সুবিধা সেবার জন্য বহু হোস্টেল, কেন্টিন, অফিস, নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, জংশন সেন্টার, কারখানা (মেরামতের জন্য), হাসপাতাল ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। আবশ্যিকভাবে এর ফলে শত-সহস্র ভারতিয় নাগরিককে বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের জন্য আসতে হবে। অবশ্য ভারতের এই স্থায়ী ট্রানজিট প্রস্তাবনার কোন লিখিত দলিল এখনো সম্পাদিত হয়নি। তথাপি বিশ্বের নানা দেশের ট্রানজিট ব্যবস্থার আলোকে ভারতের উপরোক্ত সম্ভাব্য প্রস্তাবনা চিত্রকে আশংকার কারণ বলে এখন থেকেই ধরে নেয়া যায়।

ট্রানজিটের স্বার্থ ও লাভ-ক্ষতি

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার ট্রানজিট ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে এর দ্বারা ভারত ও বাংলাদেশ দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রই আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। কিন্তু এ লাভালাভের জন্য অবশ্যই দু'দেশের নীতি-নির্ধারকদের মনোভাব ও আচরণে থাকতে হবে সততা, সৎপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ, ঔদার্য্য আর অকপট তৎপরতার বাস্তবায়ন ও চর্চা। ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ই বিশ্বের অন্যতম দুই পশ্চাদপদ ও দরিদ্র জাতি। উভয় দেশেরই মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগই দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। দুই দেশই বিপুল জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ।

www.pathagar.com

ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ঋণগ্রস্ত দেশ। প্রতিরক্ষা খাতে ভারতকে প্রতি বছর খরচ করতে হয় প্রায় ৫০/৬০ হাজার কোটি রূপী (Asia Week, 1996)। তাছাড়া ভারতের একাধিক রাজ্যে বহু বছর থেকে চলছে দারুণ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এর মধ্যে কাশ্মিরে মুসলমানদের আজাদির যুদ্ধ, পাঞ্জাবে শিখদের স্বাধীন খালিস্তান-এর জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম, আসামে U.L.F.A.-এর প্রাণপণ গেরিলা লড়াই, উত্তর-পূর্বাংশের মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, গোর্খাল্যান্ড ও বোড়োদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ভারতের ফেডারেল কাঠামোকে দারুণভাবে নড়বড়ে করে দিচ্ছে। দক্ষিণের অনার্য দ্রাবিড় অধ্যুষিত রাজ্য কর্ণাটক, তামিলনাড়ু প্রভৃতিতে চলছে স্বাধীনতার প্রস্তুতি। এ বিষয়ে শ্রীলংকার তামিল টাইগারদের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম তাদেরকে যোগাচ্ছে যৌক্তিকতার সূত্র ও প্রেরণা। এসব তৎপরতার সঙ্গে রয়েছে বহুদিনের বৈশিষ্ট্যগত বা মজ্জাগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, জ্বালাও-পোড়াও এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারতে প্রায় ৫০ হাজার ছোট-বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা রায়ট সংঘটিত হয়েছে (Akbar, 1989, Engineer, 1991 and Ghosh, 1987)। এসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রতি বছর ভারতে শত-সহস্র মুসলমান, শিখ এবং অচ্ছ্যুৎ-হরিজন সংখ্যালঘু নিরীহ নর-নারী বেঘোরে প্রাণ হারায় এবং বাড়িঘর থেকে উৎখাত হয়ে সর্বহারারূপে নগর ও জনপদে আশ্রয় নেয়। প্রতি বছরই ভারতের অসংখ্য সংখ্যালঘু জনগণ 'পুশব্যাক'-এর মত জঘন্য অপারেশনের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে থাকে- যার ভয়াবহ রূপ মাত্র কিছুদিন আগেও আমরা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি। (India Today, August 4-10, 1998)

ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি একটু দুর্বল হলেও বাংলাদেশে ভারতের মত ঐসব অশুভ সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বিরাজমান নেই। শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন কোন স্থানে মুষ্টিমেয় কিছু বিপথগামী চাকমা তরুণ স্বার্থবাদী মহলের সহযোগিতায় ও ইন্ধনে কিছু বিচ্ছিন্ন নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এসবের পেছনে যে ভারতের সুস্পষ্ট মদদ রয়েছে তার বহু প্রমাণ দেশি-বিদেশি গবেষকদের লেখায় ও বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি হিসাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে (Rob, 1996; Montu, 1981; Jaffa, 1989; Hossain, 1991 and Amin, 1988-89)। ভারতের অসংখ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে 'ঝাড়খন্ড' আদিবাসীদের উত্থান এবং

www.pathagar.com

অতি সাম্প্রতিককালের বরাক ভ্যালীর কাছাড়-করিমগঞ্জ অঞ্চলের বাংলাভাষা-ভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠদের জাগরণ প্রণিধানযোগ্য। তাছাড়া মাত্র কিছুকাল আগেও নাগা নেতা ডাঃ ফিজো ও মিজো নেতা লালডেঙ্গার নেতৃত্বে তুমুল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গেরিলা যুদ্ধ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য অরণ্যাঞ্চলগুলোকে যেভাবে কাঁপিয়ে তুলেছিল- তার প্রকটতা বর্তমানে একটু হ্রাস পেলেও তা এখনো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বলা যায়, তারা এখন যথার্থ সময়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভারতের কেন্দ্রও তা ভালভাবে বুঝে এবং তা বুঝে বলেই বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিটের জন্য তাদের এত তাগাদা। কিন্তু ভারত বর্তমানের ট্রানজিটের জন্য যে তোড়জোড় ও প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং প্রস্তাবনা তৈরি করছে তার জন্য পুরোপুরিই তুলে ধরছে একটি অর্থনৈতিক রূপরেখা। নীচে সংক্ষেপে ভারতের ট্রানজিট প্রস্তাবের অর্থনৈতিক লাভালাভের চিত্র তুলে ধরা হল।

* ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদ (প্রাকৃতিক তৈল, গ্যাস, কয়লা, ইউরেনিয়াম, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, চীনামাটি ইত্যাদি) যা ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ও অন্যান্য রাজ্যের শিল্পের বিকাশ ও ব্যবহারের অন্যতম উপাদান তা পরিবহন ও স্থানান্তরের জন্য বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের ট্রানজিট সুবিধা লাভ একান্ত প্রয়োজন।

* ভারতের আসামের করিমগঞ্জ, কাছাড় জেলা, ত্রিপুরা রাজ্য, মেঘালয়, উত্তরবঙ্গের নেপাল ও ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন দার্জিলিং, কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাসহ আরো কিছু উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ও জেলার বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও বিস্তীর্ণ চা বাগান, কফি, রাবার, তেজপাতা, কমলা লেবু, নাশপাতি আর নানা মূল্যবান ফল ও ভেষজ বৃক্ষের বাগান বা প্ল্যানটেশান। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রয়েছে প্রায় ৮/৯শ' ছোট-বড় চা বাগান। ভারত আসামের ঐসব পণ্যের বিরাট অংশ বিদেশে রফতানি করে কোটি কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা (Foreign Exchange) আয় করে থাকে। কিন্তু ঐ অঞ্চলের সাথে সরাসরি কোন সমুদ্রবন্দরের সংযোগ না থাকার ফলে ভারতকে এতদঞ্চলের রফতানি পণ্য প্রায় দেড়/দু'হাজার কিলোমিটার পথ ঘুরিয়ে শিলিগুঁড়ি করিডোর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা বা হলদিয়া বন্দরে নিয়ে আসতে হয়। এর ফলে ভারতকে প্রতি বছর প্রায় ৫ থেকে ৭ হাজার কোটি রূপী অর্থ অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের উপর দিয়ে যদি মোট ৫/৭শ' কোটি কিংবা বড়জোর ১ হাজার কোটি রূপী ট্যারিফ বা ট্রানজিট ফি দিয়ে ভারত 'সর্টকার্ট' ট্রানজিট নিতে পারে তবে ভারত পরিবহন খাতে অন্তত ৫/৬ হাজার কোটি রূপী অর্থের সাশ্রয় করতে সক্ষম হবে।

* ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প প্রধান ও কৃষি উদ্বৃত্ত রাজ্যসমূহের সস্তা ও বহুল উৎপাদিত শিল্পজাত ও কৃষিজাত ব্যবহার্য পণ্যাদি (যেমন– গম, আটা, ডাল, ভোজ্য তেল, লবণ, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, টুথপেস্ট, কাপড়-চোপড়, শাড়ি-লুঙ্গি, বলপেন, কলম-কালি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বই-পুস্তক, কাগজ, বাসনপত্র, চুলা, পাউরুটি, কসমেটিক্স, ঔষধপত্র, সিমেন্ট, রড, লোহালক্কড়, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) আসামসহ সাতটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের পার্বত্য গ্রামীণ ও শহুরে জনপদে অনায়াসে পৌঁছে দিতে পারলে তা ভারতের জন্য হবে এক ব্যাপক লাভজনক ব্যবসায়িক সাফল্য। কারণ ঐ পার্বত্য ও উপত্যকা অঞ্চল জুড়ে রয়েছে মোট ৫/৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এক বিশাল সম্ভাবনাময় বাজার। শুধুমাত্র অনুকূল ট্রানজিটের অভাবে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ীরা এমন লাভজনক বাজারের সম্ভাবনা থেকে তেমন আশাব্যঞ্জক ফায়দা হাসিল করতে পারছে না। বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা লাভ করলে ভারত নিজ দেশের স্থানীয় পণ্য বাজারজাত করারও বিপুল সুবিধা পাবে।

* আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, অরুনাচল ও মেঘালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে ভারতের বৃহত্তম সমৃদ্ধতম অরণ্যাঞ্চল। ঐসব গভীর ক্রান্তীয় অরণ্যে (Dense Tropical Forests) রয়েছে অত্যন্ত মূল্যবান কাঠের বৃক্ষ, যেমন বার্মা-সেগুন (Burmese Teak), মেহগনি, আগর, শিশু, গর্জন, জারুল, শিরিশ, কড়ই, বাঁশ, গল্লাবেথ, শন ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবসহ বিভিন্ন মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যের শহর ও নগরীসমূহে এবং নানা প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্রে রয়েছে এসব মূল্যবান ও বহু ধরনের কাঠ ও অরণ্যজাত পণ্যের দারুণ চাহিদা। দূরত্ব ও পরিবহন অসুবিধার কারণে এসব ভারি ও কলেবর সমৃদ্ধ পণ্যাদি লাভজনকভাবে বর্তমানে পশ্চিমের বাজার বা চাহিদা কেন্দ্রে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের উপর দিয়ে আসাম, ত্রিপুরা বা অন্য অঞ্চলসমূহে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হলে শত শত কোটি টাকার কাঠ ও অরণ্যজাত সম্পদ লাভজনকভাবে অনায়াসে এবং দ্রুততার সাথে কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

* বাংলাদেশের সাথে ট্রানজিট চুক্তি সম্পাদিত হলে ভারত তার এসব উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দূরবর্তী দীর্ঘ সংযোগ লাইনসমূহের (রেল, সড়ক ও বিমান যোগাযোগ) ব্যয়বহুল রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন খাতের বিপুল বাজেট (প্রতি বছর অন্তত দেড়-দু'হাজার কোটি রূপী) প্রায় অর্ধেকে কমিয়ে আনতে পারবে। অপরপক্ষে বাংলাদেশে এর মাত্র দশ ভাগের এক অংশ খরচ করতে হবে প্রতি বছর (ফি ছাড়া)।

* বোড়ো, মনিপুরী ও উলফা (ULFA) বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের গুপ্ত হামলায় ও নাশকতামূলক আক্রমণে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার পণ্য নষ্ট হয়।ট্রানজিট সুবিধা ভারতকে ঐ ভীতি ও আশংকা থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা দেবে বিপুলাংশে। ভারত ট্রানজিটের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর দিয়ে তার জন, যন্ত্র, পণ্য এবং যান পরিবহন ও পারাপারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের উপর দিয়ে আসাম থেকে বিদ্যুৎ গ্রীড লাইন ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের পাইপ লাইন বসানোর সুবিধাও আদায় করতে পারে। আর তা লাভ করলে আসামের সস্তা ও বিপুল পানি, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত লাভজনকভাবে ও অনায়াসে পশ্চিমবঙ্গসহ বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদি দূরবর্তী রাজ্যের গ্রীডসমূহে প্রবাহিত করতে সক্ষম হবে। এভাবেও ভারত বিপুল আর্থিক স্বার্থ হাসিল করবে। ট্রানজিট সুবিধার আওতায় ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের নিরাপদ, সহজ, সফল, স্বার্থক ও লাভজনক ডাক, তার ও বৈদ্যুতিক সংযোগ সাধনেরও সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

ভারত-বাংলাদেশ প্রস্তাবিত সম্ভাব্য চুক্তির আওতায় যদি ভারত সামরিক সুবিধাদি লাভ করে তবে রাষ্ট্রটি তার রেল, সড়ক ও অন্যান্য যোগাযোগ ও সরবরাহ লাইনের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত হাজার হাজার সৈন্য ও সুবিধাদি হ্রাস করে বিপুল বাজেট সংকুচিত করতে সক্ষম হবে।

* বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিটের মাধ্যমে সামরিক পরিবহন সুবিধা লাভের দ্বারা ভারত সহজেই তার বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে বিদ্রোহ দমন, সম্পদের মালিকানা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, স্বীয় সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে তার বাজার ও ব্যবসায়িক স্বার্থ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিপুল অর্থনৈতিক ফায়দাও হাসিল করতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

* সমতা (Equity) চুক্তির স্বার্থে যদি ভারত 'সাপ্টা'র আলোকে বাংলাদেশকেও তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করতে রাজি হয় তবু ভারতের বিপুল পরিমাণ সস্তা ও উন্নত মানসম্মত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে কোনক্রমেই বাংলাদেশ ঐ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে সফলতা লাভ করতে পারবে না বলে ধরে নেয়া যায়। ভারতিয় ব্যবসায়ীদের পরিচিতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং প্রশাসনিক আনুকূল্য তাদেরকে সব সময়ই এ বিষয়ে সহযোগিতা করবে।

*ট্রানজিট চুক্তির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের উপর দিয়ে তার মালামাল ও পণ্য পারাপারের সুযোগ পেলে তখন স্বীয় দূরবর্তী ভূখণ্ডসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশে তার আরো বেশি ও জোরালো বাণিজ্যিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ ও সুবিধা পাবে। সাপ্টা (SAPTA) চুক্তির মাধ্যমে এবং বিশ্ব মুক্ত অর্থনীতির সুযোগে ভারত ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে ১০০ ঃ ৪ অনুপাতের বিপুল বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে। একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যায়, শুধুমাত্র ১৯৯৪-৯৫ সালেই ভারত বাংলাদেশে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা (২৭৬৭ কোটি টাকা) বাণিজ্য সম্পাদন করে (The Independent, 21 Aug. 1996)। ঐ রিপোর্টে বলা হয়, "A recent survey shows that Bangladesh imported commodities from India worth taka 2767 crore in 1994-95, where as Bangladesh managed to export commodities into India worth Tk. 115 crore, which indicates a trade deficit by Tk. 2652 crore". ঐ রিপোর্টের পর আরো ২/৩ বছর শেষে বর্তমানে ঐ বাণিজ্য ঘাটতি আরো সম্প্রসারিত হয়ে ভারত যত এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ তত বেশিই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে ভারতের সফলতা ও বাংলাদেশের ব্যর্থতার জন্য ভারতের নীতি-নির্ধারকদের সফল নীতি প্রণয়ন ও বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ উদ্যোগ ও পলিসি দায়ী। ভারত বাংলাদেশ থেকে লাভজনকভাবে ভারতে রফতানিযোগ্য ২২টি পণ্যের উপর বিপুল ও উচ্চ ট্যারিফ/কর বসানোর ফলে ঐসব সম্ভাব্য পণ্যের রফতানি উদ্যোগ ঝিমিয়ে পড়ে। অপর পক্ষে শুধুমাত্র দেশের নতুন বাজেটেই (বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার) ভারত থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানিযোগ্য সম্ভাব্য পণ্য দ্রব্যের

www.pathagar.com

(ভোগ্যপণ্য, যন্ত্র) উপর থেকে উল্লেখযোগ্য হারে কর প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ যেন যেচে গিয়েই ভারতকে আরো বেশি বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান ও নিজেদের (বাংলাদেশকে) বঞ্চিত করতে তৎপরতা দেখালেন (পারভেজ, ১৯৯৬)। তাছাড়া বর্তমানে 'Open Secret' চোরাকারবারের মাধ্যমে যে হাজার কোটি টাকার ভারতিয় পণ্য বাংলাদেশের বাজারে আসে, ট্রানজিট সুবিধার মাধ্যমে স্বাভাবিক কারণেই ভারতিয় ঐসব চোরাই পণ্য আরো বেশি হারে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাজারকে ভারতিয় পণ্যে সয়লাব করে দিবে। ফলে লাভ হবে ভারতের, আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ট্রানজিট ব্যবস্থা স্থাপিত হলে বাংলাদেশ যেসব আর্থিক সুবিধা পাবে বলে ভারত ও ট্রানজিট-এর পক্ষের লোকজন প্রচার করছে তার অন্যতম প্রবক্তাগণ হচ্ছেন বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান (১৯৯৫), বিরূপাক্ষ পাল (১৯৯৬), রনেশ মৈত্র (১৯৯৬), সাংবাদিক আমান-উদ-দৌলা (১৯৯৬)। শেষোক্ত তিনজনই বাংলাদেশের একটি দৈনিকে ট্রানজিটের পক্ষে জোরালো প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এর পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করছেন। অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান ২০-২২ মে, ১৯৯৫ তারিখে ঢাকার 'Centre for Policy Dialogue'-এ অনুষ্ঠিত একটি ওয়ার্কশপে অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়ে ট্রানজিটের অনুকূলে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং সেখানে ঐ বিষয়ে অনুকূল রেজ্যুলিউশান নেয়া হয়। তাছাড়া দেশের সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, বাংলাবাজার, খবর ও বাংলার বাণী ট্রানজিটের পক্ষে রিপোর্ট ও উপ-সম্পাদকীয়তে বক্তব্য তুলে ধরেছে। দেশের বাদবাকি প্রায় সকল পত্র-পত্রিকা ও বিদ্যোৎসমাজ অবশ্য এ বিষয়ে ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হতে বলছেন। এদের কেউ কেউ ট্রানজিটের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া ও পরিণতির কথা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেছেন (আহমদ, ১৯৯৬; হোসেইন, ১৯৯৬; পারভেজ, ১৯৯৬; রশীদ, ১৯৯৬; রুশদ, ১৯৯৬ ও রব, ১৯৯৬)। সোবহান (১৯৯৫), পাল (১৯৯৬) ও মৈত্র (১৯৯৬) প্রত্যেকেই ট্রানজিটের ফলে বাংলাদেশের আর্থিক লাভ ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি প্রাপ্তির কথা SAPTA/GATT/SAARC ইত্যাদি আঞ্চলিক সহযোগিতা চুক্তির আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এদের সবাই বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা প্রতিরক্ষার দিকগুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে

www.pathagar.com

গেছেন অথবা মোটেই পাত্তা দেননি। এসব বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য থেকে ট্রানজিটের ফলে বাংলাদেশ যেসব লাভ ও সুবিধা পাবে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

* ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট স্থাপিত হলে বাংলাদেশ ভারতকে যে ট্রানজিট সুবিধা দেবে তার বিনিময় ফি বা ট্যারিফ থেকে বছরে প্রায় ৭০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে।

* ট্রানজিট সুবিধার বিনিময়ে ভারত বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পরিমাণে গঙ্গার পানি প্রবাহিত করতে রাজি হবে হয়ত।

* ট্রানজিটের জন্য ভারত বাংলাদেশের হাইওয়ে, রেলওয়ে এবং বন্দর (চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরসহ) সমূহের নির্মাণ ও উন্নয়ন বিপুল বিনিয়োগ করবে এবং বাংলাদেশ বিনা খরচে তার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুকূল সুযোগ পাবে, যা দেশটিকে শত শত কোটি টাকার অর্থ সাশ্রয়ে সাহায্য করতে পারে।

* 'Centre for Policy Dialogue'-এর '৯৫-র কর্মশালায় বক্তাগণ ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট বিনিময়ের দ্বারা বাংলাদেশকেও নেপাল ও ভুটানের সাথে বাণিজ্যিক ট্রানজিট স্থাপনের (ভারতের উপর দিয়ে) উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন- যা ভারত বহু আগে থেকেই কঠোরভাবে অস্বীকার করে আসছে। জনাব রেহমান সোবহানসহ অন্যান্য অনেকের মতে এমন ট্রানজিট চালু হলে (ভারত রাজি হলে) বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান আর্থিকভাবে দারুণ লাভবান হবে।

* ঐ একই কর্মশালার সুপারিশে ঐ ট্রানজিটের বিনিময়ে বাংলাদেশকে সাপটা চুক্তির আওতায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্যিক তৎপরতা বিস্তার করার কথা বলা হয়েছে- যার ফলে বাংলাদেশও লাভজনকভাবে আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার পণ্য রফতানি করে বিপুল মুনাফার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ট্রানজিট চুক্তি সম্পাদিত হলে এর ধারার আওতায় বাংলাদেশ-ভারতের মেঘালয় ও আসাম থেকে বৈদ্যুতিক গ্রীডের মাধ্যমে সস্তায় পানি-বিদ্যুৎ নিয়ে আসতে পারবে এবং বাংলাদেশও তার প্রাকৃতিক গ্যাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় রফতানি করার সুযোগ পাবে।

www.pathagar.com

* ট্রানজিট ব্যবস্থা চালু হলে বাংলাদেশে ভারতিয় চোরাকারবারজাত পণ্যের সরবরাহ কমে বৈধ বাণিজ্যজাত পণ্যের সরবরাহ বাড়বে এবং একই কারণে বাংলাদেশ ঐসব ভারতিয় পণ্যের উপর আরোপিত ট্যারিফ বাবদ শত শত কোটি টাকার অর্থ লাভ করতে সক্ষম হবে। একই সঙ্গে চোরাকারবার বন্ধ হলে এবং ভারতিয় প্রয়োজনে ভারতের নিরাপত্তা, আবগারি ও শুল্ক বিভাগ তৎপর হয়ে উঠলে বাংলাদেশের বেশি পরিমাণের সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা হ্রাস করে B.D.R. সদস্য সংখ্যা ও তৎসংশ্লিষ্ট বাড়তি খরচ বহুলাংশে কমাতে সক্ষম হবে।

এত সব লাভ ও সম্ভাবনার সবই কিন্তু সম্পূর্ণ চিন্তাজাত ও কাগজ-কলমের হিসাব-নিকাশ। এর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বা আসল রূপ বা ফলাফল কি হবে তা কিন্তু আমাদের জানা নেই। তবে ভারত-বাংলাদেশের বিগত ২৫ বছরের এবং তারও আগের আরো ২৫ বছরের মোট ৫০ বছরের মনস্তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক এবং আচরণিক বাস্তব চিত্র পর্যালোচনা করে আমরা ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার ট্রানজিট সুবিধা-উত্তর পরিস্থিতির একটি বাস্তবচিত্র পেতে পারি। উপরন্তু যেহেতু ভারত ট্রানজিট সুবিধা লাভ তার আর্থিক বা বাণিজ্যিক সুবিধা ও আনুকূল্যের জন্যই (যদি এর ভূ-রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাদও দেয়া হয়) করতে চাচ্ছে- সেহেতু সে কখনো যে বাংলাদেশকে তার উত্তর-পূর্বাংশে অবাধ ও সহজ বাণিজ্যিক প্রবেশ সুবিধা দান করবে, অথবা তার অত্যন্ত স্পর্শকাতর, সামরিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুঁড়ি করিডোর (মাত্র ১৪/১৫ মাইল) ব্যবহার করতে দেবে- এমনটি ভেবে নেয়া খুবই বোকামি ও কল্পনাবিলাসী কাজ বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। অবশ্যই ভারত অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই স্বীয় স্বার্থটাকেই আগে দেখবে এবং পরে দেখবে প্রতিবেশীর প্রয়োজনকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমানেও ভারত বাংলাদেশিসহ সকল পণ্যের উপর অত্যন্ত উঁচু মাত্রার (কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০/৬০ পারসেন্ট হারে) ট্যারিফ আরোপ করে নিজ দেশের পণ্যের বাজারের নিশ্চয়তাকে ঠিক রেখেছে। উপরন্তু ভারতের পণ্যের উন্নতমান, নিম্ন উৎপাদন খরচ ও বিপুল উৎপাদন হার খুব সহজেই বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আগ্রাসন চালাবে, বাণিজ্যকে কাবু করে দেবে এবং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে করবে অনায়াসেই কুপোকাৎ। এসব প্রতিকূল দুর্ভাবনা ছাড়াও ভারত-বাংলাদেশের ট্রানজিট চুক্তি-উত্তরকালে আরো কিছু আর্থিক ও বাস্তব অসুবিধার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। এসবের মধ্যে নীচের সমস্যাগুলো উল্লেখযোগ্য হতে পারে ঃ

www.pathagar.com

* ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট চালু হলে অবাধ বাণিজ্য চলাচলের সঙ্গে বাংলাদেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে আমদানিকৃত প্রয়োজনীয় বিদেশি যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ও নানা মূল্যবান পণ্য ভারতে সহজে, দ্রুতগতিতে ও অবাধে পাচার হয়ে যাবে। বর্তমানেও মুক্ত অর্থ ব্যবস্থার আওতায় এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

* ট্রানজিট ব্যবস্থার আওতায় নতুন বাণিজ্য ব্যবস্থায় যদি বাংলাদেশ মেঘালয়ের বিদ্যুৎ কিনে বাংলাদেশের গ্রিডে চালনার উদ্যোগ নেয় এবং ভারত যদি দু'দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর সহযোগিতার অজুহাতে বাংলাদেশ থেকে তার প্রায় নিঃশেষিত সম্বল প্রাকৃতিক গ্যাস ও নতুন আবিষ্কৃত কয়লা ভারতে আমদানি করতে চায় (অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারতের কাছে ঐসব অনবায়নযোগ্য জ্বালানি সুবিধাজনক মূল্যে বিক্রি করে) তবে বাংলাদেশের শিল্পায়ন, জ্বালানি খাতে নেমে আসবে এক চরম দুর্যোগ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও হবে মহামূল্যবান জ্বালানি সম্পদের ভবিষ্যৎ সঞ্চয় থেকে দারুণভাবে বঞ্চিত।

* ট্রানজিটের আওতায় ভারতকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করলে বাংলাদেশের প্রধানতম বহির্বাণিজ্যের অপ্রতুল আয়োজন সম্পন্ন এ বন্দরটিকে বাংলাদেশের বিপুল প্রয়োজনে ব্যবহার করা থেকে বহুলাংশে ছাড় দিতে হবে। এখনই প্রত্যহ পরিসরের অভাবে এ বন্দরে বহু জাহাজকে দিনের পর দিন বহিঃনোঙ্গরে অবস্থান ও অপেক্ষা করতে হয়। কর্ণফুলী নদীর পানির অভাব, খাড়ির প্রশস্ততার অপ্রতুলতা এবং বন্দরের 'হার্বার' ও 'এ্যাঙ্কারেজ' ফেসিলিটিজ-এর অসুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্য যা চেষ্টা করলেও খুব বেশি বাড়ানো যাবে না, ভারত এ বন্দর ব্যবহারের চুক্তি সুযোগ লাভ করলে বাংলাদেশকে বিস্তর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে; ডেমারেজ খেসারত দিতে হবে শত শত কোটি টাকা।

* বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে যদি ভারতের ট্রানজিট ভুক্ত পণ্যাদি পারাপারে বিঘ্ন ঘটে অথবা কোন নাশকতামূলক প্রচেষ্টার কারণে ঐসব পণ্য ও পথ ধ্বংস হয় তবে চুক্তির স্বাভাবিক ধারা বা শর্তানুযায়ী বাংলাদেশকে সমুদয় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে লাগাতার হরতাল, ধর্মঘট বর্তমানে একটি অত্যন্ত সাধারণ চর্চা। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের

www.pathagar.com

উপর দিয়ে যদি ট্রানজিটের মাধ্যমে ভারতের মিজোরাম বা ত্রিপুরায় ভারতিয় মালামাল আনা-নেয়া করা হয় তবে তা স্বাভাবিক কারণেই ভারতের মিজো, লুসাই, ত্রিপুরা অথবা অন্যান্য স্বাধীনতাকামী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলবে। তারা বাংলাদেশের চাকমা বা ত্রিপুরা বিপথগামীদের সহযোগিতায় সহজেই বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরসহ ট্রানজিট পথের নানা সড়ক, রেলপথ, পুল-কালভার্ট-ব্রিজ ইত্যাদিসহ আরো নানা স্থাপনায় নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাতে পারে- যা হবে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার জন্য দারুণ ক্ষতিকর।

* ভারতকে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে পণ্য পাঠাতে বর্তমানে বাধ্য হয়ে উঁচুমূল্য ও ট্যারিফ (নিজ পণ্যের উপর) নির্ধারণ করতে হয়। এর ফলে বর্তমানে ঐসব উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ তুলনামূলক কম মূল্যে পণ্যাদি রফতানি করে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য সুবিধা লাভ করে থাকে। এ থেকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আয় লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু ভারত ট্রানজিট সুবিধা পেলে ওসব রাজ্যে বাংলাদেশ এ সুবিধা এবং আয় থেকেও বঞ্চিত হবে। কারণ ভারতিয় বিপুল, সস্তা ও উন্নতমানের পণ্য সম্ভারের সহজ প্রবাহের ফলে বাংলাদেশের পণ্যাদি সহজেই প্রতিযোগিতায় মার খাবে।

* ট্রানজিট সুবিধা না থাকলে বাস্তব কারণে ভারতকে তার বহু মূল্যবান অথচ প্রয়োজনীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পণ্য সামগ্রী যেমন ঃ কাঠ, বনজ সম্পদ, নানা ধরনের খনিজ সম্পদ এমনকি চা, রাবার, ফলমূল ইত্যাদি খুব কম মূল্যে বাংলাদেশে রফতানি করতে বাধ্য হতে হবে। যা বর্তমানেও অনেকটা কার্যকর। যেমন ভারতের মেঘালয়ের কাঠ, কয়লা, কমলা ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে লাভজনক ও কম মূল্যে আমরা আমদানি করতে পারি। ভারত বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা পেলে তখন এসব পণ্য সহজেই কলকাতা বন্দরে যাবার সুযোগ পেলে বাংলাদেশ বর্তমানের সুযোগ হারাবে।

এভাবে বাণিজ্যিক ও আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করলে দেখা যায় যে, ট্রানজিট ব্যবস্থা ভারতের জন্য অপরিহার্য হলেও বাংলাদেশের জন্য তা মোটেও লাভজনক বা অনুকূল হবে না।

www.pathagar.com

ট্রানজিটের স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দিলে আমরা একদিকে যেমন লাভ করতে পারি কয়েকশ' কোটি রূপীর আর্থিক সুবিধা, ঠিক একই সাথে ট্রানজিটের খেসারত হিসাবে আমরা লাভ করব নানা ধরনের সংক্রমিত, ছোঁয়াচে ও দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধির বোঝা। ট্রপিক্যাল রোগসমূহের ঘাঁটি বলে খ্যাত ভারত বিশ্বের প্লেগ, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠরোগ, গোদ, কালাজ্বর, টাইফয়েডসহ আরো অসংখ্য রোগ-বিমারের জন্য কুখ্যাত। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় বড় বড় শহর-নগরে আর বৃহত্তর মহানগরী বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, কলকাতা, কানপুর ইত্যাদি স্থানে যে কোন সময় প্লেগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে (WHO, 1993)। মাত্র কয়েক বছর আগে ভারতের কয়েকটি বড় শহরে দাবানলের মত ভয়াবহ প্লেগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে কয়েকশ' লোক প্রাণ হারায়। প্লেগের অন্যতম বাহন ইঁদুর ('গনেশের বাহন' বলে হিন্দুদের কাছে পূজনীয়) যে কোন বাণিজ্য পণ্যের বোঝা বা পরিবহন মাধ্যমে (ট্রাক, বাস, জাহাজ ইত্যাদিতে) খুব সহজেই এক স্থান থেকে দ্রুত দূরবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে মাত্র ২/৩ দিনের মধ্যে রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে দিতে পারে। ভারতের গত প্লেগের সময় এভাবেই দূরপাল্লার ট্রাকের মাধ্যমে ইঁদুর দ্বারা গুজরাট রাজ্যের প্লেগ প্রথমে দিল্লী এবং দিল্লী থেকে দেড় হাজার কিলোমিটার দূরবর্তী কলকাতার ঘিঞ্জি বস্তি এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে (যুগান্তর, আনন্দবাজার, হিন্দুস্তান টাইমস)। বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট লাভ করলে একই প্রক্রিয়ায় ভারতের যে কোন ভয়াবহ রোগ, খুব সহজেই দ্রুত বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সকল শহর-বন্দর ও দূরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে বলে যৌক্তিক আশংকা করা যায়।

ট্রানজিটের সবচেয়ে বড় কুফল হবে আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর ও দূরারোগ্য ব্যাধি এইডস ভাইরাসের বাংলাদেশে ব্যাপ্তি লাভ। পাপ কাজের শাস্তি হিসাবে এ মরণব্যাধি বর্তমানে বিশ্বের ধনী-গরিব, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সকল জাতি ও দেশের লোকদের উচ্ছৃংখল বল্গাহীন পাপাচারের ফলশ্রুতিতে খুব দ্রুত বিশ্বে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে। অতি সাম্প্রতিক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন জরিপ থেকে জানা গেছে যে, বর্তমানে ভারতে প্রায় ২০ লাখ লোক এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত এবং আগামি ১০ বছরের মধ্যেই ভারতের মোট ৫ কোটি লোক

www.pathagar.com

এইডস-এ আক্রান্ত হবে (WHO, 1996)। একমাত্র কলকাতা মহানগরীতে প্রায় ৫০,০০০-এর বেশিসংখ্যক লোক এই রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত বলে ভারতিয় পত্র-পত্রিকা খবর প্রকাশ করেছে। ভারতের বৃহত্তম পতিতালয়সমূহ ট্রাক ও বাস ড্রাইভার, হেলপার এবং পরিবহন ব্যবস্থার সাথে জড়িত শ্রমিকদের মধ্যে এইডস ও অন্যান্য মারাত্মক ঘাতক যৌনব্যাধি যেমন– সিফিলিস, গণোরিয়া, হার্পিস ইত্যাদি খুব দ্রুত ছড়িয়ে দিতে বা সংক্রমিত করতে সাহায্য করছে। একমাত্র কলকাতার বিশালায়তন পতিতালয়গুলোতেই প্রায় লক্ষাধিক পতিতা দেহ ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছে বলে ভারতের পত্র-পত্রিকা, সংবাদ ও রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট প্রথা চালু হলে ভারতিয় পরিবহন শ্রমিকদের (ট্রাক, জাহাজ বা অন্য পরিবহন যানের চালক, হেলপার বা শ্রমিক) মাধ্যমে খুব দ্রুত বাংলাদেশে ঐসব মরণব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে। ঘন জনবসতি, অনুন্নত ও দুর্বল প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা আর দুর্বল প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশ এইডসসহ যে কোন ট্রানজিট-সংক্রমণজাত রোগ বা মহামারির বিস্তার লাভ বন্ধ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে। তার ফলে অত্যন্ত গরিব আর বিপুল জনভারাক্রান্ত বাংলাদেশকে কয়েক'শ কোটি টাকার ট্রানজিট ফি লাভের আশায় কয়েক হাজার কোটি টাকার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বাজেটের ধাক্কা সামলানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে হবে।

ট্রানজিটের রাজনৈতিক ও আইন-শৃংখলা সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতকে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতায়াতের ট্রানজিট সুবিধা দিলে বাংলাদেশকে অবশ্যই কিছুটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আইন-শৃংখলা ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া মোকাবিলা করতে হবে। ট্রানজিটের আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হবার পূর্বেই এখানে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বিরোধী দল বিএনপি বৃহত্তম সংগঠিত রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য প্রায় সকল দল ও গ্রুপ ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার বিরুদ্ধে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। হয়ত ট্রানজিটের আলোচনা শুরু হওয়া মাত্রই দেশে আবার তীব্র প্রতিরোধ, হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধসহ জ্বালাও-পোড়াও শুরু হয়ে যাবে-এমন আলামত দেখা যাচ্ছে। ট্রানজিট ইস্যুতে জাতি আবার বিভক্ত হয়ে হানাহানিতে লিপ্ত হতে পারে। দেশের বুদ্ধিজীবীগণ ও চিন্তাশীলরা এই ট্রানজিট প্রস্তাবনাকে মার্চ,

www.pathagar.com

১৯৯৭-এ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার অত্যন্ত বিতর্কিত ও ধিকৃত '২৫ সালা মৈত্রী চুক্তি'র মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর নতুন আঙ্গিকের গোপনীয় নবায়ন চক্রান্ত হিসাবে চিহ্নিত করতে শুরু করেছেন। উল্লেখ্য, বিগত সাধারণ নির্বাচনে দেশের সবক'টি রাজনৈতিক দলই (আওয়ামী লীগসহ) ভারতের সাথে সম্পাদিত (শেখ মুজিবের সরকার কর্তৃক) ঐ বিতর্কিত পঁচিশ সালা মৈত্রী চুক্তিকে আর নবায়ন না করার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন। ফলে ঐ চুক্তির ধারাসমূহকে (ভারতের স্বার্থে) বজায় রেখে গোপনে অন্য নামে বিভিন্ন আত্মবিধ্বংসী 'ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি' বর্তমান সরকার করতে যাচ্ছে বলে বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল বক্তব্য প্রদান ও আগাম প্রতিবাদ তুলতে শুরু করেছে। আর আওয়ামী লীগ দায়িত্বশীলদের নানা বক্তব্যও এসব আশংকাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। তাঁরা কখনো জোরালোভাবে দেশের স্বার্থ বিরোধী এ ট্রানজিট চুক্তির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করছেন না। ফলে সাধারণ মানুষের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হতে শুরু করেছে। তারা যদি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ফারাক্কার পানির ন্যায্য হিস্যা (শুকনা ঋতুতে ৪৪ হাজার কিউসেক), শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে নেপালের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ট্রানজিট, বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূ-খণ্ড দক্ষিণ তালপট্টির অধিকার, মুহুরির চরের দখল আর তিনবিঘা করিডোরের স্থায়ী লিজ ইত্যাদি ভারতিয় একতরফা এখতিয়ারভুক্ত সমস্যার সমাধান বা বাংলাদেশের ন্যায্য দাবি-দাওয়া পূরণ করতে পারেন- কেবল তখনই ভারতকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট দেবার চিন্তা বা আলোচনায় হাত দেয়া যেতে পারে। অন্যথায় বাংলাদেশে দেখা দেবে তীব্র অশান্তি ও রাজনৈতিক অসন্তোষ। রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাড়াও ট্রানজিট ব্যবস্থার বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের মারাত্মক অপরাধ-প্রবণতার বৃদ্ধি ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি দেখা দিতে পারে। ট্রানজিট পরিবহনের সুযোগ ভারতের হাজার হাজার দাগি আসামি, পলাতক অপরাধী, আন্তঃরাজ্য ডাকাত-দস্যু ও তস্করের দল দলে দলে ঢুকতে থাকবে বাংলাদেশের নগরে-বন্দরে আর গ্রামীণ জনপদে। চোরাকারবারি, মাদক ব্যবসায়ী (ফেনসিডিল, গাঁজা, চরস, আফিম, ভাং, হেরোইনসহ নানা ধরনের নেশা ও মাদক দ্রব্য) আর নারী পাচারকারি মিশে যাবে ঘন জনবসতিপূর্ণ শহর-বন্দরের স্থানীয় অপরাধী চক্রের মাঝে এবং এভাবে খুব দ্রুতই খাল কেটে কুমির আনার মতই অপরাধ, মাদকাসক্তি আর নানা মারাত্মক কালব্যাধি সারা সমাজকে ধ্বংস করে দিতে তৎপর হয়ে উঠবে- এই ট্রানজিটের প্রভাবে।

www.pathagar.com

ট্রানজিটের ভূ-রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা প্রেক্ষিত

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার ট্রানজিট বিনিময়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ স্বার্থকে ভারত দেখিয়ে থাকলেও এর পেছনে তার ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে যৌক্তিকভাবে ধারণা করা যায়। দক্ষিণ এশিয়ার পূর্ব-প্রান্তে অবস্থিত ১,৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ১২ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ, বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম সামরিক শক্তি এবং ২য় বৃহত্তম জনশক্তির বৃহত্তম প্রতিবেশী ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি পার্বত্য রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচলকে প্রায় ভূ-পরিবেষ্টিত পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরাম থেকে সরাসরি বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব মাত্র ৬০/৭০ মাইল হলেও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের অবস্থানের কারণে ভারতকে সমুদ্র সংযোগের জন্য মিজোরাম থেকে প্রায় ২০০০ কিঃমিঃ পথ পাড়ি দিতে হয় শিলিগুঁড়ি করিডোরের সংকীর্ণ পথে উত্তরবঙ্গ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা বা হলদিয়া বন্দরে পৌঁছতে। ঠিক একইভাবে ভারতের অন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার দক্ষিণতম বন্দর সাব্রুম (নদী বন্দর যা ফেনী নদীর সাথে যুক্ত) বঙ্গোপসাগর থেকে মাত্র ৩০/৪০ মাইল দূরে অবস্থান করলেও বাংলাদেশের ফেনী জেলার অবস্থানের জন্য তাকে সমুদ্রের জন্য পূর্বের ঐ একই পথ ঘুরে যেতে প্রায় দেড়-দু'হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়। আসামসহ ঐসব রাজ্যের মোট ৫/৬ কোটি বাসিন্দার বেশির ভাগই মঙ্গোলীয় জাতিতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং এরা বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ উপজাতীয় বা ভিন্ন ক্ষুদ্র ভাষাতাত্ত্বিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ভারতের প্রায় দেড় লাখ বর্গ কিঃমিঃ আয়তন জুড়ে ছড়ানো ঐ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর উত্তর ও পূর্ব সীমানায় অবস্থান ভারতের এককালীন 'জানি দুশমন' চীন; বিশ্বের পরবর্তী পরাশক্তি। মাত্র দু'যুগ আগে ১৯৬২ সালে চীন বিখ্যাত 'ম্যাকমোহন লাইন' অতিক্রম করে মাত্র দু'তিন দিনেই দখল করে নিয়েছিল প্রায় আধাআধি আসাম ও সম্পূর্ণ অরুণাচল প্রদেশ (তৎকালীন NEFA)। ঐ অঞ্চলে ভারতের অন্য সীমান্ত শরিক হচ্ছে দক্ষিণের মায়ানমার। মায়ানমারও প্রায়শই ভারতিয় মিজো, লুসাই, মনিপুরী, কুকি এবং

www.pathagar.com

উলফা বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। অবশ্য ভারতও এ বিষয়ে মোটেই পিছিয়ে নেই। ভারত সব সময়ই মায়ানমারের বিদ্রোহী শান, কোচিন ও কারেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভারতের মাটিতে আশ্রয় এবং চাকমা শান্তি বাহিনীর মত প্রশিক্ষণ দান ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে থাকে বলে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এভাবে ভারতের এ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভূ-ভাগ একদিকে যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের তৎপরতায়, আক্রমণে ও নাশকতায় এবং ভারতিয় সেনাবাহিনী ও বিএসএফ-এর প্রতি আক্রমণে সরগরম রয়েছে, তেমনি এ স্থানে রয়েছে চীন, মায়ানমারসহ অন্যান্য বহিঃশক্তির সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ, অভিযান ও সৈন্য সমাবেশের বহুমুখী সম্ভাবনা। বিশ্বের ভবিষ্যৎ পরাশক্তি, উঠতি শিল্প ও অর্থনৈতিক মহাশক্তি এবং বর্তমানের অন্যতম সামরিক (পরমাণু শক্তিধর) শক্তি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র চীন এ অঞ্চলে তার স্বাভাবিক স্বার্থ দেখতে পায়। এ অঞ্চলের উপর দিয়েই চীনকে ভারত মহাসাগরের প্রবেশদ্বার বঙ্গোপসাগরে পৌঁছতে হবে। এ জন্য চীনে ইউনান প্রদেশ দিয়ে চীন আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র ৭ থেকে ৮শ' কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছাতে পারে। এ জন্য অবশ্য চীনকে ভারত-বাংলাদেশের সাথে বোঝাপড়া করে আপোসে আসতে হবে; অথবা ভবিষ্যতের একটি স্বাধীন চীনপন্থি মঙ্গোলীয় উলফা প্রভাবিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ফেডারেশনের (যাতে বাংলাদেশের চাকমা প্রভাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামেরও সম্ভাব্য অংশগ্রহণের আশংকা রয়েছে) উপর দিয়ে আসতে হবে। চীনের তৃতীয় সম্ভাব্য পথটি হবে সিকিম ও ভুটানের উত্তরাঞ্চলীয় পার্বত্য উপত্যকার উত্তরের সীমান্ত সংলগ্ন চীনের দক্ষিণতম (ভূ-রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) চুম্বি ভ্যালি। এ পথে মাত্র ৬৩ মাইল ভারতিয় পার্বত্য ভূমি ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চল পেরিয়ে সরাসরি দক্ষিণে নেমে এসে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের তেঁতুলিয়া। পরে 'বন্ধুপ্রতীম' বাংলাদেশের আনুকূল্যে অথবা তাদেরকেও পরাভূত করে বাংলার বিস্তীর্ণ পলল সমভূমির উপর দিয়ে সড়ক রেল ও নৌপথে বাংলাদেশকে মাড়িয়ে মংলা বন্দর হয়ে সহজে বঙ্গোপসাগরে যাবার তিনশ' মাইল দূরত্বের পথটি। আর এ পথে যেতে হলেও চীনকে মোকাবিলা করতে হবে তার প্রধানতম দুশমন ভারতকে এবং বাংলাদেশের জনগণ চীনকে যদি ছাড় দেয়ও তবু বিশ্বের 'এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা (Uni-polar World System)' এর প্রবক্তা যুক্তরাষ্ট্র ও তার

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের সঙ্গী-সাথী যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম ইউরোপ ভারতের সাথে স্বার্থের কারণে গাঁটছড়া বেঁধে একাট্টা হয়ে এখানকার সমতল প্রান্তরে চীনকে রুখে দাঁড়াবে তীব্রভাবে। ভারত মহাসাগরের মার্কিন নৌ-বেস দিয়াগো গার্সিয়া থেকে দ্রুত ধেয়ে আসবে মার্কিন বিমানবাহী জাহাজের বহরসহ নানা অবতরণ যান ও হাজার হাজার মেরিন সৈন্য। ভারতের বঙ্গোপসাগরের শক্তিশালী নৌ-ঘাঁটি আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের সকল সামরিক বেসসমূহ (পোর্ট ব্লেয়ারসহ) হয়ে উঠবে তৎপর। চীনকে রুখার জন্য ইতোমধ্যে ভারত শিলিগুঁড়ি করিডোরের কাছে বাংলাদেশের উত্তরতম বিন্দু বাংলাবান্দা ঘেঁষে নকসালবাড়ির বাগডুগরায় গড়ে তুলছে তার উত্তর-পূর্বাংশের বৃহত্তম বিমান ঘাঁটি। তাছাড়া আসামের তেজপুর, কলাইকুন্তা, ডিব্রুগড়, লামডিংসহ আরো বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে ভারত অন্তত ২৫/৩০টি সামরিক বিমান ঘাঁটি ও এয়ার স্ট্রিপ তৈরি করেছে। শুধু চীনের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আক্রমণ ও প্রবণতা প্রতিরোধ করতে, ভারতকে প্রায় ৩/৪ লাখ স্থল ও বিপুল বিমান সেনাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্থায়ীভাবে মোতায়েন করতে হয়েছে। তারপরও নিশ্চিত হতে পারছে না ভারত। শিলিগুঁড়ি করিডোরের উত্তরে স্বাধীন পাহাড়ি স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র নেপাল ও ভুটান এবং দক্ষিণে 'বেয়াড়া' স্বাধীনচেতা মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। নেপালে ইদানিঙ প্রায়শঃই তীব্র ভারত বিদ্বেষী স্বাধীনচেতা ও চীনঘেঁষা বাম রাজনীতির তেজিভাব লক্ষ্য করছে ভারত। যে কোন সংকটের মুহূর্তে ভারত বিদ্বেষী চীনঘেঁষা নেপাল ভারতের শিলিগুঁড়ি করিডোর বন্ধ করে দিতে পারে বলে ভারতের কৌশলবিদগণ মনে করেন (Sukhwal, 1971)। আর এমন সংকটের সময় ভারতকে বাধ্য হয়ে জোর করে (Transit না পেলে) বাংলাদেশের 'রংপুর শেডল্' ওভার রান (Over-run) করে বা মাড়িয়ে গিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বাকি অংশের সাথে সংযোগ বজায় রাখার মত ভীষণ ঝুঁকি বহন করতে হতে পারে (Subrahmanyam, 1983)। আর এমন ঝুঁকি এড়ানোর জন্যই একান্ত সামরিক প্রতিরক্ষা ও ভূ-রাজনৈতিক কারণেই ভারতের প্রয়োজন ট্রানজিট চুক্তির আশু সম্পাদন ও বাস্তবায়ন। এ জন্য ভারত তার পাশ্চাত্যের মিত্রদের (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইসিসহ বিভিন্ন খ্রিস্টাদর্শের মুক্ত অর্থনীতি আদর্শভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ) দূতিয়ালী ও মধ্যস্থতার দ্বারস্থ হয়েছে। ইতোমধ্যে ঐসব দেশ ট্রানজিটের যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক বাংলাদেশকে

www.pathagar.com

প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত প্রয়োজনে আর্থিকভাবে নির্ভরশীল বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর ফান্ড বন্ধ করে দেবার ভয় দেখিয়ে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতকে ট্রানজিট প্রদানে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক কারণেই চীনকে প্রতিহত করার জন্যই একটি অখণ্ড ও শক্তিশালী উদার, গণতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের অস্তিত্ব চায় এবং এজন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ সমস্ত পাশ্চাত্য কোন মতেই নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম বা আসামকে স্বাধীন দেখতে চাইবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা বাংলাদেশেও চীনের বেশি 'কাছের জন' হিসাবে পছন্দ করবে না। বরং তারা একটি ভারত ঘেঁষা, ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার মুক্ত অর্থনীতির গণতন্ত্রী বাংলাদেশ চাইবে। আর এজন্যই তারা মনে প্রাণে চাইবে ভারত যেন তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে সংযোগকারি ট্রানজিট সুযোগ বাংলাদেশের কাছে থেকে পেয়ে যায়। ভারতের স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যও তাদের বাণিজ্যিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে। ভারতের ট্রানজিট রুটসমূহ নিরাপদ রাখতে ও তাদের স্বার্থের রক্ষকদের রক্ষা করা, নিরাপদ রাখা ও তাদের চালু করা 'New Economic World Order' বা 'Uni–polar Global System' কে বজায় রাখার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রসহ খ্রিস্টজগৎ বাংলাদেশে জনসেবার ছদ্মাবরণে সহস্র কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তুলেছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ 'NGO Network'। তারা এসব এনজিও'র তৎপরতার মাধ্যমে একভাবে যেমন আপাতঃ নগ্ন হস্তক্ষেপ দেখানো ছাড়াই স্থানীয় প্রতিভূদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমগ্র পাওয়ার স্ট্রাকচারকে দখল করে নিতে পারছে ঠিক তেমনি অন্যদিকে তারা তাদের প্রয়োজনে এসব এনজিওদের চক্রান্তের মাধ্যমেই দেশিয় ছদ্মাবরণে তছনছ করে দিতে পারবে এ দেশের সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, শান্তি-শৃংখলা, সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো ও জনজীবনে গভীরভাবে গ্রোথিত ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ। একটু গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের এসব বৃহৎ এনজিওসমূহ দেশের বিভিন্ন সামরিক ও ভূ-কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে (Strategically significant places) এবং যোগাযোগ লাইনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ও সরবরাহ পথ বরাবর গড়ে তুলেছে তাদের প্রজেক্ট সেন্টারসমূহ যা দেখতেও ব্যবহারিক দিক দিয়ে দুর্গতুল্য ও দুর্ভেদ্য। প্রয়োজনের

www.pathagar.com

সময় ভারতিয় ট্রানজিট ব্যবস্থাকে বা পাশ্চাত্যের সরবরাহ লাইনকে প্রটেকশান দিতে (Protection coverage) দেশের বৃহত্তম এনজিওদের এসব দুর্গম ও বিশাল দুর্ভেদ্য ঘাঁটিগুলো দারুণভাবে কাজ করবে। তাছাড়া সমবায়ভিত্তিক আর্থিক সহযোগিতা, ঋণের বন্ধন ও গণশিক্ষার মোটিভেশনাল মগজ ধোলাই-এর বিপুল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে ভারত ও পাশ্চাত্যের স্বার্থ ও আদর্শের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে ও প্রয়োজনে তাদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও এসব এনজিও এবং তাদের স্থাপনাসমূহ বিশ্বস্তভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বলে অনুধাবন করা যাচ্ছে। আর এজন্যই এসব এনজিওদের স্বার্থে একটু আঘাত লাগলেই বলিষ্ঠভাবে সরাসরি সহযোগিতায় এগিয়ে আসে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংস্থার স্থানীয় রাষ্ট্রদূতগণ। এমনকি বর্তমানে এসব এনজিওদের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা, অর্থ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মত গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোকে পরিচালনার জন্য বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা সংস্থাগুলো সরকারকে খোলাখুলি আহবান জানাচ্ছে। আর ঐ একই কারণে বাংলাদেশের এনজিওদের সম্মিলিত কেন্দ্রীয় সংগঠনের আর্থিক মদদপুষ্ট দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল দৈনিকটি সব সময়ই ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের পক্ষে জোরালো জনমত গড়ে তুলতে গলদঘর্ম হচ্ছে ও সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে সুপারিশ করছে। এসব তৎপরতাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। কারণ, এসবই যে একই সূত্রে গাঁথা তা একটু খতিয়ে দেখলেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চট্টগ্রাম বন্দর ও ট্রানজিট ইস্যু

বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম ভারত-বাংলাদেশ প্রস্তাবিত ট্রানজিট ইস্যুতে বর্তমানে এক তুমুল বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতের উপস্থাপিত ট্রানজিট প্রস্তাবনায় সে দেশের উত্তর-পূর্বঞ্চলীয় 'সাতবোন রাজ্যমালা'-য় ভারতের পশ্চিমাঞ্চলসহ বাকি রাজ্যসমূহের মালামাল, যন্ত্র, যান ও জন (Man, Machine and Materials) স্থানান্তরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে ব্যবহার করার কথা বলায় এবং পরবর্তীতে ভারত ও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ চট্টগ্রাম বন্দরের ট্রানজিট সংক্রান্ত ভূমিকার কথা গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করায় ইস্যুটি ট্রানজিট বিতর্কের অন্যতম উপাদান হিসাবে স্থান লাভ করে।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম বন্দরের আর্থনীতিক ভূমিকা, ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং ভূ-প্রাকৃতিক ও সমুদ্রতাত্ত্বিক বাস্তবতার (Economic Role, Geo-political Significance and Geomorphological and Oceanographic Realities of Chittagong Port) প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে ভারতের ট্রানজিট প্রস্তাবনায় বিভিন্ন জটিল ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, কোন যুক্তিতেই বন্দরটি বর্তমানে ভারতের বিপুল ট্রানজিট সুবিধাপ্রাপ্ত মালামাল পারাপারে বা পরিবহনে সক্ষম নয়। এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বর্তমানে দেশের প্রায় ৭৫% সমুদ্রবাহিত আমদানি-রফতানি বাণিজ্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। বর্তমানে এ বন্দরের বাণিজ্যের প্রায় ৮০% হচ্ছে আমদানি তৎপরতা ও ২০% রফতানি তৎপরতা (Bangladesh Economic Review, 1996) । ১৯৯৫-'৯৬ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে মোট প্রায় ১১,০০০,০০০ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি-রফতানি করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ৯,৫০০,০০০ মেঃ টন ছিল আমদানি বাণিজ্য ও বাকি ১,৫০০,০০ মেঃ টন ছিল রফতানি। অন্যদিকে দেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর চালনার মাধ্যমে এ বছর (১৯৯৫-'৯৬) বহির্বাণিজ্য হয় মাত্র ৩,০০০,০০০ টন (প্রাগুক্ত, ১৯৯৬)। বাংলাদেশের শিল্পে কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ, কলকব্জা, অপরিশোধিত খনিজ তৈল, কয়লা, খাদ্যশস্য, সিমেন্ট, খনিজদ্রব্য, মোটর গাড়িসহ নানা ধরণের যান্ত্রিক বাহন নির্মাণ সামগ্রীর সিংহ ভাগই এই বন্দরের মাধ্যমে দেশে আনা হয়। অন্যদিকে এই বন্দরের মাধ্যমে দেশের চা, পোশাক, চামড়াসহ নানা ধরণের পণ্য বিশ্বের বাজারে রফতানি করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে বাংলাদেশের প্রায় ৭০% আর্থনীতিক তৎপরতার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সংযোগ রয়েছে। এই বন্দরটি যদি কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায় বা কোন জটিলতা বা চক্রান্তের ফলে যদি এ বন্দরের স্বাভাবিক তৎপরতা বিঘ্নিত হয় তবে তা সমস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকেই পঙ্গু ও বিপর্যস্ত করে দেবার জন্য যথেষ্ট।

ভারতের ট্রানজিট বাণিজ্যের অতিরিক্ত ভার বহনে চট্টগ্রাম বন্দর সক্ষম কি না এবং এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনীতিতে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে-তা যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণা কাজটি পরিচালনা করা হয়। গবেষণা কাজে ভূ-উপগ্রহ চিত্র (Satellite Imageries), নতুন ও পুরাতন মানচিত্র (Maps and Topogrphic Sheets), পানিতাত্ত্বিক চার্ট ও সমুদ্র উপকূলীয় তলদেশীয়

www.pathagar.com

সমোন্নতি রেখাযুক্ত মানচিত্র (Hydrographic and Oceanograhic Coastal Bathymatric Charts), চট্টগ্রাম বন্দর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূমি ব্যবহার ও ভৌগোলিক অবস্থানচিত্রের রিপোর্ট এবং নানা আর্থ-সামাজিক ও ভূ-কৌশলগত উপাত্ত (Socio-Economic and Geo-Strategical Data and Information) ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের এক চরম গতি সঞ্চার হয়েছে এবং এ উন্নয়ন ও আর্থনীতিক তৎপরতার জোয়ার আরো বেগবান হবে আগামি বছরগুলোতে। বাংলাদেশ সরকারের রিপোর্টসমূহ ও নানা বেসরকারি গবেষণা প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, মাত্র ২০/২২ বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্বাণিজ্য বর্তমানে প্রায় ২০০/৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে (Bangladesh Bureau of Statistics, 1995)। বর্তমান হারের প্রবৃদ্ধিতে মাত্র ১০/১২ বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে দেশের আমদানি ও রফতানি বাণিজ্যের হার আরো দেড় থেকে দুইগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এর জন্য শুধু বাংলাদেশের স্বীয় বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই চট্টগ্রাম বন্দরের অবকাঠামোগত ও ক্ষমতাগত বিপুল উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু নানা ভূ-রূপতাত্ত্বিক, নদীতাত্ত্বিক ও সমুদ্রতাত্ত্বিক (Geomorphological, Fluvio-morphological and Oceanographical Limitations) সীমাবদ্ধতার জন্য অতীব প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম বন্দরের ক্ষমতা ও পরিসরকে খুব একটা বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়। আদতে আধুনিক চট্টগ্রাম বন্দর ভারতের কলকাতা বন্দরের একটি সহযোগী বন্দর বা 'Ancillary Port' হিসাবে গড়ে উঠে (B.E.R., 1994)।

অতি প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম বন্দর চীন, দূরপ্রাচ্য, জাভা, সুমাত্রা, আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বজায় রাখত। ঐ সময় পালের জাহাজের সাহায্যে এ অঞ্চলের পণ্য সামগ্রী ঐসব দূরবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করা হত। ১৫১৭ সনের দিকে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রথম ইউরোপীয় বাণিজ্য স্থাপনা গড়ে তোলে পর্তূগীজরা (Karim, 1964)। তারা চট্টগ্রামকে 'Porto Grando' বা মহাবন্দরী বলে উল্লেখ করত এবং এর অনেক পরে বৃটিশ বণিকরা মুখে বাণিজ্যের কথা বলে ধূর্ত কূটনৈতিক চালে ভাগীরথী-হুগলী তীরবর্তী তিনটি গ্রাম-সূতানটী, কালীঘাট ও জমিদারি মোঘলদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় এবং ক্রমে মোঘলদের দুর্বলতার সুযোগ ও বাংলার নবাবদের (আলীবর্দী খাঁ ও সিরাজউদ্দৌলার সময়) অন্তঃদ্বন্দ্বের রন্দ্রপথে তারা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপন

www.pathagar.com

করে, কলকাতা বন্দর ও নগরী এবং এক সময়ে অনুনয়-বিনয় দেখিয়ে নেয়া বাণিজ্যিক-ট্রানজিট ও ইজারার সুযোগে কলকাতার অত্যন্ত ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে তারা সমস্ত ভারতবর্ষে তাদের উপনিবেশ স্থাপন ও আগ্রাসনের উপায় হিসাবে দক্ষভাবে কাজে লাগায়।

১৯৪৭ সনের ভারত বিভক্তির পর চট্টগ্রাম বন্দরে মাত্র ২,৪৩,০৮৩ টন মালামাল ওঠানামা করতো। ঐ সময় বন্দরটিতে মাত্র ৬টি স্থায়ী জেটি ও কয়েকটি ওয়্যারহাউস ও গুদাম ছিল। ১৯৬১ সনে তা বেড়ে ১৩টি জেটি ও আরো ৪টি ভাসমান অস্থায়ী পল্টুন জেটিতে রূপলাভ করে (Ahmed and Rahman, 1962)। ১৯৭১ সনে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রায় ৫০ লক্ষ টন মালামালের আমদানি ও রফতানি সংঘটিত হয়। ২৫ বছর পর গত বছর (১৯৯৫-৯৬) এই বন্দরে মোট প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টন মালামালের আমদানি ও রফতানি হয়। এ পরিসংখ্যান থেকেই চট্টগ্রাম বন্দরের ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক ও বাণিজ্যিক তৎপরতার চিত্র দেখা যায়। আশা করা যায় যে, আগামি ১০ বছরে ঐ বাণিজ্যিক তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পেয়ে কমপক্ষে ২.৫০ কোটি টনে দাড়াবে। তখন শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় স্বীয় আমদানি-রফতানির স্বার্থেই ঐ বিপুল বাণিজ্যিক পরিবহণ কার্যক্রম সম্পাদনে চট্টগ্রাম বন্দরকে হিমশিম খেতে হবে।

চট্টগ্রাম বন্দরী নামে ও তৎপরতায় একটি সমুদ্রবন্দর হলেও অবস্থানগত ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তা মূলতঃ এক খাঁড়ি দেশিয় (Estuarine Port) । বন্দরটি কর্ণফুলী নদীর মোহনা (Mouth) থেকে প্রায় ১৪/১৫ কিঃ মিঃ উজানে নদীর ডান তীরে অবস্থিত। উপকূলীয় ও নদীতল দেশিয় পানিতাত্ত্বিক চার্ট ও টপোশীট বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বর্তমানে কর্ণফুলী নদী ও তার নিম্ন অববাহিকার খাঁড়ি অঞ্চল সংলগ্ন মোহনা ও উপকূলীয় অগভীর মহীসোপান অঞ্চল (Lower Channel, Estuarine Course and Adjacent Off-shore shallow Continental Shelf Region) চট্টগ্রামের মত একটি ক্রমবর্ধমান বন্দরের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। বিভিন্ন গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় যে, কর্ণফুলী নদীটি মোহনার কাছে একটু প্রশস্ত হলেও বন্দরের কাছে এর প্রশস্ততা কোন স্থানে মাত্র ১৫০/২০০ মিটার। সর্পিল আকৃতির নদীটির মোহনায় ও সম্পূর্ণ নিম্নধারা (Lower Reach) জুড়ে রয়েছে অসংখ্য মগ্ন অগভীর চড়া ও

www.pathagar.com

মোহনা দেশিয় দ্বীপ। এর মধ্যে মোহনার নিকটস্থ 'Outer Bar' ও এর ২ কিঃ মিঃ উজানের 'Inner Bar' নামক দুটি চড়া নিরাপদ নৌ-বা জাহাজ চলাচলের জন্য খুবই বিপজ্জক (Karim, 1964, Ahmed and Rahman, 1962, Satellite Images, SPARRSO, 1995) । তাছাড়া সকল বৃহদাকার সমুদ্রগামী জাহাজকে পণ্য নিয়ে কর্ণফুলী মোহনার ১৫/২০ কিঃ মিঃ দূরে অপেক্ষাকৃত গভীর মহীসোপান অঞ্চলে নোঙ্গর করতে হয় এবং ক্ষুদ্রাকৃতির বার্জ বা লাইটারেজ-এর মাধ্যমে ঐগুলো থেকে মালামাল খালাস করে ৩০/৪০ কিঃমিঃ দূরবর্তী বন্দরের জেটি সমূহে এনে তা খালাস করতে হয়। আরো বৃহদাকার ট্যাঙ্কার বা জাহাজসমূহকে আরো দূরের গভীর সমুদ্রে নোঙ্গর ফেলতে হয়। বর্তমানে এ বন্দরের প্রায় ১২০০ মাঝারি ও বড় জাহাজ মাল আনা-নেয়া করে। ১৯৯৫-৯৬ সনে চট্টগ্রাম বন্দরের বাণিজ্যিকৃত প্রায় মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ টন মালামালের সঙ্গে মোট ২৫,৩৬২০ টি.ই.ইউ.এস. (T.E.U.S.) কন্টেইনার সার্ভিস কাজ করে। কন্টেইনার সার্ভিস বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের বাণিজ্যের এক বিপুল অংশ দখল করে নিয়েছে। ১৯৯০-৯১ সনে এ ধরণের বাণিজ্য ছিল মাত্র 970-TEUS । আগামি ১০ বছরের মধ্যে এ বন্দরকে প্রায় ১ লক্ষ TEUS কন্টেইনার সার্ভিস পরিচালনা করতে হবে বলে ধারণা করা যায়। চড়াযুক্ত অগভীর সমুদ্রমোহনা ও ক্ষীণধারার কর্ণফুলীকে নাব্য রাখার জন্য নিয়মিত ড্রেজিং তৎপরতা চালাতে হয় (Chittagong Port Authority, 1996)।

কর্ণফুলী নদীর ও চট্টগ্রাম উপকূলের ভূ-রূপতাত্ত্বিক ও ভূ-গাঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বন্দরের কাঠামোগত বা অবস্থানগত খুব বেশি একটি পরিবর্তন বা উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ হিসাবে বলা যায়, সমস্ত চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে রয়েছে নিতান্ত অগভীর প্রশস্ত মহীসোপান ও কর্দমযুক্ত পলি ও বালূকাময় উপকূল রেখা। এ মহীসোপানের (Continental Shelf Zone) স্থানে স্থানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মগ্ন চড়া (Submerged Shoals) বা ডুবন্ত ক্ষুদে দ্বীপ (Satellite Imageries: SPARRSO, 1995 and Hydrographic Charts, BIWTA, 1994)। পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য সমতলীয় ও পাহাড়ি নদ-নদী (মাতামুহুরী, সাঙ্গু, কর্ণফুলী, ফেনী, মুহুরী ইত্যাদি) বাহিত বিপুল পলি সঞ্চয়ন ও উপকূলীয় দ্বীপ ও ব-দ্বীপাঞ্চলের নিয়ত নদী ভাঙ্গন ও তরঙ্গাঘাতজনিত

www.pathagar.com

ভূমিক্ষয়ের (River Bank and Coastal Erosions due to Wave and Current Attacks) ফলে কর্ণফুলী নদীর মোহনা বা কুতুবদিয়া, মহেশখালী কিংবা অন্য কোন স্থানেই সুবিধাজনকভাবে, স্বার্থক, লাভজনক ও নিরাপদ পোতাশ্রয় (Harbour) বা বন্দর (Port) গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় পরিবেশ, সমুদ্রতাত্ত্বিক ধারণা, কিংবা জলবায়ুতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞতা নিয়ে বা একান্ত হাল্কা ধারণা নিয়ে কোন কোন ব্যক্তি বা মহল নিতান্ত স্বার্থান্বেষীর মত মতলব হাসিলের জন্য বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর বা তার কোন বিকল্প অন্য বন্দর তৈরি করে (যেমনঃ কুতুবদিয়া, মহেশখালী কিংবা সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ) তা ভারতকে ট্রানজিটের নিমিত্তে ব্যবহার করার জন্য ইজারা দিতে সুপারিশ করছেন। আবার কেউ কেউ দেশের অর্থনীতি, ভূ-রাজনীতি কিংবা ভূ-কৌশলগত (Economics, Geo-politics or Geo-Strategy) বিষয়ে কোন ধারণা বা জ্ঞান না নিয়েই দেশের অর্থনীতি, ভূ-রাজনীতি ও কৌশলগত বিষয়ে নিতান্ত চটুল, মুখরোচক বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন (যেমনঃ 'Geo-Economics, not Geo-Politics'; অথবা 'Asian Highway Concept' ইত্যাদি)। এসব হাল্কা, যুক্তিহীন ও অন্তঃসারশূন্য মন্তব্য জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সকল মহলকে মনে রাখতে হবে যে, কর্ণফুলী নদীর অত্যন্ত সংকীর্ণ ধারার (Narrow Channel) খুবই সীমাব্ধ উপযুক্ত গভীর অংশ বা পরিসরই বার্জ বা লাইটারেজের চলাচলের জন্য উপযুক্ত (মানচিত্র দেখুন)।

কোন ধ্বংসাত্মক নাশকতামূলক তৎপরতার মাধ্যমে ২/৩ টি বা স্থান বিশেষে ১টি মাত্র জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম বন্দরের তৎপরতাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে স্বার্থান্বেষী মহল। ১৯৭২-৭৩ সালে ঐ বন্দরীর ডুবন্ত জাহাজ সমূহ অপসারণ করে বন্দরীকে পুরোদমে চালু করতে সোভিয়েত নৌ-প্রকৌশলীদের প্রায় পুরো একটি বছর বিশেষ তৎপরতা চালাতে হয়। তা'ছাড়া সমুদ্র পথে সহজ সংযোগ থাকার ফলে এবং অর্থনৈতিকভাবে কয়েকগুন বেশি লাভজনক (Economically Viable) হওয়ার ফলে 'Asian Highway'-র চিন্তা আমাদের না করলেও চলবে। কারণ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সহজেই এবং কম খরচে জাহাজে মায়ানমার আকিয়াব, মালয়েশিয়ার পেনাং, কুয়ালালামপুর; সিঙ্গাপুর, ইয়াঙ্গুন, ব্যাঙ্কক এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দূরপ্রাচ্য কিংবা দক্ষিণ

www.pathagar.com

ভারতের যে কোন বন্দরে বাণিজ্য সম্ভব। অন্যদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর স্বার্থে ভারতের জন্য 'ট্রানজিট' ও 'Asian Highway'-র খুবই প্রয়োজন রয়েছে এবং ভারতের এ স্বার্থ বাণিজ্যিক, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার জন্যই বেশি বাস্তব বা আশু প্রয়োজন। চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চল (উত্তর বঙ্গোপসাগর) বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ ঘূর্ণীঝড়-প্রবণ অঞ্চল অবস্থিত হওয়ার ফলে এসব উপকূল অঞ্চলে কোন কৃত্রিম পোতাশ্রয় বা বন্দর তৈরি করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও অবাস্তব।

সবশেষে বলা যায় যে, যদি সামান্য কয়েকশ' কোটি টাকার বিনিময়ে ক্ষুদ্র-ক্ষমতাসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বন্দরটির ট্রানজিট সুযোগ ভারতের ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় তবে এর খেসারত বাংলাদেশকে অচিরেই দিতে হবে। ভারত স্বাভাবিক কারণেই নিজ প্রতিরক্ষা ও ভূ-রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করবে। শুধুমাত্র বাণিজিক কারণেই বন্দরটিকে ভারত ব্যবহার করলে বাংলাদেশের প্রধানতম আমদানি বন্দরটির প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে চলে যাবে। অকল্পনীয় বাণিজ্য জটের চাপে হিমশিম খেতে হবে বাংলাদেশকে এবং কয়েকশ' কোটি টাকার লোভে বাংলাদেশকে গচ্চা দিতে হবে কয়েক হাজার কোটি টাকা আমদানি-রফতানি ঘাটতির মাধ্যমে। তাছাড়া এর ফলে এ বন্দরের উপর ভারতের স্বাধীনতাকামী বিচ্ছিন্নতাবাদী জনগোষ্ঠীগুলোর (উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় U.L.F.A. মিজো. নাগা, বড়ো বা ত্রিপুরাগণ) চরম আক্রোশ নিপতিত হবে। যার ফলশ্রুতিতে মাত্র দু'একজন আত্মঘাতী ভারতিয় মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত গেরিলার কমান্ডো হামলায় ডুবে যাওয়া দু'একটি জাহাজ দীর্ঘদিনের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরকে অকেজো করে দিতে পারে। অতি সম্প্রতি মার্কিন মদদে বিশ্ব ব্যাংকের আনুকূল্যে জাপানিরা চট্টগ্রাম বন্দরের উপর একটি জরীপ প্রতিবেদন তৈরি করেছে, যাতে ঐ বন্দরের উন্নয়ন, বর্ধণ ও স্থানান্তরসহ অবকাঠামোগত পরিবর্তনের দ্বারা এর উপযোগ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বন্দরটিকে মুম্বাই (বাম্বে) কিংবা করাচীর মানে উন্নতির কথা বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক কারণে (Morphology and Climatological Factors) জাপানি অভিমত সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং এর পেছনেও সিলেটে সংঘটিত 'সিমিটার কোম্পানি'-র চক্রান্ত ও কেলেঙ্কারীর মত ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে। এসব বক্তব্যের পেছনেও যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা'ভুক্ত অভিসন্ধি ও পাশ্চাত্যের 'অটুট ভারত রক্ষা নীতি'-র সংযোগ রয়েছে।

www.pathagar.com

উপসংহার

কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি, গবেষক ও সাংবাদিক মহল ভারতকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে স্থল ও নৌ-ট্রানজিট প্রদানের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন ও এর স্বপক্ষে নানা যুক্তি প্রদান করে চলেছেন। তাঁরা ঐ বিষয়ে ইউরোপীয় ও অন্যান্য নানা দেশের নজির তুলে ধরে এর লাভালাভ উপস্থাপন করছেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বর্তমান ট্রানজিট প্রস্তাবনার প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতের কাছে বাংলাদেশ ও নেপাল অতীতের বছরগুলোতে বারবার মাত্র ১৪/১৫ মাইলের 'শিলিগুঁড়ি করিডোর'-এর উপর দিয়ে ট্রানজিট চাইলে ভারত সাফ সাফ তা নাকচ করে দেয়। ভারত এখনো বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূমি দক্ষিণ তালপট্টিতে তার জবরদখল বজায় রেখেছে। (Rob, 1991)। ভারতিয় নৌবাহিনীর স্থায়ী ঘাঁটি দিয়ে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় জেগে ওঠা ঐ দ্বীপে ভারত তার 'তিনরঙ্গা' পতাকা উড্ডীন রেখেছে। ভারত বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত মুহুরীর চর জোর করে দখলে রেখেছে। (Azam, 1996)। আন্তর্জাতিক রীতিনীতিকে তোয়াক্কা না করে ভারত আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে বাংলাদেশে বদ্বীপ অঞ্চলের চার কোটি মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং সমস্ত উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাস্তব-পরিবেশগত (Ecological & Environmental) পরিস্থিতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে (Abbas, 1982, Hossan, 1994)। ভারত তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী বাংলাদেশকে অভিযুক্ত কয়েদি বা অপরাধীর মত অত্যন্ত অপমানজনকভাবে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিচ্ছে-তা'ও মানবতা ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির নিতান্ত খেলাফ। শুধু তাই নয়, ভারতিয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (B.S.F.) প্রায় প্রতিমাসেই বাংলাদেশের অসহায় সীমান্ত অঞ্চলের কৃষকদের অন্যায়ভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং মাঝে মধ্যেই গুলি করে হত্যা করছে। 'অপারেশন পুশব্যাক' (Operation Push Back) -এর নাম করে ভারতের নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে। ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপথগামী চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সক্রিয়ভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয়-মদদ দিচ্ছে। শান্তি বহিনীর সদস্যদের কাছ থেকে আটককৃত আগ্নেয়াস্ত্রে ভারতিয় সমর কারখানার মার্কা-চিহ্নে এদেরকে দেয়া ভারতের সহযোগিতার প্রমাণ মিলছে। এসব ছাড়াও ভারত

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র বাংলাদেশের বাজারে তার বাণিজ্যিক আগ্রাসনের প্রমাণ উপস্থাপন করে চলেছে। অর্থনীবিদগণ ছাড়াও যে কোন সচেতন বাংলাদেশি মাত্রই অবহিত রয়েছেন যে, বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্যের (Trade Balance) হার ১০০ঃ৪। ভারতিয় নিম্নমানের পণ্য সম্ভারে বাংলাদেশের বাজার প্লাবিত। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের ভারতে রফতানিযোগ্য প্রায় সকল পণ্যের উপরই ভারত সাপ্টা (SAPTA) চুক্তির নগ্ন লংঘন করে অত্যন্ত উঁচু হারের বাণিজ্য-কর বা 'ট্যারিফ' আরোপিত করে রেখেছে-যা'তে করে বাংলাদেশের পণ্য সামগ্রী ভারতিয় বাজার না পায়। ভারতের দূরদর্শণ, বেতার ও পত্র-পত্রিকা সব সময়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা, চিন্তা-চেতনা ও সাংস্কৃতিক সত্তার বিরুদ্ধে প্রচার-অপপ্রচার চালাচ্ছে। কয়েক বছর আগে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত 'সাপ্তাহিক দেশ' বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে 'তথাকথিত' বলে ব্যাঙ্গোক্তি করলে বাংলাদেশ সরকার ঐ পত্রিকার প্রচার বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ভারত সরকার এখনো বাংলাদেশের অন্ততঃ ২৫/৩০টি প্রধান নদী স্রোতের ধারায় কৃত্রিম বাঁধের সৃষ্টি করে ঐসব নদ-নদীর পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে (উদাহরণঃ সিলেটের কুশিয়ারা-সুরমা, মনু, উত্তরবঙ্গের তিস্তা, মহানন্দা)।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের এসব কু-প্রতিবেশী সুলভ আচরণ ও তৎপরতা ছাড়াও যদি অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের আচরণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় তবে আমরা ভারতের এক আধিপত্যবাদী ও 'বড় ভাই সুলভ আচরণ' (Big-brotherly attitude) দেখতে পাই। প্রায় দু'দশক আগেই ভারত তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী সিকিমকে নিজ ক্ষুধার্ত উদর গহ্বরে পুরে নেয়। অন্য দুই পার্বত্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল ও ভুটান অসহায় মেষ শিশুর মত ভারতের পররাজ্যলোভী লোলুপ লালসাময় নজরের দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ কী করে ভারতকে ক্ষীণ তনুর উপর দিয়ে তার গুরু অমার্জিত বপুরভার পারাপারের অনুমতি দিতে পারে? তা' দিলে অচিরেই বাংলাদেশকে সিকিমের মত নিস্পিষ্ট হতে হবে। দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের স্বার্থেই জাতি যেন 'ট্রয়ের ঘোড়া' বা 'খাল কেটে আনা কুমির'-রূপী ট্রানজিটের টোপ না গিলে-তাই হোক সকল দেশপ্রেমিক জনগণের একান্ত কামনা এবং প্রধানতম চেতনা। ❑

www.pathagar.com

২

এশিয়ান হাইওয়ে ঃ সমৃদ্ধির মহাসড়ক না গোলামির চোরাগলি

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যেন ভারতকে ট্রানজিট দেবার জন্য এক 'ধনুর্ভঙ্গ পণ' গ্রহণ করেছে। ভারতের ঘুঘু রাজনীতিক ও ঝানু কূটনীতিবিদ ইন্দরকুমার গুজরাল ও তাঁর স্বদেশি সহকর্মিগণ একটু তৎপরতা চালিয়েই এ কথা ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কিছুতেই জাতি ও দেশের জন্য ভয়াবহ ও বিপুল ক্ষতিকর ট্রানজিট ভারতকে দিতে মোটেই রাজি নয়। বরং তারা দলমত নির্বিশেষে এমন চুক্তিকে জাতির জন্য একটি অপমানজনক, নতজানু ও দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলকারি একটি গোলামির উদ্যোগ হিসাবে গ্রহণ করে তা রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজনে ৭১-এর মত আর এক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেও প্রস্তুত। কিন্তু ভারতের নেতৃবৃন্দের জন্য ট্রানজিট চুক্তি খুবই জরুরি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'সাতবোন রাজ্য' মণ্ডলে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীগুলোর স্বাধীনতার তোড়জোড় ও বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সাথে সাথে আসাম-মেঘালয়-অরুনাচল-মিজোরাম-নাগাল্যান্ড-ত্রিপুরা ও মনিপুরের মত সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলটির সাথে বাদবাকি বৃহত্তর ভারতের সংযোগ-রক্ষাকারি একমাত্র সংকীর্ণ 'শিলিগুঁড়ি করিডোর'টির যোগাযোগ পথটিও হয়ে পড়ছে নড়বড়ে ও অনিশ্চিত। উপরন্তু উত্তরের বিরাট-বিশাল আর বিরূপ মনোভাবাপন্ন জাতশত্রু চীনও ধীরে ধীরে আপাতঃ নির্ঝন্ঝাট পরিস্থিতির সুযোগে দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ তিব্বত, ইউনান ও ঝিংঝিয়াং (সিংকিয়াং)-এ গড়ে তুলছে তার বিপুল সামরিক স্থাপনার জাল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল-ভুটান আর বাংলাদেশের জনগণও ভারতের বহুমুখী আগ্রাসন ও ত্রাশনের মুখে ক্রমে প্রতিবাদী ও প্রতিরোধমুখী হয়ে উঠছে। ঠিক এমনই এক সময় গত ১৮ মার্চ ১৯৯৭ ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী-চুক্তি'র ২৫ বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এই তথাকথিত

www.pathagar.com

'মৈত্রী-চুক্তি'কে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সব সময়ই সন্দেহের চোখে দেখেছে এবং একে 'গোলামি চুক্তি' হিসাবে বিবেচনা করে এ থেকে পরিত্রাণ কামনা করে চলেছে। বাংলাদেশের জন্য এ চুক্তিটি অপমানজনক, অপ্রয়োজনীয় ও অসহনীয় হলেও নিতান্ত ভূ-রাজনৈতিক অপরিহার্যতা ও আর্থনীতিক বাস্তবতার জন্য এবং সর্বোপরি সামরিক ও প্রতিরক্ষামূলক কারণে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের জন্য '২৫ বছর মৈত্রী-চুক্তি'টির নবায়ন অথবা নিদেনপক্ষে অন্য কোন ছদ্ম নামে একই ধরনের একটি চুক্তির সম্পাদন বর্তমানে খুবই প্রয়োজন। ভারতের ঘুঘু কূটনীতিকবৃন্দ ভালভাবেই অবহিত যে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের পক্ষে বিপুল জনমতকে তোয়াক্কা না করে কোনভাবেই এমন 'মৈত্রী-চুক্তি' স্বাক্ষর বা এর নবায়ন সম্ভবপর নয়। তাই তারা নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করলে তাদের মাধ্যমে 'মৈত্রী-চুক্তি'র স্থলে একই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম একটি ট্রানজিট চুক্তি (পরিপূর্ণ) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা বর্তমান সরকারকে সহজেই রাজি করাতেও সক্ষম হন। অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান সরকারও প্রায় যেচেই ভারতকে তাদের অত্যন্ত অপরিহার্য ট্রানজিট প্রদান করতে ভয়ানক রকমের তৎপর হয়ে ওঠে। এদের তৎপরতা দেখে মনে হয়, তারা যেন সরকার গঠনের আগে থেকেই এমন একটি 'অপরিহার্য' অপতৎপরতার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। তারা সরকার গঠনের সময় প্রথমেই ভারতের একজন বিশ্বস্ত মিত্র যিনি Escap-এ থাকার সময়ই 'Asian Highway'-র নামে এশিয়ার বৃহত্তর শক্তি চীনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যেন ভারতকে সুবিধা প্রদানের জন্যই একটি মহাপরিকল্পনা জাতিসংঘের নামাবলী আচ্ছাদিত করে প্রণয়ন করে রাখেন, তাঁকে অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করে। উপরন্তু সরকার নিজের গা-বাঁচানোর জন্য এবং ভবিষ্যতে নিজেদের মুখরক্ষার জন্য ভারত ট্রানজিট ও বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দু'টি যোগাযোগ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, দু'জন অ-আওয়ামী লীগ নামধারি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রজনের উপর ন্যস্ত করে। উপরন্তু আসামের বিশাল চা-শিল্পে বৃটিশ মালিকানা থাকায় বাণিজ্যিক স্বার্থে যুক্তরাজ্য এবং চীনের ভারত মহাসাগরে প্রবেশ থেকে বিরত রাখার ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের ট্রানজিট পলিসির পক্ষে ওকালতি শুরু করে। এসব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরোধী দল বিএনপি ও সুসংগঠিত দল জামায়াতে ইসলামী ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের বিষয়ে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। সাবেক

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি এরশাদের মুক্তির ব্যাপারে সরকারের কাছে কাবু থাকার পরও দেশের অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক জাপা মহাসচিব ও সাবেক মন্ত্রী খালেদুর রহমান টিটো এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, 'ভারতকে নিতান্ত বাস্তব কারণেই ট্রানজিট প্রদানের প্রশ্নই ওঠে না' (দৈনিক ইনকিলাব, ৪ অক্টোবর, ১৯৯৬)। দেশের ডান-বাম-ধর্মীয়-সেক্যুলার-ছোট-বড় সকল দলই কম-বেশি এ ট্রানজিট চুক্তির বিরুদ্ধে। বাসদের নেতা আ ফ ম মাহবুবুল হক সাপ্তাহিক "রোববারকে" দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত জোরালোভাবে তাঁর ট্রানজিট বিরোধী অবস্থান ঘোষণা করেছেন। দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক, লেখক প্রায় সকলেই ভারতকে বর্তমান সরকারের ট্রানজিট দেবার উদ্যোগকে একটি অপরিণামদর্শী, ষড়যন্ত্রমূলক ও আত্মঘাতী তৎপরতা বলে অভিহিত করছেন। দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মুক্তিযোদ্ধা ডঃ আফতাব আহমদ, ডঃ আহমদ কামাল, ডঃ নাসরিন খন্দকার, প্রখ্যাত সাংবাদিক সাদেক খান, তরুণ বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেইনসহ অসংখ্য বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সাবেক ও বর্তমান ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং ডাকসু নেতৃবৃন্দ একবাক্যে ট্রানজিটের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন এবং এমন ক্ষতিকর ও জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থি উদ্যোগকে নস্যাৎ করে দেবার জন্য জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলারও দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে দেশের আলেম সমাজের ভূমিকাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দৃঢ়। তাঁরা ট্রানজিটের যে কোন উদ্যোগ বানচাল করে দিতে জেহাদের ডাক দিয়েছেন। দেশের নানা স্তরের জনগণের ট্রানজিট বিরোধী এ ঋজু মনোভাব দেখে সুচতুর ভারত সরকার অত্যন্ত কপট ও ধূর্ত কৌশলে বর্তমান অবস্থায় তাদের ট্রানজিটের দাবিতে সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা নিয়ে তা বাস্তবায়নের দায়িত্বভার বাংলাদেশ সরকারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে এবং এমন ভান করছে যেন তাঁদের (ভারতের) এ বিষয়ে কোনই ঠেকা নেই--বরং এতে যেন সকল লাভ-ক্ষতি বাংলাদেশেরই। একই সঙ্গে সুকৌশলে জাতিকে ট্রানজিটের 'বিপুল লাভের এক বিশাল সম্ভাবনা'র চিত্র সম্পর্কে ধারণা বদ্ধমূল করানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারি তরফ ছাড়াও নানা ভারতপন্থি সংস্থা, ব্যক্তিবর্গ ও পত্র-পত্রিকাকে তৎপরতা চালানোর জন্য গ্রীন-সিগন্যাল প্রদান করা হয়েছে। ভারতের 'রিলায়েন্স গ্রুপ'-এর বাংলাদেশি পত্রিকাসমূহ ছাড়াও অসংখ্য ভারতিয় মদদপুষ্ট এনজিও, গবেষণা সংস্থা ও সংগঠন বাংলাদেশের জনগণকে ট্রানজিটের অসংখ্য ফজিলত ও

www.pathagar.com

ফায়দার বটিকা সেবন করানোর জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতে হিতে আরো বিপরীত হচ্ছে। ক্রমে এদেশের মানুষ ট্রানজিট বিষয়ে বর্তমান সরকারের অভিসন্ধিকে আরো বেশি করে সন্দেহের চোখে দেখছে। একই সঙ্গে সরকারও ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার জন্য ক্রমেই হন্যে হয়ে উঠছে। দু'তিন মাস আগেই নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই ভারতকে ট্রানজিট প্রদান ও চট্টগ্রাম বন্দর ইজারা দেবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইচ্ছা ব্যক্ত করে। অক্টোবর (১৯৯৬)-এর প্রারম্ভে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে 'Asian Higway'-তে যোগদানের মাধ্যমে ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের ঘোষণা পুনরাবৃত্তি করেন। একই বক্তব্যকে সমর্থন করে বাংলাদেশের যোগাযোগমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এটা সুস্পষ্ট যে, ট্রানজিট ও চট্টগ্রাম বন্দর ইজারা' প্রশ্নে জাতি যখন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে তখন ধুরন্ধর কূটনীতিক গুজরাল ও ভারতিয় পত্র-পত্রিকা ট্রানজিটের স্থলে 'Asian Highway' ও 'Trans-Asian Railway'-র কথা বলতে শুরু করে এবং এদেশের জনগণকে বোকা বানানোর উদ্দেশ্যে ও ধোঁকা দিয়ে ভারতকে তার কাঙ্ক্ষিত ট্রানজিট প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশের বর্তমানে ক্ষমতাসীন সরকার ও ভারতপন্থি পত্র-পত্রিকা এবং সংস্থাসমূহ ট্রানজিটের বিষয়ে নিরবতা অবলম্বনপূর্বক 'Asian Highway'-র বিষয়ে আবার নানা খোঁড়া যুক্তিতর্ক নিয়ে সরব হয়ে ওঠে। তবে যে কোন সচেতন ও চোখ-কান খোলা মানুষই স্বীয় দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চেতনায় Asian Highway বাস্তবায়নের উদ্যোগকে খুব সহজেই ট্রানজিট বাস্তবায়ন চুক্তি' বা 'নবায়নকৃত গোলামি চুক্তি' হিসাবে উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম।

কী এই এশিয়ান হাইওয়ে?

বাংলাদেশের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে অতি সাম্প্রতিক 'এশিয়ান হাইওয়ে' এবং 'ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে' বিষয় দু'টি খুবই আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এদেশের জনগণ বর্তমান সরকারের ভারতকে ট্রানজিট প্রদান বিষয়ে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলে সরকার কৌশল পরিবর্তন করে চট্টগ্রাম বন্দরকে ভারতের কাছে ইজারা দেবার কথা বলতে শুরু করে এবং জনগণকে এর কল্পিত বিপুল লাভজনক ফলাফলের কথা বুঝাতে শুরু করে। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর ইজারার ব্যাপারেও দেশের দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীগণ জাতিকে সচেতন করে এর সম্ভাব্য পরিণতির কথা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলে জনগণ সরকারের এ

www.pathagar.com

উদ্যোগকেও নাকচ করে প্রতিবাদী আওয়াজ তুলে। কিন্তু সরকারকে যেন যে কোন মূল্যেই ভারতকে ট্রানজিট দিতে হয়। নেই কোন অন্যথা। কারণ আজ থেকে ২৫ বছর পূর্বে এরাই তো ভারতকে '২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী (?) চুক্তি'র দস্তখত লিখে দিয়েছিলেন। সুতরাং আজ ১৮ মার্চ, ১৯৯৭ ইং ২৫ বছর মেয়াদান্তে বৃহত্তর প্রতিবেশী ক্ষমতাধর বন্ধুপ্রতীম(?) ভারতকে তার অতি জরুরি ট্রানজিট রুট দেয়া চাই-ই চাই। উপরন্তু বর্তমান বিশ্বের কর্ণধার ও 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা'র মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র ও তার পাশ্চাত্যের চেলা-চামুণ্ডারাও নিজেদের বাণিজ্যিক ও আধিপত্যবাদী স্বার্থ বজায় রাখতে 'অখণ্ড-ভারত নীতি'র আলোকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাংশের বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতিসত্তাগুলোকে দমন করার জন্য দ্রুত সৈন্য-রসদ ও যন্ত্রপাতি পাঠানোর উদ্দেশ্যে ট্রানজিট ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের সরকার নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই এশিয়ান হাইওয়ে ও ট্রান্স–এশিয়ান রেলওয়ে-র মোড়কে বা ছদ্মাবরণে আসলে ভারতকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ঐ একই– আগের ট্রানজিটই দিতে চলেছে।

প্রস্তাবিত এশীয় মহাসড়ক (Asian Highway) ও ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে (Trans-Asian Railway) খুব সাম্প্রতিক ইস্যু হিসাবে বাংলাদেশে বিবেচিত হতে শুরু করলেও বিষয় দু'টির চিন্তা-ভাবনা ও রূপরেখা প্রায় একযুগ আগে থেকেই জাতিসংঘের অঙ্গ-সংগঠন এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আর্থনীতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP)-এর মাধ্যমে দানা বাঁধতে শুরু করে। আদতে ঐ মহাসড়ক ও মহা রেলপথের চিন্তা-ভাবনা আজ থেকে প্রায় ৩৫/৪০ বছর পূর্বে CENTO ও SEATO চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন সূচিত হয়। ঐ সময় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ ভারত মহাসাগরীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রান্তীয় দেশ ও অঞ্চলসমূহে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক আধিপত্য বিস্তার ও ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও তার পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী মিত্রবর্গ পাকিস্তানসহ তার তৃতীয় বিশ্বের মিত্রদের সাহায্যে গড়ে তুলেছিল সেন্টো ও সিয়াটো নামের প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং ঐ সময় ভারত, উত্তর-ভিয়েতনাম ও পরে নে-উইনের নেতৃত্বাধীন মায়ানমার প্রভৃতি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নিছক ভূ-কৌশলগত ও সামরিক উদ্দেশ্যমূলক মহাসড়ক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন সাড়া না দিলে (উপরন্তু তীব্র বিরোধিতার কারণে) ঐ সময়ের 'এশীয়

www.pathagar.com

মহাসড়ক পরিকল্পনা' চাপা পড়ে যায়। এরপর স্নায়ুযুদ্ধ যখন স্তিমিত হয়ে আসে এবং ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এক কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা ও নতুন আর্থনীতিক বিশ্ব পরিস্থিতি (Uni-Polar Global System and New Economic World Order) বাস্তবের দিকে গড়াতে থাকে তখন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পাশ্চাত্যের মিত্রবর্গ দূর-ভবিষ্যতে তাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ও দুশমন চীনের আধিপত্য বিস্তার রোধের এক স্থায়ী পদক্ষেপ হিসাবে এশিয়ার অন্য উদীয়মান শক্তি ভারতকে 'লেভারেজ বিকল্প' (Leverage Alternative) হিসাবে বেছে নেয় ও গ্রহণ করে তাদের সুদূরপ্রসারী 'অটুট বা অখণ্ড ভারত রক্ষা নীতি'। এ নীতির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী মিত্ররা ভারতের কাশ্মির, পাঞ্জাবের খালিস্তান ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'সাতবোন রাজ্যমালা'-র সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা ও স্বাধীনতামুখী কর্মকাণ্ডকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য সব ধরনের কর্মসূচী ও ভারতকে সহযোগিতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য, চীনকে ভারতের মহাসাগরের নীল পানিরাশির প্রবেশদ্বার বঙ্গোপসাগর থেকে দূরে রাখা। আর এজন্যই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা বাংলাদেশ যাতে ভারতকে তার উপর দিয়ে সড়ক ও নৌপথে আসামসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সহজে যাতায়াত ও মালামাল আনা-নেয়া করার জন্য ট্রানজিট প্রদান করে–তার জোরালো সুপারিশ প্রদান করতে থাকে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় তার আধিপত্য পাকাপোক্ত করার মানসে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আর্থনীতিক উন্নয়নের ধুঁয়া তুলে সুকৌশলে তার নিয়ন্ত্রণাধীন জাতিসংঘ ও এর নানা অঙ্গসংগঠনসমূহ বিশেষ করে 'এশিয়ান হাইওয়ে ও ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে'র দারুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পদ্বয়কে আবার চালু করার জন্য তৎপর হয়ে উঠে।

কিন্তু সব সময়ই অত্যন্ত নগ্নভাবে এ পরিকল্পনার আওতা থেকে এশিয়ার ১২০ কোটি জনসংখ্যার বৃহত্তম আর্থনীতিক ও সামরিক শক্তি চীনকে সম্পূর্ণ দূরে রাখে এবং এতে অতি সুকৌশলে ভারতকে তার খুবই প্রয়োজনীয় 'ট্রানজিট' পাইয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মূল ESCAP পরিকল্পনাকে পাল্টিয়ে 'Asian Highway ও Trans-Asian Railyway' নেটওয়ার্কটি ভূ-প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বিরূপ পরিস্থিতির উপর দিয়ে চালিয়ে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক আসল প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ESCAP-এর বর্তমান এশীয় মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের

www.pathagar.com

তোড়জোড় ও উদ্যোগ একান্তভাবেই ভারতকে ট্রানজিটের একটি বিকল্প পথ প্রদানের সুবন্দোবস্ত করা এবং চাতুরীর মাধ্যমে ভারত এবং তার মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বাংলাদেশের উপর দিয়ে 'এশিয়ান হাইওয়ে' ও 'ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের নেটওয়ার্ক' বাস্তবায়নের ছদ্মাবরণে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করা।

তাদের ধারণা ট্রানজিটের বিষয়ে বাংলাদেশ গররাজি হলেও ESCAP-এর আওতায় Asian Highway-র ছদ্মাবরণে যদি ভারতকে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতায়াতের সুযোগ দেয়া যায় তবে হয়ত বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন প্রতিবাদ উঠবে না। কারণ, দেশের সরকার তো ইতোপূর্বেই ভারতকে ট্রানজিট দিতে প্রস্তুত হয়ে বসেই আছে।

এশীয় মহাসড়কের রূপরেখা

প্রস্তাবিত এশীয় মহাসড়ক ও ট্রান্স-এশিয়া রেলপথের বর্তমান পরিকল্পনা ও মূল-পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ESCAP-এর এশীয়-মহাসড়ক ও ট্রান্স-এশীয় রেলপথ বিষয়ক মূল পরিকল্পনার দায়িত্বে বর্তমানে নিয়োজিত রয়েছেন বাংলাদেশেরই একজন কর্মকর্তা–সাবেক পরিকল্পনা কমিশনের এক অধিকর্তা–জনাব রহমাতুল্লাহ্। ESCAP-এর এ হাইওয়ের মূল পরিকল্পনায় মাত্র ১৫টি রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের কথা থাকলেও নানাবিধ যৌক্তিক প্রশ্ন এড়াতে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত আরো ২০টি এশীয় রাষ্ট্র এ প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, এশীয় রাষ্ট্রগুলোর আর্থনীতিক অবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে ঐ দেশগুলোর মধ্যে সহজ ও দ্রুত বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন এশীয় রাষ্ট্রের রাজধানীগুলোকে একই সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। প্রথমতঃ ESCAP-এর মূল প্রকল্পের আওতায় পশ্চিম এশিয়ার তুরস্কের ইস্তাম্বুল-আঙ্কারা থেকে শুরু করে Asian Highway-কে শুধুমাত্র সড়কের মাধ্যমে ইরানের তেহ্রান, আফগানিস্তানের কাবুল, পাকিস্তানের লাহোর ও পরে শের শাহের ঐতিহাসিক 'গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক রোড'-এর মাধ্যমে ভারতের দিল্লী-কলকাতা হয়ে বাংলাদেশের ঢাকা-চট্টগ্রাম ও মায়ানমারের আকিয়াব (সিত্তুই) এবং রাজধানী ইয়াঙ্গুন হয়ে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর এবং সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপনের কথা ছিল। পরে অবশ্য

www.pathagar.com

Asian Highway-র আওতাকে ESCAP আরো প্রলম্বিত করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনসহ হংকং, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি দূরপ্রাচ্যের (Far-East Countries) দোরগোড়া পর্যন্ত টেনে নেয়। কিন্তু সব সময় চীনকে এ প্রকল্পের বাইরে রাখা হয় অত্যন্ত সচেতনভাবে এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মধ্য এশিয়া অঞ্চলের সদ্য স্বাধীন হয়ে যাওয়া ৫/৬টি রাষ্ট্র (ভূ-পরিবেশিত) কাজাখিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরঘিজিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া এ এশিয়ান মহাসড়কের শরিক হওয়ার প্রয়োজন ও যোগ্যতা রাখে। তবু এদের ব্যাপারে ESCAP নীরব। ESCAP-এর নতুন পরিবর্তিত পরিকল্পাতে Asian Highway-র সাথে যুক্ত হয় 'Trans-Asian Railway'-র প্রকল্প এবং ঐ মহারেলপথ Asian Highway-ই সমান্তরালভাবে তুরস্ক থেকে দক্ষিণ-কোরিয়া ও জাপান পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। ষাটের দশকের যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার শীতল স্নায়ুযুদ্ধ, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার সমাজতান্ত্রিক অস্থিরতা ও যুদ্ধ বিগ্রহ আর ভারত, মায়ানমার ও ইন্দোনেশিয়ার (সুহার্তোর পূর্বে সুকার্ণের শাসনামল পর্যন্ত) যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী, সোভিয়েত ও চীন ঘেষা নীতি এবং সর্বোপরি বিপুল বাজেট সংকট ও কারিগরি জটিলতা 'Asian Highway" প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। বিভিন্ন কূটনৈতিক ও মিডিয়াসূত্রে জানা গেছে যে, প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে ও ট্র্যান্স-এশিয়ান রেলওয়ে উপমহাদেশে প্রবেশের পূর্বে তুরস্কের ইস্তাম্বুল থেকে যাত্রা শুরু করে বস্ফরাস প্রণালীর উপরের 'Euro-Asian Bridge' দিয়ে তুরস্কের মূল ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করে পূর্ব-মুখী যাত্রার রাজধানী আঙ্কারা হয়ে ক্রমে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে ইরানের উত্তর-পশ্চিমাংশের সীমানা দিয়ে ঢুকে তেহ্রান পৌঁছাবে। সেখান থেকে তা ক্রমাগত পূর্বদিকে চলে মাশাদ নগরী ঘুরে আফগানিস্তানের হিরাত, কান্দাহার হয়ে উত্তরদিকে গিয়ে রাজধানী কাবুলে উপনীত হবে। কাবুল থেকে প্রস্তাবিত মহাসড়কটি শের শাহের বিখ্যাত ঐতিহাসিক 'Grand Trunk Road'- ধরে জালালাবাদ ও খাইবার পাস হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশাওয়ার হয়ে রাজধানী ইসলামাবাদ-রাওয়ালপিন্ডি হয়ে পৌঁছাবে লাহোরে এবং লাহোর থেকে একই Trunk Road-এর ওয়াগা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে পূর্বে যাত্রা বজায় রেখে পৌঁছাবে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে। আর এখানেই শুরু হবে ESCAP-এর ভারত প্রভাবিত নতুন নীতির বাস্তবায়ন ও

www.pathagar.com

পরিবর্তিত 'Transit'-মুখী নতুন Highway-র বহুমুখী রোড। এ নতুন রূপরেখায় নয়াদিল্লী থেকেই হাইওয়ে দু'ভাগ হয়ে একভাগ দক্ষিণে চলে আগ্রা ঘুরে সোজা পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা বন্দর ধরে বাংলাদেশের যশোরের বেনাপোল সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে এবং এই হাইওয়েটির অন্য লাইন দিল্লী থেকে উত্তর-পূর্বদিকে চলে নেপালে ঢুকে রাজধানী কাঠমুন্ডু হয়ে আবার ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দার্জিলিং দিয়ে ভারতে ঢুকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া থানার বাংলাবান্দা সীমান্ত পথ হয়ে দক্ষিণ-পূর্বে চলে যমুনা ব্রীজের সাথে এসে মিলিত হবে। অন্যদিকে পূর্ববর্তী বেনাপোলমুখী লাইনটিও উত্তর দিকে চলে এসে একই স্থানে অর্থাৎ যমুনা ব্রীজের পশ্চিমে এসে একত্রে মিলিত হবে। অবশ্য ভারত প্রস্তাবিত 'ট্রানজিট রুট'-এর মূল পরিকল্পনায় 'পদ্মা ব্রীজ'-এর একটি প্রস্তাবনাও ছিল যা ESCAP ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য 'Asian Highway'র পরিবর্তিত বহুমুখী এ নতুন নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করেছে। এর বাস্তবায়ন হলে তখন যমুনা ব্রীজ ছাড়াও পদ্মা-ব্রীজ দিয়ে অন্য একটি ভিন্ন পথে সরাসরি পদ্মা পাড়ি দিয়ে আরিচা-সাভার-ঢাকা দিয়ে সরাসরি এশীয় মহাসড়কের সাথে ভারতের কলকাতা বন্দরে সহজ সংযোগ সাধিত হবে বলে ধারণা করা যায়। এর আগ পর্যন্ত অবশ্য ভারতের উত্তর ও দক্ষিণবাহী দু'টি হাইওয়ে শাখাই যমুনা ব্রীজ দিয়ে পূর্বদিকে চলে আবার Grand Trunk Road-এর সাথে চলতে থাকবে এবং ক্রমে পূর্বদিকে এসে মূল পরিকল্পনা মাফিক ঢাকা হয়ে মেঘনা ব্রীজ দিয়ে পার হয়ে পূর্বদিকে চলে ক্রমে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম নগরীতে (বন্দর) পৌঁছানোর কথা ছিল এবং সেখান থেকে ESCAP-এর মুল প্রকল্পমত ও এশিয়ার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে দক্ষিণের আরাকান রোড (শাহ সূজা রোড) হয়ে নাফ-নদী দিয়ে চলে মায়ানমারের (বার্মার) মংডু শহর হয়ে রাজধানী ইয়াংগুন (রেংগুন) পৌঁছাবে এবং সেখান থেকে ক্রমে কুয়ালালামপুর, সিংগাপুর, ব্যাঙ্কক হয়ে ক্রমে লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের রাজধানীসমূহকে যুক্ত করবে। কিন্তু বাংলাদেশে ঢুকেই রহস্যজনক কারণে সূত্রপাত ঘটে 'নতুন এশীয় মহাসড়ক পরিকল্পনা' বা 'New or Changed Asian Highway Plan'-এর এবং এখানেই সুস্পষ্ট ষড়যন্ত্রের চিত্র উদঘাটিত হয়। নতুন হাইওয়ের এ প্রকল্পে আমাদের সকলের কাম্য 'আরাকান রোডবাহী টেকনাফ-মংডু-আকিয়াব (সিত্তুই)-ইয়াংগুন' দক্ষিণমুখী মহাসড়কের বদলে দেখতে পাই ভারতের সেই

www.pathagar.com

উত্তর-পূর্ব ভারত বা আসাম-মেঘালয়-নাগাল্যান্ড-মণিপুরবাহী ভারতের জন্য খুবই জরুরি ভূ-রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষামুখী ট্রানজিট লাইনেরই ছদ্মবেশী নুতন রূপ। এ নতুন রুটের আওতায় এশীয় মহাসড়কটি চট্টগ্রামের দিকে না গিয়ে ঢাকা-আখাউড়া বা ভৈরব হয়ে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর সিলেট দিয়ে জাফলং-তামাবিলের দুর্গম পার্বত্য পথ দিয়ে ডাউকির ঝুলান ব্রীজ দিয়ে খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য খাড়া চড়াই-উৎরাই পথ বেয়ে মেঘালয়ের রাজধানী শৈলশহর শিলং-এ যাবে এবং সেখান থেকে আসামের রাজধানী গৌহাটি (প্রাকজ্যোতিষপুর) হয়ে ভারতের পরম কাম্য সেই আগের প্রস্তাবিত ট্রানজিট রুট-আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম হয়ে দক্ষিণে যাত্রা করবে এবং এরপর ভারতের জন্য এই তথাকথিত এশীয় মহাসড়কের আর কোন প্রয়োজনই থাকবে না। তবু তখন এ 'Asian Highway'- চলতে থাকবে অত্যন্ত বিপদসংকুল পার্বত্য ও ঘন-অরণ্যানী আচ্ছাদিত আর উগ্র বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভিন্ন বর্মী উপজাতীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত মায়ানমারের প্রদেশ শান, কোচিন, কারেন, চিন ইত্যাদি রাজ্যগুলোর উপর দিয়ে সোজা দক্ষিণে মিটকিনা-ইয়াংগুন পর্যন্ত। কিন্তু এ পথের ভারতের কোন প্রয়োজনই নেই। কারণ, ভারত তো তার আগেই হাসিল করে নিয়েছে তার পরম কাম্য ট্রানজিট-এর চূড়ান্ত গন্তব্যসমূহের সহজ যোগাযোগ সংযোগ। আর বাংলাদেশকে Asian Highway'র এ পরিবর্তিত ঘোরাপথে যেতে গিয়ে পূর্বতন প্রস্তাবিত সহজ সরল চট্টগ্রাম-টেকনাফ-মংডু-আকিয়াব-ইয়াংগুন-বাহী পথ, যাতে মাত্র ৩০০ মাইলের মত পথ চলে গন্তব্যে পৌছাতে হত, এখন এই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলমুখী পরিবর্তিত নতুন পরিকল্পনার অনুসরণ করতে গিয়ে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ২,০০০ কিঃ মিঃ (প্রায় ১২০০ মাইল) দুর্গম পথের খেসারত, দণ্ড বা শাস্তি পোহাতে হবে। যা হবে গরিব বাংলাদেশের জন্য এক চরম ক্ষতিকর ও আত্মঘাতী। যেকোন সহজ সরল কোনো লোকই ESCAP-এর নামাবলী জড়ানো এ ঘোরাপথের ছদ্মরূপী ভারতের ট্রানজিট বাস্তবায়ন প্রকল্পটির চক্রান্ত সহজেই ধরতে পারবে। শুধুমাত্র এক অজানা রহস্যময় কারণে বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার ও তার নেতৃবৃন্দ যেন এ অতি গভীর, ক্ষতিকারক অথচ সুস্পষ্ট চক্রান্ত সম্পর্কে মোটেই অবহিত নন। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতিসংঘ বা এসকাপ জড়িত থাকার ফলে স্বাভাবিক কারণেই ক্ষুদ্র ও গরিব রাষ্ট্র বাংলাদেশ–যে আর্থিক

www.pathagar.com

দেনা ও সাহায্যের নিগড়ে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও পাশ্চাত্যের কাছে বন্দীর মত অসহায়-তাই ভারত তার কাম্য ট্রানজিট আদায়ে শেষ পর্যন্ত ধূর্ত কুটচালে ESCAP-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশকে তার জন্য বর্তমান পরিস্থিতি নিতান্ত অলাভজনক, ক্ষতিকর, স্বার্থের পরিপন্থি 'Asian Highway' ও 'Trans-Asian Railway'-র আওতায় নতজানু হয়ে প্রকল্পটি মেনে নিতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতের জন্য ট্রানজিটে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে ESCAP-এর 'Pro-Indian Lobby'-ও ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে এবং পূর্বের 'চট্টগ্রাম-টেকনাফ, আকিয়াব-ইয়াঙ্গুণ রুট পরিবর্তন করে ভারতের উত্তর-পূর্ব ট্রানজিটের বিকল্প ঢাকা-সিলেট-শিলং ও আসাম' বাহী নতুন রুটটি অনুমোদন করে এতে বাংলাদেশকে রাজি করানোর জন্য বিগত ২৮ ও ২৯ অক্টোবর ১৯৯৮ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে ESCAP-এর এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবং যানা যায় ঐসময়ে ভারতের ট্রানজিটের বিকল্প এই 'Asian Highway' ও 'Trans-Asian Railway' সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে।

এশিয়ান হাইওয়েতে বাংলাদেশের লাভ-ক্ষতি

শুধুমাত্র বাণিজ্যিক ও বৈশ্বিক যোগাযোগের জন্য যদি মূল এশীয় মহাসড়ক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় তবে এতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের মত অবশ্যই বাংলাদেশ বিপুলভাবে লাভবান হত। কারণ ঐ মহাসড়ক হত একটি আঞ্চলিক চুক্তির ভিত্তিতে জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং এ সংযোগ পথটি SAPTA বা SAARC চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাপ্টা সংশোধন চুক্তিটিকে আরো ভারসাম্যমূলক ও বাংলাদেশের স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ করার জন্য ESCAP-এর এই মহাপরিকল্পনায় অবশ্যই চীন ও ভুটানকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ চীন যদি এ মহাসড়কের অংশীদার হয় তবে সে দেশটি তার ভারত মহাসাগরের সবচেয়ে নিকটবর্তী ভূ-খণ্ড ভুটান-সীমান্ত সংলগ্ন চুম্বী ভ্যালী (তিব্বত) হতে সহজেই ভারতের দার্জিলিং-শিলিগুঁড়ি হয়ে বাংলাদেশের দিনাজপুরের বাংলাবান্দার প্রস্তাবিত এশীয় মহাসড়কের সংযোগ স্থলে ঢুকতে সক্ষম হবে। কারণ এ প্রস্তাবিত মহাসড়কের একটি শাখা নেপালের কাঠমুন্ডু ছুঁয়ে বাংলাবান্দা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার কথা। কিন্তু ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র

www.pathagar.com

ESCAP-প্রণীত এ মহাসড়ক পরিকল্পনাকে বদলিয়ে ভারতের জন্য সেই ট্রানজিট রুট-এর মত রূপ দিলেও তারা প্রাণ থাকতে কখনো চীনকে এ মহাসড়কের শরিক হতে রাজি হবে না। আর এখানেই নিহিত রয়েছে এ প্রস্তাবিত মহাসড়কের আসল ভূ-রাজনৈতিক বা কৌশলগত মোজেজা (Geo-Political and Strategical Significance)। এ পরিকল্পনা থেকে চীনকে দূরে রাখা থেকেই ভারত ও পাশ্চাত্যের (যুক্তরাষ্ট্রসহ) দুরভিসন্ধি ও অসৎ উদ্দেশ্যের প্রমাণ মেলে। চীন এতে যুক্ত হলে ক্ষুদ্র ও দুর্বল বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য তা হত এক পরম নিশ্চয়তা ও লেভারেজ স্বরূপ। ভূ-রাজনৈতিক অসুবিধা ও ক্ষতি ছাড়াও ESCAP-এর এই পরিবর্তিত ঘোরাপথে (টেকনাফ না হয়ে সিলেট-মেঘালয়-আসাম হয়ে)-র নতুন Highway প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে দণ্ড খেসারত হিসাবে প্রায় ১০৫০ কিঃ মিঃ বা ৬৫০ মাইল দীর্ঘ পথের নির্মাণ উন্নয়ন রক্ষণাবেক্ষণের বিপুল খরচ যোগাতে হবে–যা বাংলাদেশের সামর্থ্যের সম্পূর্ণ বাইরে। কিন্তু চট্টগ্রাম-টেকনাফগামী পূর্বের পরিলক্ষিত পথ বর্তমানে অত্যন্ত উন্নত মানে চালু থাকায় ও ঐ পথে কোনই নতুন ব্রীজ নির্মাণের প্রয়োজন না থাকায় বাংলাদেশ ঐ বাড়তি খরচা থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেত। উপরন্তু, বাংলাদেশকে যদি আদৌ ঐ পথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বা দূরপ্রাচ্যে (S.E. Asia & Far-East Countries)-র দেশসমূহে মালামাল আমদানি রফতানি করতেই হয় (যার কোন প্রয়োজনই নেই, কারণ সমুদ্র পথে ঐসব দেশে প্রায় ১/৪ ভাগ খরচে বাংলাদেশ বাণিজ্য সংযোগ করতে সক্ষম) তবে বাংলাদেশকে দুর্গম পার্বত্য ও বিপদসংকুল অতিরিক্ত প্রায় ১৫০০ মাইল বেশি পথ ঘুরে যেতে হবে। স্থলবেষ্টিত ভারতের 'সাতবোন রাজ্যগুলো'-র জন্য ভারতের ঐ Asian Highway-র প্রয়োজন থাকলেও সমুদ্রপথ ও বন্দরযুক্ত বাংলাদেশের জন্য এ ঘোরা পথের খরচ যোগানো ও যাতায়াতের বাড়তি ব্যয় বহনের কোনই যুক্তি নেই। যেকোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষই ESCAP-এর ছদ্মাবরণী এই ট্রানজিটের ঘোরাপথকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না। কারণ বাণিজ্যের মালামাল পরিবহণই যদি Asian Highway-র একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই সবচেয়ে কম খরচের, সহজ-সরল, সোজা, কম ঝুকিপূর্ণ ও লাভজনক রুটে হতে হবে। আর তা যেকোন অর্থেই বর্তমানের পরিবর্তিত ঘোরাপথের বর্ধিত দীর্ঘ 'ULFA Route' বা 'Altrenative Bangla Assam Transit'-Route হতে পারে না। বরং তা

www.pathagar.com

যৌক্তিকভাবেই হতে হবে 'Delhi-Dhaka-Chittagong-Teknaf-Mongdo-Akiab-Yangun Route'- অনুযায়ী ESCAP-এর মূল পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এবং চীন, ভুটান, মঙ্গোলিয়া ও স্বাধীন মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলোকে বাদ দিয়ে কোনক্রমেই বাংলাদেশের ESCAP-এর এই 'ছদ্মবেশী' মহাপরিকল্পনাকে মেনে নেয়ার যুক্তি নেই - নেই কোন ফায়দাও। উপরন্তু আত্মকেন্দ্রিক ও প্রায় একঘরে মায়ানমার এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের প্রভাবযুক্ত জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংস্থাসমূহকে কমই পাত্তা দেয়। মায়ানমার যে নিতান্ত ভারতের স্বার্থমুখী এ মহাসড়ক পরিকল্পনাকে গ্রহণ করবে তা'ও এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। কারণ, মায়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ শান, কোচিন, কারেন প্রভৃতি রাজ্যে সে কিছুতেই ভারতের মত আধিপত্যবাদী কুচক্রী শক্তিকে প্রবেশাধিকার দিতে রাজি হবে না। সুতরাং বাংলাদেশকে পা ফেলতে ভাবতে হবে।

পরিবর্তিত এশিয়ান হাইওয়ে ঃ ষড়যন্ত্রের মহাসড়ক

'এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আর্থনীতিক ও সামাজিক কমিশন' বা ESCAP-প্রণীত পরিবর্তিত এশিয়ান হাইওয়ে (Asian Highway)-র মূল মানচিত্র বিশ্লেষণ করলে–ঐ প্রস্তাবিত মহাসড়কের অন্তরালে লুক্কায়িত সকল সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়ে পড়ে। মানচিত্রের শিরোণামেই, মানচিত্রখানা যে নতুন ও মূল মানচিত্র থেকে পরিবর্তিত তা লেখা রয়েছে। 'New Asian Highway Map' শিরোনাম বিশিষ্ট এ দলিলখানায় জাতিসংঘের United Nation মনোগ্রাম সম্বলিত ও মোট ২৯টি কোড বিশিষ্ট বিভিন্ন স্টেশনের মধ্যকার বিস্তারিত তথ্য (যেমন : দু'টি গন্তব্যের মোট দূরত্ব) বিধৃত রয়েছে। মানচিত্রখানায় এশিয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার জটিল সড়ক যোগাযোগের চিত্র ও ঐ অঞ্চলসমূহের রাষ্ট্রসমূহের নানা নগরী, রাজধানী, বন্দর ও ভূ-কৌশলগত গন্তব্যসমূহের মধ্যকার সংযোগ সাধনকারী বর্তমান স্থল সড়ক পথ উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঐসব এলাকার উপর দিয়ে ESCAP প্রস্তাবিত নতুন সড়ক পথের পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়েছে তড়িঘড়ি করে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত এ পরিবর্তিত এশীয় মহাসড়কের মানচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এতে একটি মাত্র দক্ষিণ

www.pathagar.com

এশীয় রাষ্ট্রকেই যেন বিশেষ সুযোগ দেবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আর এ দেশটি হচ্ছে- এশিয়ার অন্যতম দরিদ্র, জনভারাক্রান্ত অথচ আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী শক্তি ভারত। অবশ্য মানচিত্রখানায় মঙ্গোলিয়া ও চীনকে পাকিস্তানের আজাদ-কাশ্মিরের উপর দিয়ে চালু ঐতিহাসিক 'সিল্ক রুট' (Silk Route)-এর মাধ্যমে নতুন প্রস্তাবিত Asian Highway-র সাথে সংযোগ করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এ সড়ক পথ প্রায় দেড় যুগ আগে থেকে চালু থাকায় (চীন-পাকিস্তান কারাকোরাম মহাসড়ক) ESCAP-এর নতুন Asian Highway-এর প্রস্তাবনায় এর স্থান দেয়া বা না দেয়ার কোনই মূল্য নেই। কারণ চীন বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত মহাসাগরে যাবার জন্য বা বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড-এর সাথে সরাসরি সহজ যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তিব্বতের দক্ষিণে চুম্বি ভ্যালি থেকে মাত্র ৬৪/৬৫ মাইলের দার্জিলিং-ডুয়ার্স-তরাই-এর একটি সংকীর্ণ করিডোরের প্রয়োজনবোধ করে। আর অত্যন্ত বেশি ভূ-রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা-কৌশলগত গুরুত্ব থাকায় ভারত কিছুতেই চীনকে এই সহজতম করিডোরটি দিতে রাজি নয়। এ জন্যই ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন বা প্রভাবিত ESCAP-এর পরিবর্তিত নতুন মানচিত্রে বা Asian Highway Plan-এ আমরা চীনের অবস্থান দেখলেও তা হাজার হাজার মাইলের ঘোরা পথের স্থল-নির্ভর সেই ঐতিহাসিক সিল্ক রুটেরই পুনরাবৃত্তিকে দেখতে পাই। এসকাপের এ পরিবর্তিত নতুন মহাসড়ক পরিকল্পনায় চীন-বাংলাদেশের মধ্যে চুম্বি ভ্যালি-দার্জিলিং করিডোর না দিলেও অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে ভারতকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে সহজ ও কম ব্যয়সাধ্য ঢাকা-চট্টগ্রাম-টেকনাফ-আকিয়াব-ইয়াংগুন রুটটি পরিবর্তন করে বেশি ব্যয়সাধ্য, বেশি দুর্গম ও দীর্ঘ ঘোরপথের নতুন রুট ঢাকা-সিলেট-জাফলং বা জকিগঞ্জ-করিমগঞ্জ বা শিলং (মানচিত্রে সিলেট ও উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম দেখালেও ঐ পথ জাফলং-শিলং না জকিগঞ্জ-করিমগঞ্জ সড়ক তা স্পষ্ট করে দেখানো হয়নি- এ বিষয়টিও রহস্যজনক) হয়ে পার্বত্য চড়াই-উৎরাই ও উগ্র বিচ্ছিন্নতাবাদী জনগোষ্ঠীসংকুল 'সাতবোন রাজ্য' ঘুরে (আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড) মায়ানমার কোচিন, কারেন ও শান রাজ্য দিয়ে মধ্য মায়ানমারের মিকটিলা শহর দিয়ে একটি লাইন ইয়াংগুন যাবে এবং অন্য পথ থাইল্যান্ড-লাওস হয়ে ভিয়েতনামের দিকে যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে স্থলসংযোগে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-

www.pathagar.com

টেকনাফ-এর আরাকান রোড বা 'শাহ সূজা সড়ক'-এর মত এত সহজ ও কম ব্যয়সাধ্য আর কোনই বিকল্প নেই। কারণ এ পথটিই শের শাহ ঘোরীর সেই বিখ্যাত 'গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক রোড'-এর অংশ যা এখন খুব ভাল অবস্থায় চালু রয়েছে। এসকাপের পরিবর্তিত নতুন ঘোরাপথের (সিলেট-আসামগামী উত্তর-পূর্ববাহী) পরিবর্তিত এশিয়ান হাইওয়ের মানচিত্র ভারত প্রস্তাবিত সেই "সাতবোন রাজ্য" মণ্ডলীতে যাবার ট্রানজিট প্রস্তাবেরই নতুন বাস্তবায়ন বলে মনে হচ্ছে। এসকাপ-এর এই নতুন মানচিত্রে পশ্চিমে ইরানের তুরস্ক সীমান্তবর্তী নগরী বাজারগান থেকে শুরু করে মহাসড়কটি মোট ৪টি মহাসড়ক শাখায় বিভক্ত হয়ে ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, চীন ও মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত জাল বিস্তার করেছে বলে দেখা যায়। মানচিত্রের আওতায় ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও ফিলিপাইন-এর মূল দু'টি দ্বীপমালায় এ নেটওয়ার্ক বিস্তার লাভ করবে। তাছাড়া প্রতিটি রাষ্ট্র ও অঞ্চলে Sub-Regional Route হিসাবে কিছু উপ-মহাসড়কও দেখানো হয়েছে। এ উপ-মহাসড়কসমূহ মূলত ভারতের দক্ষিণাঞ্চল, পাকিস্তানের নানা প্রদেশসমূহ এবং আফগানিস্তান ও ইরানের বিভিন্ন ছড়ানো-ছিটানো নগরী ও শহরের মধ্যে সংযোগ সাধন করবে। কিন্তু এসকাপ-এর এই নতুন মানচিত্রে 'এশিয়ান হাইওয়ে'র নেটওয়ার্কে মধ্য এশিয়ার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ৫/৬টি রাষ্ট্রকে বাদ দেয়া হয়েছে। আরো বাদ দেয়া হয়েছে এশিয়ার অন্যতম আর্থনীতিক শক্তি দক্ষিণ কোরিয়াকে। বাদ পড়েছে উত্তর কোরিয়া ও দ্বীপ রাষ্ট্র জাপান এবং তাইওয়ানও। মধ্যপ্রাচ্যের ধনী আরব রাষ্ট্রসমূহও মানচিত্রে অনুপস্থিত। মানচিত্রটির সবচেয়ে মজার বিষয় হল–এতে চীনের উপর দিয়ে যে সব হাইওয়ে নেটওয়ার্ক দেখানো হয়েছে, সে সব এখনই চালু ও ব্যস্ত মহাসড়ক এবং এই এসকাপ পরিকল্পিত মহাসড়কে এ সবের অন্তর্ভুক্তি বা বাদ পড়ায় চীনের কোনই লাভ-ক্ষতি নেই। উপরন্তু এসব মহাসড়কের মহাআয়োজনে ও মহাপরিকল্পনায় একমাত্র ভারতই তার পরম কাম্য ও ভীষণ প্রয়োজনীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে (সাতবোন রাজ্যমালা) পৌঁছানোর সহজ ও দ্রুততম পথ বাংলাদেশের উপর দিয়ে (সিলেট হয়ে) চলা ট্রানজিট বা সংযোগ পেতে চলেছে। এতে বাংলাদেশের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হতে যাচ্ছে। কারণ যেখানে আরাকান রোড দিয়ে টেকনাফ হয়ে ইয়াঙ্গুন যেতে বাংলাদেশের মাত্র ৭০০/৮০০ কিঃমিঃ (আকিয়াব ৩০০ কিঃমিঃ) পথ চলতে হত-বর্তমানের

www.pathagar.com

নতুন রুট-এ আসাম-নাগাল্যান্ড ও মিকটিলা ঘুরে এখন (এসকাপ-এর এ ছদ্মবেশী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে) বাংলাদেশকে ইয়াঙ্গন পৌঁছাতে লাগবে প্রায় ২০০০/২৫০০ কিঃমিঃ বেশি দূরত্ব অতিক্রমের। বিগত ২৮ ও ২৯ অক্টোবর '৯৭ দিল্লীতে এসকাপ-এর এ পরিবর্তিত মহাসড়ক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অনুষ্ঠিত হয় এক সম্মেলন। এত উদ্যোগ, আয়োজন ও তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছে ভারতেরই বেশি গরজ ও ঠেকা। কূটনৈতিক মহল থেকে পাওয়া খবরে বোঝা যাচ্ছে যে, মায়ানমার তার উত্তরাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদপ্রবণ প্রদেশগুলোর উপর দিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতকে ট্রানজিট দিতে উৎসাহী নয়। আর ভারতও আসলে মায়ানমার পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত নয়। তার দরকার এশীয় মহাসড়কের আবরণে বা ছদ্মবেশে বাংলাদেশের উপর দিয়ে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো পর্যন্ত অতি জরুরি ট্রানজিট লাভ। গরিব ও ভারতবেষ্টিত ক্ষুদ্র বাংলাদেশ যেন এসকাপের এ ছদ্মবেশী মহাসড়ক পরিকল্পনারূপী ষড়যন্ত্রের জালে আটকা না পড়ে। কারণ এ চক্রান্তের বেড়াজাল সমৃদ্ধির মহাসড়ক না হয়ে অচিরেই গোলামির চোরাগলি হিসাবে বাংলাদেশকে এক চরম ক্ষতির মহাগহ্বরে নিয়ে যাবে। অতএব জাতি যেন এ ষড়যন্ত্রকে সম্মিলিতভাবে ব্যর্থ করে দেয় এই আমাদের কামনা। মানচিত্রখানার একেবারে নিচে Foot Note হিসাবে লেখা রয়েছে ঃ 'The map indicates new Asian Highway routes agreed at the Expert Group Meeting on the Development of the Asian Highway network held from 29 November to 3 December 1993 at ESCAP. Printed in 1995.'। তাছাড়া চীনের মানচিত্রভুক্তির ব্যাখ্যা হিসাবে মানচিত্রখানার উপরের সূচীর নীচে লেখা রয়েছে, 'In China Solid lines reflect agreed Asian Highway Routes, and faded lines reflect possible routes to join Asian Highway.' চীনের উপর দিয়ে যাওয়া ৪নং মহাসড়কের বেশির ভাগই এই শেষোক্ত রুটের অন্তর্ভুক্ত। এসকাপ-এর এই নতুন মানচিত্রের হিসাব অনুযায়ী এশিয়ার সবচেয়ে দূরবর্তী 'হাইওয়ে' রুটটি হবে রুট A-1-এর ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলীয় বন্দর নগরী হাইফং থেকে শুরু করে ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় তুরস্ক সীমান্তবর্তী নগরী বাজারগান পর্যন্ত দীর্ঘ মহাসড়কটি যার দৈর্ঘ্য ১২,১৮৫ কিঃ মিঃ। ❑

www.pathagar.com

৩

ট্রানজিট, ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে ও এশিয়ান হাইওয়ে ঃ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও ভূ-রাজনীতির নিরীখে পর্যালোচনা

চলতি সহস্রাব্দের শেষ শতাব্দীর শেষ দশকটির অন্তিম ক'টি বছরে (১৯৯৫-১৯৯৯) বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে বৃহত্তর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের বিচ্ছিন্ন প্রায় ভূ-পরিবেষ্টিত (Land Locked) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'সাত-বোন রাজ্যমালা'য় (Seven-sister state) যোগাযোগ (সড়ক, রেল ও নৌ) স্থাপনের জন্য ভারত মরিয়া হয়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের চরম তাৎপর্যময় ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থান ভারতের পরম সম্পদ সমৃদ্ধ ও ততোধিক ভূ-কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ঐ উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বৃহদকার ভারত থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ও প্রতিরক্ষা কৌশলগত দিক দিয়ে বিপন্ন করে রেখেছে। ১৯৬২ সনে চীনের সাথে সামরিক সংঘাতে সাংঘাতিকভাবে পরাভূত ভারত তার ঐ অঞ্চলের অস্তিত্বের জন্য মূল ভারতের সঙ্গে প্রায় বিচ্ছিন্ন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সংযুক্তকারি একমাত্র একচিলতে ভূ-ফালি 'শিলিগুঁড়ি করিডোর'–যা কৌশলবিদ ও সমর বিশারদদের কাছে "চিকেন নেক" নামে পরিচিত। ন্যূনতম প্রায় ১৭ মাইল (২৫ কি.মি.) প্রশস্ততা বিশিষ্ট ঐ গুরুত্বপূর্ণ করিডোর উত্তর-পশ্চিমে নেপাল এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে বাংলাদেশকে আলাদা করে ভারতের মূল ভূ-খণ্ড ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'সাতবোন রাজ্যমালা'র আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম, অরুনাচল এবং ত্রিপুরা রাজ্য সাতটির মধ্যে ক্ষীণ সংযোগ রক্ষার কাজ করে চলেছে। উত্তরের বিশালাকার মহাশক্তিধর বৈরি চীন, আসাম অরুণাচলের বৃটিশ চিহ্নিত 'ম্যাকমোহন লাইন' অস্বীকার করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশাল ভূ-ভাগের উপর এখন পর্যন্ত স্বীয় দাবি বজায় রেখেছে। সেই চীনের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আক্রমনের সময় খুব সহজেই ক্ষীণ "চিকেন নেক" শিলিগুঁড়ি করিডোর এমনকি

www.pathagar.com

তুলনামূলকভাবে প্রশস্ততর দার্জিলিং করিডোর (৬৪ মাইল বা ১০০ কি.মি.) ও ভারতের মূল ভূ-খন্ডের সাথে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংযোগ রক্ষায় যথেষ্ট ও নির্ভরযোগ্য সংযোগ পথ হতে পারেনা। তাই ১৯৪৭ সন থেকেই ভারত যে কোন মূল্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সহজ ও নির্ভরযোগ্য স্থায়ী সংযোগ রক্ষাকারি করিডোর লাভের জন্য বাংলাদেশের ভূ-ভাগ ও বন্দরসমূহের উপর বিশেষ নজর ও বিচার বিশ্লেষন চালিয়ে আসছিল। ভারতের সাবেক সমর-নায়ক জেনারেল উবানের "ফ্যানটম অব চিটাগাং" বই থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরেই ভারত চট্টগ্রাম বন্দর চীরতরে কব্জা করে নিতে চেয়েছিল। ভারতের বিশাল বিচ্ছিন্ন প্রায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উত্তর-পূর্ব ভাগ মোড়ে শক্তিশালী চীনের অবস্থান। পূর্ব ও দক্ষিণে মায়ানমারের দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল কাচিন, শান ও কারেন প্রদেশ। দক্ষিন ও পশ্চিমে বাংলাদেশের ঘন-জনবসতি পূর্ণ ভূ-ভাগ। 'সাতবোন রাজ্যমালা'র নিকটতম সমুদ্রবন্দর পশ্চিম বঙ্গের কলকাতা ও হলদিয়া যা ঐ ভূ-বেষ্টিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে প্রায় ১০০০-২৫০০ কি. মি. দূরে অবস্থিত। উপরন্তু আন্তঃমহাদেশিয় ক্ষেপনাস্ত্রও পারমানবিক বোমার অধিকারি বর্তমান দুনিয়ার ২য় বৃহৎশক্তি চীন তার দূর প্রতিচ্যের (Far-West) এবং মধ্য-কেন্দ্রীয় অঞ্চলের দক্ষিণাঞ্চল থেকে নিকট সমুদ্র মুখে প্রবেশের জন্য সর্ট-কার্ট পথে সবচেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করে একমাত্র বাংলাদেশের মংলা বা চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত মহাসাগরের জলরাশিতে অবগাহন করতে পারে। আর এজন্য চীনকে তার তিব্বত প্রদেশের দক্ষিণাংশের চুম্বি উপত্যাক্যা (Chumby Valley)-যা ভারতের দখলকৃত (১৯৭৫ সনে) সিকিম ও পাহাড়ি রাষ্ট্র ভুটানের মাঝখান দিয়ে একফালি ছোরার মত দক্ষিণ দিকে প্রলম্বিত হয়ে আছে-সেখান দিয়ে মাত্র ৭০/৮০ মাইল (১০০ কিঃ মিঃ) চওড়া দার্জিলিং করিডোর পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের মৃদু ঢালু সমতল ভূমিতে নামতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই চীন মাত্র ২/৩ ঘণ্টার সফর শেষে পেয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মসৃন মহাসড়ক ও শতাব্দীর প্রতিষ্ঠিত রেল সড়কের সংযোগ যা অবলীলায় ৮/১০ ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে যেতে পারে তাদের পরম কাঙ্ক্ষিত সমুদ্রবন্দর মংলার জাহাজ ঘাটার মঞ্জিলে। আর ভারত কোন মতেই তার প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী বা জানি দুশমন চীনকে এ সুযোগ দেবেনা। একই কারণে

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাশক্তি এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তা হতে দেবেনা কোন মতেই। আর এজন্যই দক্ষিণ এশিয়া (SAARC) ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (ASEAN)-এর সংযোগস্থলে বঙ্গোপসাগরের শিয়রে শায়িত, নদী মেঘলা শস্য-শ্যামলা গরিব জনভারাক্রান্ত বাংলাদেশের এত ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য ও আর্থনীতিক গুরুত্ব।

পশ্চিমে সার্ক রাষ্ট্রপুঞ্জের সোয়াশ' কোটি মানুষের বাজার আর দঃ-পূর্বে আসিয়ানের সম্ভাব্য জাগরোন্মুখ এশীয় ব্যাঘ্র শাসকদের অবস্থান আর উত্তরের বিশাল চীনের আরো সোয়াশ' কোটি মানুষের চাহিদা সন্নিকটবর্তী ক্ষুদ্রায়তন বাংলাদেশকে অপরিমেয় ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-আর্থনীতিক ভূমিকা পালনের সুযোগ এনে দিয়েছে। উপরন্তু মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দরের সুবিধাজনক অবস্থানও দেশটিকে বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে উন্নীত করেছে। ঠিক একই কারণে শুধুমাত্র বিশেষ তাৎপর্যময় ভূ-কৌশলগত অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম ভূ-কৌশলগত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ভূ-খণ্ড হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে এবং আশংকার কথা হল ভবিষ্যতে ভারত-চীনের মধ্যে কোন সম্ভাব্য সংঘাতে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশের ভূ-ভাগ আগ্রাসী শক্তির মহড়া ক্ষেত্রে পরিণত হবে বা হবার সম্ভাবনা আছে।

'চিকেন নেক' (Chicken Neck) শিলিগুঁড়ি করিডোরের বিপন্নতা এবং ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব সম্পর্কে সহজ অনুধাবনের জন্য প্রখ্যাত ভারতিয় কৌশলবিদ (Stratigist Analyst) কে সুব্রামনিয়াম (১৯৭১) লিখিতাংশটিই যথেষ্ট। তিনি তার "Bangladesh and India's Security" পুস্তিকায় এ বিষয়ে বলেন "There is not the same risk of the Chinese cutting of Asam (i.e.N.E. States) as there was in 1962, since in the course of hostilities, the northern Bangladesh is likely to be over-ran by Indian forces, and the communication lines with Asam or N.E. will be broadened rather than narrowed down or closed?" বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সুব্রামনিয়াম ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত হয়ে ঐ সংযোগ ব্যবস্থার আলোকেই বলেন "This country (India) needs no longer be

www.pathagar.com

afraid that in case of military pressure from the China, Asam (N.E.) will be cut off from the rest of India".

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পটভূমিতে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে ভারতের প্রখ্যাত নিরাপত্তা বিষয়ক লেখক ইন্দর মালহোত্রা বলেন, "In the unlikely event of a major military conflagration between India and China in the north-eastern region, Bangladesh because of its geo-strategical location, would acquire immense significance for India's defence planning. Any Pre-emtive Chinese attack southword from Tibetan Chumbi Valley might result in the falling of the narrow Shilliguri Corridor, thus totally cutting off the entire north-easten region from the rest of the country. In such an eventuality, the territory of Bangladesh could only help to establish a link between these two regions"—(Quoted by S. Mahapatra in Stratigic Analysis, 1991).

পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভারত তার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রথম দিকে বেশ নিশ্চিত হলেও মাত্র তিন চার বছরের মধ্যেই তাদের সেই বিশ্বাসে চিড় ধরে। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং ভারত কর্তৃক ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র সিকিম দখল করে নেয়ার (১৯৭৫) পরপরই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বইতে শুরু হয় স্বাধীনতার হাওয়া বিচ্ছিন্নতাবাদের সংগ্রাম। ক্রমে সত্তর, আশি এবং নব্বইর দশকে গড়ে উঠতে থাকে উলফা, স্বাধীন বোড়োল্যান্ড, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা লিবারেশন আর্মি। দার্জিলিং এর সুভাষ ঘিষিং-এর গোর্খাল্যান্ড প্রভৃতি আন্দোলন। শুরু হয় পার্বত্য উপত্যকা, অধিত্যকা তরাই আর ডোয়ার্স পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় সাড়ে তিন কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত আড়াই লাখ বর্গকিলোমিটার ভূ-ভাগ সাতরাজ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কখনো বিচ্ছিন্ন এবং কখনো স্বাধীনতার সম্মিলিত সশস্ত্র সংগ্রাম। ভারতকে তাই আবার বাধ্য হয়ে ঐ অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন দমনের জন্য নিয়োগ করতে হল চার লাখেরও বেশি সামরিক লোকবল। প্রতিমাসেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ঐসব

www.pathagar.com

স্বাধীনতাকামী মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে নিহত হতে লাগল অসংখ্য ভারতিয় সামরিক ও বেসামরিক লোকজন। পুল, সড়ক, রেল সংযোগ শিল্প ও খণিজ স্থাপনা সবই বেপরোয়া নাগা, লুসাই, খাসিয়া, অহম কিংবা বোড়ো-মুক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অব্যর্থ নিশানায় পরিণত হতে লাগল। আর তখন আবার দারুণ অসহায়ভাবে পরম শক্তিধর চতুর্থ বৃহত্তম সামরিক শক্তি ভারতকে তার ঐ বিপন্নপ্রায় বিচ্ছিন্ন ভূ-ভাগের অস্তিত্বের জন্য ঐ অংশে তার "Man, Machine and Materials" পারাপারের নিমিত্তে একটি নিশ্চিত নিরাপদ পথের জন্য বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিটরূপী করিডোর লাভের প্রয়োজনীয়তার কথা আবার চিন্তাভাবনা করতে হল এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর ভারত বাংলাদেশে তার প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন একটি সরকারকে ক্ষমতায় পেয়ে খুব দ্রুত এবং সফল পরিকল্পনার মাধ্যমে তার ঐ পরম কাঙ্ক্ষিত ট্রানজিটরূপী করিডোর লাভের জন্য সকল আয়োজন সম্পন্ন করতে লাগল এবং ভারতের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য সংযোগ করিডোর পাইয়ে দিতেই পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে আপাতত কম বিপজ্জনক ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পাশ্চাত্যের মিত্ররা তাদের প্রভাবাধীন বিশ্বব্যাংক আই.এম.এফ. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং এসকাপ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের লবি গঠন প্রক্রিয়ার বিশেষ সহযোগিতা ও অনুকূল সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে। আর ঐ ভারতকে ট্রানজিট যোগানোর স্বার্থেই ভারত, বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বাংলাদেশের বর্তমানে ক্ষমতাসীন সরকারের সরকারি ও ভারতপন্থি বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবীগণও নানা N.G.O. গবেষণা সংস্থা, ট্রানজিট, এশিয়ান হাইওয়ে, ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে, চট্টগ্রাম বন্দর সুবিধা লিজ দেয়া, উপ-আঞ্চলিক জোট (Sub-Regional Group) গঠন, রিসটেক, বিমসটেক, গ্রোথ-কোয়াড্রাঙ্গল, সাপটা, সাফটা কত কি যে আয়োজন বিয়োজন শুরু করে দিল তার ইয়ত্তা নেই। তবে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, একথা জোরালোভাবে যৌক্তিক উপস্থাপনায় বলা যায় যে, উল্লিখিত সবক'টি আপত সহযোগিতামূলক বিষয়াবলীর মূলে লুক্কায়িত রয়েছে-ভারতের জন্য একান্ত অপরিহার্য ঐ ট্রানজিটরূপী করিডোর ব্যবস্থা। যা সহজ-সরল ব্যাখ্যায়, সকল অর্থেই বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অর্থনীতি, পরিবেশ, শান্তি-শৃংখলা, স্বাস্থ্য সবকিছুর নিরীখেই অশুভ, অলাভাবজনক ও ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী বাস্তবসম্মত যৌক্তিক কারণে ভারতকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে নিজ নিরাপত্তাকে খর্ব ও সংকটাপন্ন করে কোন ট্রানজিটরূপী করিডোর দিতে প্রস্তুত নয়। তাই বিষয়টি অনুধাবন করেই ১৯৯৩-৯৫ সালে বহু পূর্ব থেকে নির্ধারিত বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত Trans Euro-Asian Highway এবং Trans-Asian Railway কে ESCAP (জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা) এর প্রো-ইন্ডিয়া লবির মাধ্যমে ঈষৎ পরিবর্তন সাধন করে 'New Asian Higway Route' স্কীম পরিকল্পিত হয় (১৯৯৩-'৯৫)। যাতে পরিবর্তিত এশীয় মহাসড়ক বাংলাদেশের জন্য সংক্ষিপ্ত ও সহজতম কম খরচের ঢাকা-চট্টগ্রাম, টেকনাফ-আকিয়াব-ঈয়াঙ্গুন রুটটি বাদ দিয়ে ঢাকা সিলেট-তামাবিল-শিলং ঘুরে সাতবোন রাজ্যমালা ছুয়ে বহু ঘোরপথ বা পথের সুদীর্ঘ চড়াই উৎড়াই ও বিচ্ছিন্নতাপ্রবন আসাম, মনিপুর নাগাল্যান্ড, আপার বার্মার মাইটকিনা-মান্দালয় পথ দিয়ে নেয়ার আয়োজন করা হয়েছে। ঠিক একইভাবে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের সুদীর্ঘ ১১ হাজার ৭শ' ৫ কিঃ মিঃ পথ যা অতিসম্প্রতি ঢাকায় মে মাসের (১৯৯৯ শেস সপ্তাহে) বাংলাদেশ সরকার, ভারত সরকার ও এসকাপের প্রতিনিধিদের বিশেষজ্ঞ গ্রুপের চারদিনব্যাপী বৈঠকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে রুটের প্রস্তাবিত দক্ষিণগামী শাখাটি ঐ বৈঠকে চূড়ান্ত হয়। ESCAP-এর বিশেষজ্ঞ ডঃ রহমত উল্লাহর বক্তব্য থেকে জানা যায়-এশীয় মহাসড়কের মত এশীয় রেলওয়েও ভারতের স্বার্থ রক্ষার ঐ একই উত্তর-পূর্ব রাজ্য ছোঁয়া দুর্গমতম পথ ধরেই বাস্তবায়িত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নেপাল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সুবিধাসম্পন্ন প্রস্তাবিত রুটসমূহ ভারতের বাঁধা ও ESCAP এর বিশেষজ্ঞদের টেকনিক্যাল ঘোরপ্যাঁচ বক্তব্যে নাকোচ হয়ে যায়। বাংলাদেশের সুবিধার রুট ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মিয়ানমার নামী প্রাস্তাবিত রুটটি বাদ দিয়ে নতুন দক্ষিণ করিডোর ট্রান্স-এশীয় রেলপথটি ঢাকা-আখাউড়া-সিলেট-করিমগঞ্জ-কাছাড় (আসাম) হয়ে ঐ পার্ব্যত্য হাফলং-নামডিং-তিন সুকিয়া, আপার মায়ানমার (কাচিন স্টেট, শান স্টেট, কারেন স্টেট হয়ে চীনের ইউনান প্রদেশের পূর্বে কুনমিং পর্যন্ত যাবে। অন্যদিকে পথটি পশ্চিমে ভারত-পাকিস্তান-ইরান-তুরস্ক থেকে বুলগেরিয়া পর্যন্ত (সীমান্ত) বিস্তৃত হবে। প্রস্তাবিত এ নতুন রেলপথের জন্য বাংলাদেশ কোন ভাবেই উপকৃত হবে না। সিলেটের শাহবাজপুর থেকে ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জের পথে ভারত তার কাম্য ঐ পরবর্তিত এশিয়ান হাইওয়ের মত এবারও তার কাম্য

www.pathagar.com

ঐ একই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ট্রানজিটরূপী ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ের করিডোরটিই পেতে যাচ্ছে। যা তিনটি মূল কারণে বাংলাদেশের জন্য অর্থহীন ও ক্ষতিকর। কারণ তিনটি হচ্ছেঃ

প্রথমত ঃ এশীয় মহাসড়কের পরিবর্তিত পথের মত ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের প্রস্তাবিত নতুন উত্তর পূর্বমুখী পথটিও (শাহবাজপুর-করিমগঞ্জ) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় গন্তব্যসমূহে পৌছানোর জন্য ১০০০ থেকে ২০০০ কিঃ মিঃ অতিরিক্ত দীর্ঘ পথের কারণ হবে।

দ্বিতীয়তঃ এ রেলপথটিতে প্রায় সাড়ে তিনশ কিঃ মিঃ দীর্ঘ পথে সিসিং লিংক বা কোন ট্রাক নেই। ভারতের উদ্দেশ্য উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যমালায় পৌছানোর পর ভারতের আর দূরবর্তী স্থানে যাবার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে মায়ানমারের পার্বত্য জঙ্গলময় উচ্চাঞ্চল ও প্রায় কূটনৈতিক সম্পর্কহীন চীনের প্রদেশ সমূহেও যাবার প্রয়োজন নেই। তাই পথটিতে ভারতের পরম কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ নেপাল বা পাকিস্তানের কোনই স্বার্থ হাসিল হচ্ছেনা। উপরন্তু পথটি বড়ই দুর্গম, পর্বত সংকুল ও দীর্ঘ সাড়ে তিনশ' কিঃ মিঃ পার্বত্য পথে নতুন ট্রাক বসাতে হবে, ব্রিজ কালভার্ট বানাতে হবে এবং টানেল তৈরিতে বিপুল খরচের দরকার। বাংলাদেশকেও ঐ অর্থের কিছুটা ভার বইতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মনিপুর, আসাম নাগাল্যান্ড, আর আপার মায়ানমারের শান, কাচিন, কারেন, রাজ্যের বিচ্ছন্নতাবাদী গেরিলা কমান্ডোদের দমন বা মোকাবিলায় ভারত ও মায়ানমারের স্বার্থ থাকলেও এদের অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশের পণ্যবাহী ট্রাক, রেলের বগী ও কনভয় কিভাবে যে সহজেই পার হতে পারে তা শুধুমাত্র বোকার স্বর্গের গজদন্ত পালঙ্কে সুখ-শয়ানে শায়িত মূর্খরাই ভাবতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, এই মাত্র গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহেই ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতাকামীদের হামলায় ভারতের কুচবিহার রেলস্টেশনে সৈন্যসহ প্রায় ১০০ জন ভারতিয় হতাহত হয়েছে।

ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ নেপালের বাণিজ্যিক ট্রানজিটের সড়ক যোগাযোগ যা ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চালু হয় তা'ও মাত্র এক মাস পরেই ভারতের অযৌক্তিক এবং একপেশে

www.pathagar.com

স্বার্থপরতাময় শর্ত, আচরণে ও তৎপরতার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। নেপাল-বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তি ১৯৭৬ সালে সম্পাদিত হলেও প্রায় ২১ বছর ধরে ভারতের একগুঁয়েমি ও স্বার্থপরতার জন্য বাস্তবায়িত হতে পারেনি। বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের ট্রানজিটরূপী করিডোর চুক্তি বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশি জনগণকে "আই-ওয়াশ' (Eye-Wash) করারই উদ্দেশ্য মনে হয় ভারত বাংলাদেশ-নেপাল ট্রানজিট বাস্তবায়নে ভারতের ৫৫ কিঃ মিঃ করিডোরের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার দিতে রাজি হয়। ভারতের উপর দিয়ে মাত্র কয়েক কিঃ মিঃ পথে বাংলাদেশ-নেপালের কনটেইনার ও ট্রাক পারাপারে ভারত যে অযৌক্তিক কঠোর শর্ত-টার্মস কন্ডিশন আরোপ করে তা থেকে ভারতের এ বিষয়ে অনীহাই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ঐ সময়ের নেপালি রাষ্ট্রদূত লোকবাহাদুর শ্রেষ্ঠা দৈনিক ভোরের কাগজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে (সেপ্টেম্বর ১৯৯৭) বলেন-"ভারতের শর্ত মেনে বাংলাদেশ-নেপাল ট্রানজিট চুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন কঠিন হবে।"

দীর্ঘ ৪০/৫০ বছর ধরে স্থলবেষ্টিত নেপালকে তার সীমান্ত থেকে প্রায় ১২০০ কিঃ মিঃ দূরের কলকাতা বন্দর দিয়ে তার বহির্বাণিজ্য চালাতে হচ্ছে। ভারতের একটুও বিরাগভাজন হলে তাকে বরণ করতে হয় নিষ্ঠুরতম বাণিজ্যিক ট্রানজিট অবরোধের। ১৯৯০ সালে ভারতের অমতে চীন থেকে মাত্র এক ট্রাক বোঝাই সমরাস্ত্র খরিদ করার মাশুল হিসাবে নেপালকে ভোগ করতে হয় এমনি এক নিষ্ঠুরন দীর্ঘ বাণিজ্যিক অবরোধের। অথচ, ভারত তার উপর দিয়ে মাত্র ২০/৩০ মাইলের একটু পথ দিলেই নেপাল প্রায় ৫০০ কিঃ মিঃ দূরত্বের বাংলাদেশের মংলা বন্দরটির সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারত। কিন্তু ভারত তা দিতে জানেনা, পারেনা। কারণ, তা ভারতের কৌশলগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থের পরিপন্থি। ভারতের এমন স্বার্থপরতার চিত্র ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পরই নগ্নভাবে ধরা পড়ে। পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান জিন্নাহ ঐ সময়ে নেহরুকে মাত্র ছয় মাসের জন্য কলকাতা বন্দরের সুবিধা পূর্ব-পাকিস্তানকে দেবার অনুরোধ করলে নেহরু ও তার সহকর্মী বল্লভ ভাই প্যাটেল সাফ সাফ বলে দেন "ছ'মাস তো কল্পনাতীত ছ'দিন এমনকি ছ'ঘন্টার জন্যও পূর্ব-পাকিস্তানকে কলাকাতা বন্দর বা কোনরূপ ট্রানজিট সুবধা দিতে পারব না।" প্রখ্যাত বৃটিশ লেখক হডসন তার "Great Devide" বইয়ে এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা বিধৃত করেছেন। যে ভারত তার নিরপত্তার জন্য ও অর্থনীতির স্বার্থে

www.pathagar.com

নেপাল ও বাংলাদেশকে সুদীর্ঘ ৫০ বছরেও কোন ট্রানজিট ছাড় দিতে পারলনা এখন কেমন করে বাংলাদেশ তার আর্থিক, নিরাপত্তা, সামরিক, পারিবেশিকসহ সকল সার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ঐ স্বার্থপর ও আধিপত্যবাদী আগ্রাসী প্রতিবেশীকে তার উপর দিয়ে সুদীর্ঘ ট্রানজিটরূপী করিডোর দিতে পারে? আজকাল বাংলাদেশের ভারতের প্রতি অনুকূল মনোবাবাপন্ন সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকাসমূহ পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারতের নগ্ন সামরিক আগ্রাসন, ভারতিয় বিএসএফ-এর আক্রমণ এবং ভারতিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর হুমকির খবর ছাপতে শুরু হয়েছে। মনে হয় বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশপ্রেমিক জনগণের সচেতন জাগরণ ও প্রতিক্রিয়াই ঐসব ভারতপন্থি পত্র-পত্রিকাসমূহকে সত্য প্রকাশে বাধ্য করছে। আর ঐ প্রকাশিত সত্য সংবাদসমূহই বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের উঃ-পূঃ রাজ্যমালায় নানা নামাঙ্কিত (ট্রানজিট, এশিয়ান হাইওয়ে, ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে ইত্যাদি) করিডোর সুবিধা প্রদানের উদ্যোগের বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রমাণস্বরূপ।

বাংলাদেশের সীমারেখার বণ্টন ঃ

রাজ্য/রাষ্ট্র	মাইলে দৈর্ঘ্য	সীমানা
পশ্চিমবঙ্গ	১৩৮০	নদীতে
আসাম	১৭২	৪৫৩
মেঘালয়	২৬৬	স্থলে
ত্রিপুরা	৫৬০	১০২৬
মিজোরাম	১৯০	পাহাড়ে
ভারত	২৫৬৮	৪৯৮
মায়ানমার	১৬২	সমুদ্রে
সমুদ্র	৪৪৫	৪৪৫
মোট		৩১৭৫

সূত্রঃ গ্রাফোসম্যান মানচিত্র থেকে পরিমাপ করা পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কোন দিক দিয়েই ভারতের সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের কোন অংশই ৮০ মাইলের বেশি দূরে নাই।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৪

দক্ষিণ তালপট্টি বিতর্ক ঃ একটি ভূ-রাজনৈতিক পর্যালোচনা

ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলো বিবাদ-বিসম্বাদ এবং পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সমস্যা বর্তমান রয়েছে সেগুলোর মধ্যে দু'দেশের মধ্যকার সীমানা ও আঞ্চলিক মালিকানা সম্পর্কিত ভূ-রাজনৈতিক সমস্যাবলীই প্রধান। দেশ দু'টির মধ্যে বিরাজমান ভূ-রাজনৈতিক সমস্যাবলীর মধ্যে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা-তিনবিঘা ইত্যাদি ছিটমহল সমস্যা, মুহুরির চর, নদী-সিকস্তী সমস্যা, কুশিয়ারা নদীতে জকিগঞ্জ-করিমগঞ্জ গ্রোয়েন ও নদী ভাঙ্গন সমস্যা, সিঙ্গার-বিল-লাটিটিল্লা সীমান্ত চিহ্নিতকরণ সমস্যা, দক্ষিণ তালপট্টি-নিউমূর দ্বীপের মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ, গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানির হিস্যা সংক্রান্ত বিতর্ক এবং দু'দেশের মধ্যকার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র-সীমা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত সমস্যাবলী উল্লেখযোগ্য।

ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যকার এসব ভূ-রাজনৈতিক বিরোধসমূহের বেশির ভাগই দেশ দু'টির রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সূত্রে উদ্ভূত হয়েছে। এসব সমস্যাবলীর মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ তালপট্টি/নিউমূর দ্বীপের মালিকানা সংক্রান্ত বিবাদ ছাড়া অন্য সব ক'টি সমস্যাই উপমহাদেশের ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগ সময়কার বিখ্যাত এবং বিতর্কিত 'রেডক্লিফ রোয়েদাদ'-এর তিক্ত ফলশ্রুতি।

'দক্ষিণ তালপট্টি/নিউমূর বিতর্ক' ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দানা বেঁধে উঠতে থাকে (Far Eastern Economic Review, May 2, 1980)। উপমহাদেশের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমারেখার প্রায় মধ্যভাগে বঙ্গোপসাগরের অগভীর উপকূলীয় সমুদ্রাঞ্চলে জেগে ওঠা ক্ষুদ্রাকার এ দ্বীপটির মালিকানার সাথে উভয়

www.pathagar.com

দেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা মালিকানা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে (Rahman, 1987)। দ্বীপটির জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ ও ভারত উভয়েই নানা যুক্তি তর্ক দিয়ে দ্বীপটিকে নিজ নিজ মালিকানায় সীমান্তভুক্ত বলে দাবি করে আসছে এবং ক্রমে দু'দেশের এই মালিকানা সংক্রান্ত দাবি একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিতর্ক ও ভূ-রাজনৈতিক বিবাদে পর্যবসিত হয়েছে (Mitri, 1981)

দক্ষিণ তালপট্টির অবস্থান ও ভূ-রূপতত্ত্ব

দক্ষিণ তালপট্টি/নিউমূর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের অগভীর জলভাগের মহীসোপান (Continental shelf) এলাকায় জেগে ওঠা একটি দ্বীপ। দ্বীপটি গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থার বিভিন্ন শাখা নদীর (Distributaries) পলল অবক্ষেপণের (Siltation) ফলে গড়ে উঠেছে। ল্যান্ডসেট (LANDSAT) ও এ্যারিম (ERIM) জরিপ ভূ-উপগ্রহ সূত্র থেকে সংগৃহীত দূর অনুধাবন চিত্র (Remotely Sensed Imageries) থেকে দেখা যায় যে, দ্বীপটি বাংলাদেশের নিকটবর্তী মূল উপকূলীয় ভূ-খণ্ড থেকে মাত্র ৬,০০০ মিটার দূরে অবস্থিত এবং দ্বীপটি থেকে নিকটতম ভারতিয় ভূ-খণ্ডের দূরত্ব প্রায় ৫,৫০০ মিটার (LANDSAT TM BAND-7, Feb, 1988)।

দক্ষিণ তালপট্টি ২১° ৩৭´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৯° ১২´ পূঃ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বর্তমানে দ্বীপটির আয়তন প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার। জোয়ার-ভাটার উচ্চতম এবং নিম্নতম উত্থান-পতনে দ্বীপটির সমুদ্র সমতল (Sea level) থেকে জেগে থাকা ভূ-ভাগের আয়তন বর্তমানে প্রায় ৫ বর্গ কিলোমিটার থেকে ১২ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপাঞ্চলে যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও তজ্জনিত উপকূলীয় বন্যা (গর্কি) আঘাত হানে তার ঠিক পরেই ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তরেখা বরাবর (২৪ পরগনা জেলার বশীরহাট থানা ও সাতক্ষীরা জেলার মধ্যকার নদী দ্বারা চিহ্নিত) দক্ষিণে উপকূলের অগভীর সমুদ্রে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় (প্রায় ২ কিঃমিঃ দক্ষিণ) এ ক্ষুদ্র দ্বীপটির আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১৯৭১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের সুন্দরবনাঞ্চলের মৎস্যজীবীরা সর্বপ্রথম দ্বীপটির অস্তিত্বের কথা প্রচার করে। বাংলাদেশের বৃহত্তর

www.pathagar.com

খুলনা জেলার কালিগঞ্জ থানাধীন তালপট্টি দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থানহেতু নতুন দ্বীপটিকে তারা 'দক্ষিণ-তালপট্টি' নামে অভিহিত করে। পরে বাংলাদেশের খুলনা জেলা প্রশাসন এবং জরিপ বিভাগ স্বীয় প্রশাসনিক দলিল-পত্রে দ্বীপটিকে ঐ একই নামে নথিভুক্ত করে। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নজরে দ্বীপটির অভ্যুদয় ধরা পড়ে। ঐ সময় বাংলাদেশ তুমুল স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে দ্বীপটির দখলদারি কিংবা মালিকানাস্বত্ব নিয়ে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করারও সময় বা সুযোগ পায়নি। কিন্তু ভারত ঐ সময় দেরি না করে জেগে ওঠা নতুন দ্বীপটিকে এককভাবে নিজ মালিকানায় 'নিউমূর দ্বীপ' (The New Moore Island) নামে চিহ্নিত করে এবং তা বৃটিশ নৌ-জরিপ কর্তৃপক্ষকে (British Admirality) অবহিত করে (Gulati, 1988)। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাসহ ভারতের প্রায় সকল প্রচার মাধ্যমে দ্বীপটির বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রপাগান্ডা চালানো হয়। এর মধ্যে অনেক বিবরণ ও তথ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তিমূলক বিষয়ও স্থান পায়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদ মাধ্যমসমূহ দ্বীপটিকে কখনো 'নিউমূর' আবার কখনো 'পূর্বাশা' নামে প্রকাশ করতে থাকে (Gongal, 1982)।

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের আকৃতি প্রায় গোলাকার এবং ভাটার সময় সমুদ্রের পানি নেমে গেলে দ্বীপটিকে অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির (Cresent shaped) ভূ-ভাগ বলে মনে হয়। হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনা থেকে দ্বীপটির দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার। হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মূল স্রোতধারা (Main Channel flow) দ্বীপটির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দ্বীপটির সরাসরি উত্তরে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড তালপট্টি (সাতক্ষীরা জেলাধীন) এবং দক্ষিণে উন্মুক্ত বঙ্গোপসাগর। ১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ERTS ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে সর্বপ্রথম দ্বীপটির দূর-অনুধাবন চিত্র গ্রহণ করা হয় (Gulati, 1988)। তখন দ্বীপটির মোট গড় আয়তন ছিল প্রায় ২,৫০০ বর্গ মিটার। এর পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত নানা দূর-অনুধাবন চিত্র ও জরিপ-রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, ক্রমান্বয়ে দ্বীপটির আয়তন বেড়েই চলেছে এবং বর্তমানে দ্বীপটির মোট জেগে ওঠা ভূমির গড় পরিসর ৮,০০০ বর্গমিটারেরও বেশি। অতি সাম্প্রতিক ভূ-উপগ্রহ উপাত্ত (Satellite Data) দক্ষিণ তালপট্টির চতুর্পার্শ্বের স্বল্প গভীর সামুদ্রিক পানিতে প্রায় জেগে ওঠা বিশাল ডুবন্ত ভূ-খণ্ডের (Submerged Shoals) উপস্থিতি

www.pathagar.com

সম্পর্কে অবহিত করছে (ERTS/NASA, Hyderabad, 1989-90)। ধারণা করা যায় যে, আগামি এক দশকের মধ্যেই দক্ষিণ তালপট্টির মোট গড় আয়তন কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ বর্গ কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাবে। বর্তমানে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনার কাছে দ্বীপটির উত্তরে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেশ কিছু ডুবন্ত চড়া (Sandbars) দেখা যাচ্ছে। দ্বীপটি ও চতুর্পাশের ভূ-রূপতাত্ত্বিক (Geomorphological) অবস্থা এবং সংলগ্ন হাড়িয়াভাঙ্গা ও রাইমঙ্গল নদীদ্বয়ের পানিতাত্ত্বিক (Hydrological) চল-প্রক্রিয়া থেকে অনুমান করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে দ্বীপটি উত্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ডের সাথে সংযুক্ত (Connected or linked) হয়ে যাবে (Rob, 1989)।

বর্তমান গবেষণা কাজে ভূ-উপগ্রহ দ্বারা সংগৃহীত দূর অনুধাবন চিত্র (Satellite Imageries) এবং বিমান আলোকচিত্র (Aerial Photographs) বিশ্লেষণের সাহায্যে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ এবং এর পার্শ্ববর্তী অগভীর উপকূলীয় সমুদ্রাঞ্চলের ভূ-রূপতত্ত্ব (Geomorphology) এবং ভূমিরূপ (Topography) পর্যালোচনা করার চেষ্টা চালানো হয়েছে এবং এর ফলাফলের আলোকে দ্বীপটির মালিকানার প্রশ্নে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে তার যৌক্তিক সমাধান বের করারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখানে প্রধানত LANDSAT (SPARRSO), 1988 এবং ERTS (NASA), 1990 সূত্র থেকে সংগৃহীত ভূ-উপগ্রহ ভিত্তিক দূর অনুধাবন উপাত্ত (Remotely sensed data) এবং ভারতিয় জরিপ বিভাগের সংগৃহীত বিমান আলোকচিত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে (Survey of India, 1988)।

দক্ষিণ তালপট্টি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩.২ কিঃমিঃ দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ প্রায় ২.৫ কিঃমিঃ বিস্তৃত। দ্বীপটির নতুন গড়ে ওঠা ভূমির বিস্তার উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে বেশি হারে পরিলক্ষিত হয়। হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মূল স্রোতধারার প্রবাহ হেতু দ্বীপটির পশ্চিমাংশে বেশি পরিমাণে পলি-সঞ্চার ঘটছে না। বরং নদীটির এই স্রোতধারার প্রভাবে বর্তমান দ্বীপটির পশ্চিমাংশের বেশ কিছু পুরনো মগ্ন চড়া (Shoals) ক্ষয়ীভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ মগ্ন উপকূলীয় চড়াগুলোর অবস্থান ভারতিয় জরিপ বিভাগের ১৯৪১ সালের 'কোয়ার্টার ইঞ্চি' টপোগ্রাফিক মানচিত্রে পরিষ্কারভাবে বিধৃত রয়েছে (Survey of India, 1941)। দ্বীপটির সর্বোচ্চ স্থানের উন্নতি সমুদ্র-সমতল (Sea-

www.pathagar.com

level) থেকে মাত্র ১.৩ মিটার। দ্বীপটির উত্তরাংশের উচ্চতা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে মধ্যভাগ থেকে একেবারে উত্তরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অগভীর লেগুনের সৃষ্টি হয়েছে। এই লেগুনটির উত্তরাংশ উন্মুক্ত এবং পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ সংকীর্ণ ভূ-বাহুর বেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ। বর্তমানে শুধুমাত্র জোয়ারের সময় ছাড়া ঐ লেগুন প্রায় শুকনো থাকে এবং বিস্তৃত কর্দম-সমভূমি (Mud-flat) ঐ স্থান জুড়ে অবস্থান নেয়।

দূর-অনুধাবন ও বিমান চিত্র বিশ্লেষণে দক্ষিণ তালপট্টির উত্তরে একটি লম্বাকৃতির মগ্ন-চড়ার অবস্থান ধরা পড়ে। স্থানীয় (সুন্দরবনাঞ্চলের) মৎস্যজীবীরাও একবাক্যে ঐ মগ্ন দ্বীপের কথা উল্লেখ করে থাকে। উপকূলীয় ভূ-রূপতত্ত্বের নিরিখে দেখা যায় যে, দক্ষিণ তালপট্টি এবং এর উত্তরের এই নতুন গড়ে ওঠা মগ্ন ভূ-ভাগ অগভীর ডুবন্ত পলল-সঞ্চিত ভূ-খণ্ডের দ্বারা উত্তরের মূল ভূ-খণ্ড তালপট্টির (বাংলাদেশ) সাথে সংযুক্ত রয়েছে। ভাটার সময় ঐ ডুবন্ত পলল-রেখার গড় গভীরতা মাত্র ২ থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত থাকে। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের চতুর্পার্শ্বের ১০ কিঃমিঃ বিস্তার পর্যন্ত উপকূলীয় সমুদ্রের গড় গভীরতা মাত্র ৩ মিটার থেকে ৫.৫ মিটার পর্যন্ত। দ্বীপটি থেকে সোজা প্রায় ৪৩ কিঃমিঃ দক্ষিণে গভীর সামুদ্রিক খাত 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' (Swatch of no Ground)-এর অবস্থান। দ্বীপটির পশ্চিম দিক ছাড়া প্রায় তিন দিকেই অসংখ্য অগভীর ডুবন্ত নতুন চড়ার বিস্তার ও অভ্যুদয় ঘটছে। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা বন বিভাগের (রেঞ্জ) চান্দবাড়িয়া দক্ষিণ তালপট্টির সবচেয়ে নিকটতম বাংলাদেশি ভূ-ভাগ। দ্বীপটির ভূ-রূপতাত্ত্বিক (Geomorphological)। বিস্তারের প্রবণতা (Trend of land formation) মূলত উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে প্রলম্বিত। দ্বীপটির ঠিক বর্তমান অবস্থানে ১৯৪১ সালের টপোগ্রাফিক মানচিত্রে ঐ একই দিকে প্রলম্বিত তিনটি ডুবন্ত পলল-সঞ্চয়ের অবস্থান দেখা যায় (Survey of India, 1941)। এর থেকে ধারণা করা যায় যে, দক্ষিণ তালপট্টির সূচনা ১৯৭১ সালেরও প্রায় চার দশক আগে জরিপ বিভাগের গোচরে ছিল। বর্তমান যুগের যে কোন ভূমিরূপ মানচিত্রেও ঐ অঞ্চলের অন্যান্য সংলগ্ন বেশির ভাগ উপকূলীয় মূল ভূখণ্ড বা দ্বীপের ভূ-বিস্তৃতির ধারা (Trend of land accretion) প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

দক্ষিণ তালপট্টির পূর্বদিকে প্রবাহিত রাইমঙ্গল নদীর ধারা গড়ে ১০/১২ মিটার গভীর। পক্ষান্তরে পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হাড়িয়াভাঙ্গার মূল স্রোতধারার গড় গভীরতা প্রায় ২০ মিটার। দ্বীপটির পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকের সংলগ্ন সমুদ্রতল উল্লেখযোগ্যভাবে অগভীর এবং মৃদু ঢাল বিশিষ্ট। উত্তরের নিমগ্ন সমুদ্র তলের গভীরতা আরোও কম। কিন্তু পশ্চিমে সমুদ্র ও নদী খাতের গভীরতা দ্বীপটির উপকূল ভাগ থেকে হঠাৎ করে গভীর খাতে রূপ নিয়েছে। এখানে দ্বীপটির ভূমিখাত সমুদ্র তলে খুবই উলম্বভাবে নেমে গেছে।

দক্ষিণ-তালপট্টি দ্বীপ মূলতঃ একটি জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত উপকূলীয় পললজাত ভূ-খণ্ড (Rob, 1989) । দ্বীপটির উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিমাংশের ভূমিরূপ হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীদ্বয়ের দ্বারা প্রভাবিত এবং দক্ষিণাংশের ভূ-গঠনে বঙ্গোপসাগরের প্রভাব প্রকট। বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র পৃষ্ঠের ঋতুভিত্তিক (Seasonal) এবং (Diurnal) দৈনন্দিন উত্থান-পতন ও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপাঞ্চলের পলল-সমৃদ্ধ বিপুল অবক্ষেপণের ফলশ্রুতিতে অগভীর মহীসোপানের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জলভাগে দ্বীপটির উৎপত্তি এবং বিকাশ ঘটে। দ্বীপটির দক্ষিণাংশে প্রধানত বালি-কর্দম মিশ্রিত তটভূমি এবং উত্তর ও পূর্বাংশে পলি-কর্দম এবং পাঁকজাত সমভূমির সাক্ষাৎ মেলে। বিগত কয়েক বছর থেকে দ্বীপটির দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে উপকূলীয় লবণাক্ত প্লাবন বনায়নের (Coastal Mangrove forest) লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের কর্দম ও পাঁক সঞ্চিত লেগুন এবং পার্শ্বস্ত ভূ-ভাগে এখনো কোনরূপ উল্লেখযোগ্য উদ্ভিজ্জ বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এসব উদ্ভিজ্জ ও বনায়ন দক্ষিণ-তালপট্টি দ্বীপের স্থায়িত্ব বা ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। দ্বীপটির পশ্চিমাংশের কিছু স্থানে হাড়িয়াডাঙ্গা নদীর স্রোতের ধাক্কাজনিত ক্ষয়ীভবন (Erosion) প্রক্রিয়া তৎপর রয়েছে।

দক্ষিণ তালপট্টিসহ উত্তর বঙ্গোপসাগরের অন্যান্য সকল উপকূলীয় ভূ-খণ্ডেই ঘূর্ণিঝড় এবং তদ্ভূত খরস্রোতা বন্যা প্রায়শই আঘাত হানে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপে ভূমিক্ষয় (Erosion) এবং ভূ-সঞ্চয়ন (Deposition) এই উভয় ধরনের ভূ-রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে থাকে আবার কখনো কখনো বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় ও জোয়ারবানে দ্বীপটির প্রায় সম্পূর্ণ এলাকাই সমুদ্রের পানির নিচে তলিয়ে যায়।

www.pathagar.com

দক্ষিণ তালপট্টির ক্ষুদ্র পরিসরে যেসব ভূ-রূপতাত্ত্বিক ভূমিরূপ পরিদৃষ্ট হয় সেগুলো হচ্ছে ঃ

ক) জোয়ার-ভাটাজাত প্লাবন সমভূমি (Tidal Flats)

খ) জোয়ার-ভাটাজাত লেগুন ও জলাভূমি (Tidal Lagoon and Swamp)

গ) নদীবাহিত পললজাত মগ্নচড়া (Shoal Formations)

ঘ) নদীবাহিত কর্দমজাত নিম্নভূমি (Mud Flats)

ঙ) পূর্বাঞ্চলের নদী ক্ষয়জাত সোপানতট (Erosional Terricebeach)

চ) দক্ষিণ-পূর্বাংশের বালুকা-বেলাভূমি, (Sandy Beach)

ছ) অন্যান্য ক্ষুদ্রাকার ভূমিরূপ, যেমন- বালিয়াড়ী, উর্মিলেখ, কর্দমলেখ (Sand-dunes, Ripple Marks, Sand ridge, swast' marks, etc.)।

দ্বীপটির গঠন কাজে নদীবাহিত পলি এবং কাদার ভূমিকা মুখ্য। অপেক্ষাকৃত বড় দানার বালুকারাশির সঞ্চয় দ্বীপটির দক্ষিণ এবং পশ্চিমাংশে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

উপরোল্লিখিত দক্ষিণ-তালপট্টি দ্বীপের ভূ-রূপতাত্ত্বিক বিবরণ থেকে ধারণা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে দ্বীপটি আয়তনে আরো বৃদ্ধি পাবে এবং এ বৃদ্ধির গতি উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখী। দ্বীপটির চতুর্পার্শ্বের সমুদ্রতাত্ত্বিক অবস্থা (Oceanographic situation) এবং নদীতাত্ত্বিক পরিস্থিতি (Fluvio-Hydrological condition) থেকে বুঝা যায় যে, দ্বীপটির পশ্চিমাংশে নদীর ভাঙ্গন ও গভীরতা ঐ দিকে দ্বীপটির ভূ-গঠনের প্রতিকূলে কাজ করছে। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কালব্যাপী দ্বীপটির ভূ-গঠনের যে প্রক্রিয়া চলে আসছে বর্তমানেও তা সক্রিয় রয়েছে এবং দ্বীপটিতে প্রাকৃতিক বনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নবীন ভূমির স্থায়িত্ব ও দৃঢ়করণের পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

দক্ষিণ তালপট্টির ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

আয়তনের দিক বিচারে দক্ষিণ তালপট্টি একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ হলেও ভূ-রাজনৈতিক নিরিখে দ্বীপটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই ক্ষুদ্রাকার উপকূলীয় দ্বীপটির মালিকানার সাথে জড়িত রয়েছে বাংলাদেশ এবং ভারত উভয় রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

বঙ্গোপসাগরের এক বিশাল আঞ্চলিক সমুদ্রাঞ্চলের (Territorial Sea) উপর সার্বভৌমত্বের স্বার্থ। ভারত ও বাংলাদেশের সাধারণ আঞ্চলিক সমুদ্রের মালিকানার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সীমানা-নির্ধারণী নিষ্পত্তি হয়নি। ফানেলাকৃতির উত্তর-বঙ্গোপসাগরের ভারত-বাংলাদেশ সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকার ভূমিরূপ অত্যন্ত ভগ্ন এবং অসমান। ১৯৬০ সালের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে ভারত ১২ নটিক্যাল মাইল আঞ্চলিক সমুদ্র এবং ২০০ মাইল পর্যন্ত সংরক্ষিত আর্থনীতিক সমুদ্র এলাকা (Exclusive Economic Zone) মেনে নেয় (Sinha, 1977 and Rahman, 1988-এ)। বাংলাদেশও ১৯৭৪ সালে গৃহীত 'Territorial waters and Maritime Zone Act'-এর ঘোষণায় ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত 'আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল' নির্ধারণ করে (T.W.M. Act No, xxvi, 1974)। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ '১০ ফ্যাদম' সমুদ্রতল সমোন্নতি রেখা পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে নিজ আঞ্চলিক সমুদ্র এলাকা ঘোষণা করে (Francalanci, et.al, 1986)। এর ফলে এই নতুন 'ভিত্তিরেখা' (Base-line)-র নিরিখে বাংলাদেশের 'সংরক্ষিত আর্থনীতিক সমুদ্র এলাকা' (E.E.Z)-র সীমানাও পরিবর্তিত হয়। এই দাবি এবং স্থানীয় ভৌগোলিক ও ভূ-রূপতাত্ত্বিক বিশেষত্বের কারণে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের 'আঞ্চলিক সমুদ্রাঞ্চল' (Territorial Sea) এবং 'সংরক্ষিত আর্থনীতিক সমুদ্র এলাকা'র (E.E.Z.) মালিকানা নিয়ে তীব্র মতভেদ ও বিতর্কের উদ্ভব হয় (Franda, 1982)।

বাংলাদেশের উপকূল থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগরের গভীরে প্রায় ৩৫০ থেকে ৫০০ কিঃ মিটার দূর পর্যন্ত সমুদ্রের মহীসোপানের (Continental shelf) বিস্তৃতি। এই মহীসোপান অঞ্চলের গভীরতা অত্যন্ত কম এবং সমুদ্র তলদেশের ঢাল সন্তোষজনকভাবে মৃদু (Islam, 1978 and Ahmed, 1970)। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে এই অঞ্চলে দ্বীপাঞ্চলের ভূমি-পরিবৃদ্ধির (Deltaic Land-accretion) হার খুবই বেশি। কর্নেল রেনেলের (১৭৭০ ইং) জরিপের পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৬৫০ বর্গ কিঃ মিটার নতুন বদ্বীপ-ভূমির পরিবৃদ্ধি ঘটেছে (Pramanik, 1983 and Rob, 1989)। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপকে কেন্দ্র করে দ্বীপটির পার্শ্ববর্তী অগভীর সমুদ্রাঞ্চলে অদূর ভবিষ্যতে নতুন ব-দ্বীপ ভূমির পরিবৃদ্ধি

www.pathagar.com

সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। তাছাড়া দ্বীপটির দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার সংরক্ষিত আর্থনীতিক অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক সম্পদের সম্ভাবনা রয়েছে। ঐ এলাকার সমুদ্রতলে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, এ্যালুমিনিয়াম, তেজস্ক্রিয় ভারি খনিজ পদার্থ ইত্যাদির বিপুল সঞ্চয় রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে (Mallik, 1976)। বঙ্গোপসাগরের অগভীর মহীসোপান তলদেশে খনিজ তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বড় ধরনের সঞ্চয় আবিষ্কৃত হয়েছে (Miah, 1984)। দক্ষিণ তালপট্টি ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমারেখা সন্নিহিত এলাকায় অবস্থান লাভ করায় এর মালিকানা নিয়ে দেশ দু'টির মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারত দ্বীপটিকে নিজ সীমানাভুক্ত বলে দাবি করছে। যে দেশই দ্বীপটির চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব লাভ করবে সে দেশ বঙ্গোপসাগরে স্বীয় 'আঞ্চলিক সমুদ্র' (Territorial Sea) এবং 'সংরক্ষিত আর্থনীতিক অঞ্চল' (Exclusive Economic Zone) হিসাবে এক উল্লেখযোগ্য বিরাট সমুদ্র এলাকার উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং অধিকার লাভে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ যদি দ্বীপটিকে নিজ মালিকানায় লাভ করে তবে দ্বীপটির পশ্চিম দিয়ে হাড়িয়াভাঙ্গার মূল মধ্যস্রোতরেখা ধরে প্রলম্বিত হয়ে ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা আরো দক্ষিণ-পশ্চিমে গভীর সমুদ্রে এগিয়ে যাবে। এর ফলে একদিকে যেমন বাংলাদেশের 'আঞ্চলিক সমুদ্র' কৌণিকভাবে প্রবৃদ্ধি লাভ করে কয়েক হাজার বর্গ কিঃ মিটার বেড়ে যাবে অন্যদিকে একই নিয়মে দেশের 'সংরক্ষিত আর্থনীতিক অঞ্চল'ও বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর বিপরীত পরিস্থিতিতে অনুরূপভাবে ভারত লাভবান হবে এবং বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উত্তর বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র তাত্ত্বিক (Oceanographic) পরিস্থিতি বিশ্লেষণে জানা যায় যে, বাংলাদেশের উপকূল থেকে দক্ষিণে প্রায় ৫০০ কিঃ মিটার দূর পর্যন্ত মহীসোপানের বিস্তৃতি এবং এই অগভীর সমুদ্রাঞ্চলের মোট আয়তন কমপক্ষে ৩,২৫,০০০ বর্গ কিঃ মিটার (Rahman, 1990) । আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের সর্বশেষ নীতি অনুযায়ী (UNCLOS) উপকূলীয় দেশের রয়েছে নিজ দেশের সংলগ্ন মহীসোপানের যাবতীয় সমুদ্রসম্পদরাজীর ব্যবহার ও মালিকানাস্বত্ব ভোগ করার একচ্ছত্র অধিকার (Rahman, 1988-B)। এক হিসাবে দেখা যায় যে, দক্ষিণ তালপট্টির মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রায় ২৫ বর্গ কিঃমিঃ বা তার চেয়েও বেশি পরিমাণ সমুদ্রাঞ্চলের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব লাভ বা খোয়ানোর স্বার্থ

www.pathagar.com

জড়িত রয়েছে (Mitra, 1981)। তাছাড়া বাংলাদেশ যে যুক্তিবলে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত তা ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত চিহ্নিতকরণ- ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত 'রেড-ক্লিফ রোয়েদাদ'-এর 'নদীর মধ্যস্রোত রেখা নীতি' বা 'Mid-channel flow or The Thalweg Doctrine' এর ভিত্তিতে সূচিত। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ আরো অনেক সীমানা (বিশেষ করে নদী-বিভাজিত সীমান্ত এলাকায়) সংক্রান্ত সমস্যা এই নীতির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হয়েছে (Ahmed, 1958)। সুতরাং দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের বর্তমান মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধটিও ঐ একই প্রতিষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক নীতির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি না হলে ভবিষ্যতে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার উদ্ভূত অন্য যে কোন নতুন সীমানা সংক্রান্ত বা আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে বিশেষ জটিলতা দেখা দিতে পারে।

দক্ষিণ তালপট্টি-নিউমূর বিতর্ক ঃ ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সর্বপ্রথম বিতর্কিত এই দ্বীপটি ভারতিয় কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে এবং তাদের উদ্যোগে বৃটিশ নৌ কর্তৃপক্ষের ছকে দ্বীপটি নিউমূর (New Moore Island) নামে নথিভুক্ত হয় (Far Eastern Economic Review, 1980)। ১৯৭৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ERTS ভূ-উপগ্রহ দ্বীপটির অবস্থান নির্ণয় করে এবং এই সিরিজের সংগৃহীত দূর-অনুধাবন চিত্রের মাধ্যমে ভারতের হায়দারাবাদস্থ 'ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং এজেন্সি' দ্বীপটির মানচিত্র এবং অন্যান্য তথ্য-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন তৈরি করে। এসব তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে ভারত সরকার দ্বীপটিতে নিজ মালিকানা দাবি করে। ঐ বছরই ভারত-বাংলাদেশের যৌথ বৈঠকে 'দক্ষিণ তালপট্টি-নিউমূর' বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বীপটির মালিকানার প্রশ্নে বাংলাদেশের তরফ থেকে তখন কোন জোরালো দাবি বা প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়নি (Gulati, 1988)। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ছয়টি বিদেশি কোম্পানির সাথে দেশের আঞ্চলিক সমুদ্র এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ–তৈল অনুসন্ধান সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করলে এদেশেও বিতর্কিত দ্বীপটি সম্বন্ধে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও অনুসন্ধান তৎপরতা শুরু হয় এবং দ্বীপটিকে 'দক্ষিণ-তালপট্টি' হিসাবে দেশের পত্র-পত্রিকায় এবং পরবর্তী সময়ে সরকারি

www.pathagar.com

নথিপত্রে রেকর্ড করা হয়। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে দেশ দু'টির মাঝে প্রচুর বাক-বিতণ্ডা এবং বিতর্ক চলতে থাকে (The London Financial Times, 1981)। পরিশেষে ১৯৭৯-এর এপ্রিল মাসে যখন ভারতের তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী সরকারি সফরে ঢাকা আসেন তখন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দক্ষিণ-তালপট্টির ব্যাপারে সুস্পষ্ট আলোচনা উত্থাপন করেন (Rahman, 1988-a) এবং তিনি বিষয়টির মীমাংসার জন্য এক যৌথ-জরিপ পরিচালনার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ বছরের মে মাসে বাংলাদেশ সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী দিল্লী সফরে গেলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দ্বীপটির মালিকানার বিতর্ক নিরসনে প্রেসিডেন্ট জিয়ার দেয়া প্রস্তাবানুসারে যৌথ জরিপের ব্যাপারে নিজ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের দিল্লীস্থ হাই কমিশনারের সাথে আরো কয়েকটি বৈঠকে ভারতিয় প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ সরকারকে বিতর্কিত দ্বীপটি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন (Rahman, 1988-a)। ১৯৮০ সালের আগেই ভারতিয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (B.S.F.)-র লোকজন দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং ভারতের মানচিত্রযুক্ত কংক্রিটের ফলক স্থাপন করে। ভারত সরকার এবং ভারতিয় সংবাদপত্রসমূহ ঐ সময়ে দ্বীপটিতে নিজ মালিকানা ও অধিকার নিয়ে বিপুল প্রচারণা চালায় এবং দেশ-বিদেশ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত বিভিন্ন মানচিত্রে ঐ বিতর্কিত ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে ভারতিয় সীমানাভুক্ত করে দেখাতে তৎপর হয় (T.T.Maps, 1989, West Bengal, ISBN-81 7053/017/2)। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ তৎকালীন অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির দরুণ দ্বীপটির সার্বভৌমত্ব নিয়ে বিশেষ কোন তৎপরতা চালাতে পারেনি।

১৯৮০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকা (মার্চ, 1980) বিতর্কিত দ্বীপটির সন্নিকটে অন্য একটি নতুন দ্বীপের অভ্যুদয়ের কথা প্রকাশ করে। ১৯৭৫ সালের ভারতিয় সরকারি নদীতাত্ত্বিক জরিপেও হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় দ্বিতীয় একটি দ্বীপের অস্তিত্বের কথা ধরা পড়ে এবং ঐ নতুন দ্বীপটিকে পশ্চিম বঙ্গ সরকার "পূর্বাশা দ্বীপ" বলে চিহ্নিত করেন (Gulati, 1988)। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ভূ-উপগ্রহ (Satellite) প্রেরিত দূর-অনুধাবন চিত্রেও ঐরূপ স্বল্প-মগ্ন নতুন জেগে-উঠা দ্বীপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় (SPARRSO, 1979)। ১৯৮০ সালের ৯ এপ্রিল ভারতের পররাষ্ট্র

www.pathagar.com

দফতর কর্তৃক বাংলাদেশের বিদেশ-বিভাগের কাছে পাঠানো নথিতেও হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনার কাছে বিতর্কিত দক্ষিণ-তালপট্টি-নিউমূর দ্বীপের সন্নিকটে দ্বিতীয় আর একটি ভাটাকালীন জেগে ওঠা নতুন পানিমগ্ন চড়ার কথা বিধৃত ছিল (Rahman, 1988-a)। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যে কোন কৌশলগত অসুবিধার কথা চিন্তা করে ভারতিয় কর্তৃপক্ষ ঐ নতুন জেগে ওঠা দ্বীপের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে বসেন এবং "নিউমূর" ও "পূর্বাশা"-কে একই দ্বীপ হিসাবে প্রচার করতে থাকে (White Paper on the South Talpatti, Govt. of Bangladesh, 1981)। একই সাথে ভারত নানা অজুহাতে দ্বীপটির বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক জরিপের ব্যাপার এড়িয়ে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে দক্ষিণ তালপট্টির মালিকানা ও সার্বভৌমত্বের দাবিতে শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৮০ সালের ২২ মে তারিখে ঢাকাসহ দেশের সব বড় বড় শহরে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হয় এবং ঢাকায় ভারতিয় হাইকমিশন কার্যালয়ের সামনে ভারত কর্তৃক দক্ষিণ তালপট্টি 'অবৈধ' দখল করার জন্য জোরালো প্রতিবাদ সমাবেশ ঘটানো হয় (Bangladesh Observer, 1980)। এসব পরিস্থিতির এক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করবে বলেও চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। কিন্তু ভারত দ্বীপটিতে স্বীয় দাবির প্রশ্নে অনড় থাকে এবং যৌথ-জরিপের প্রস্তাবসহ বাংলাদেশের সকল দাবি ও যুক্তিকে সরাসরি অস্বীকার করতে তৎপর হয় (Gulati, 1988)। অবশ্য ভারতের স্বল্পকালীন মুরারজী দেশাইর নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টির শাসনামলে (১৯৭৯ সালে) দু'দেশের মধ্যে কিছুটা সহনশীল আলোচনার পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং দ্বীপটির ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য পারস্পরিক তথ্য ও উপাত্ত বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় (Mitra, 1981)। কিন্তু ১৯৮০ সালে ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে পুনরায় পট পরিবর্তন ঘটে এবং রাজীব গান্ধীর সরকার (কংগ্রেস) দ্বীপটির ব্যাপারে বেশ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় আবারো অচলাবস্থা দেখা দেয়। ঐ সময় দু'দেশের মধ্যকার সমুদ্র-সীমানা নির্ধারণের জন্য 'পারস্পরিক সহনশীলতা ও সুপ্রতিবেশীসুলভ মনোভাব'সহ কাজ করে যাবার জন্য দু'দেশ একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে (Asian Recorder, 1981)।

১৯৮১ সালের প্রথমদিকে দ্বীপটির মালিকানার প্রশ্নে ভারত ও বাংলাদেশ প্রায় সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যায়। ঐ বছরের মে মাসে ভারত দ্বীপটিতে

www.pathagar.com

"সন্ধ্যায়ক" নামের একখানা জাহাজ প্রেরণ করে। বাংলাদেশ ভারতের ঐ একতরফা তৎপরতায় খুব ক্ষুব্ধ হয় এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ভারত স্বীয় তৎপরতাকে নিছক "জরিপ কাজ" বলে দাবি করলেও বাংলাদেশ বিতর্কিত ভূ-খণ্ডে ভারতের তৎপরতাকে 'অবৈধ সামরিক এবং উস্কানীমূলক' বলে অভিহিত করে (The Statesman, 1981)। বাংলাদেশ সাথে সাথেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ঘটনাস্থলে তিনটি ক্ষুদ্রাকার যুদ্ধ জাহাজ (Gun-boats) প্রেরণ করে এবং অবিলম্বে দক্ষিণ তালপট্টি থেকে সকল সৈন্য ও সরঞ্জামাদি প্রত্যাহার করে নেবার জন্য ভারতের প্রতি দাবি জানায়। ভারত বাংলাদেশের সকল দাবি-দাওয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবং বাংলাদেশের কথায় কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে দ্বীপটিতে এবং পার্শ্ববর্তী ভারতিয় ভূ-খণ্ডে শক্তিশালী নৌ ঘাঁটি স্থাপনে সচেষ্ট হয় এবং আজ পর্যন্ত দ্বীপটিতে পুরোপুরিভাবে নিজ দখল কায়েম রেখেছে। অপরদিকে বাংলাদেশ এখনো দ্বীপটির মালিকানার ব্যাপারে নিজ দাবি ত্যাগ করেনি। দক্ষিণ-তালপট্টির বাংলাদেশ-ভুক্তির ব্যাপারে এবং সেখানে দু'দেশের যৌথ-জরিপের প্রশ্নে অটল থেকে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করিয়ে বাংলাদেশ বিভিন্ন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ তালপট্টি/নিউমূর দ্বীপের মালিকানা নির্ধারণে ভারত ও বাংলাদেশের যুক্তি-পাল্টাযুক্তি

এ' নিবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিতর্কিত দ্বীপ দক্ষিণ তালপট্টি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যকার আন্তর্জাতিক সীমারেখার প্রায় মাঝামাঝি স্থানে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরের উত্তর প্রান্তের মহীসোপানে জেগে উঠেছে। দ্বীপটি দেশ দু'টির মধ্যকার রেডক্লিফ নির্ধারিত শেষ-সীমানা বিন্দু থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দক্ষিণে সাগরে অবস্থিত।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক জটিলতার জন্য ভারত-বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রাঞ্চল ও সংরক্ষিত অর্থনৈতিক এলাকা এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। তাই দুই প্রতিবেশী দেশের উভয়ই নতুন দ্বীপটিকে নিজ নিজ সীমানাভুক্ত বলে দাবি করে আসছে। ভারত ১৯৮২ সালের জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক-সমুদ্র আইন সংক্রান্ত সম্মেলনে (UNCLOS, 1982) '১২ নটিক্যাল মাইল' আঞ্চলিক সমুদ্র-সীমার নীতি মেনে নেবার ঘোষণা দেয়। (UNKOC-A/CONF/62/121, 21 Oct., 1982) । কিন্তু বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রথমে '১২ নটিক্যাল মাইল' আঞ্চলিক সীমার নীতি গ্রহণ করলেও পরে উপযুক্ত যুক্তিতে '১০-ফ্যাদম সমুদ্রতল সমোন্নতি রেখা'কে নিজ আঞ্চলিক সমুদ্র এলাকা (Territorial sea) বলে ঘোষণা করে। এই উভয় নীতিতেই বিতর্কিত নতুন দ্বীপটিকে ভারত এবং বাংলাদেশ–উভয় দেশই নিজ নিজ আঞ্চলিক সমুদ্র সীমাভুক্ত ভূমি বলে দাবি করতে পারে।

ভারত 'নিউমূর' দ্বীপে স্বীয় মালিকানা লাভের যুক্তি হিসাবে "মধ্যরেখা নীতি" (Median Line Principle))-র আশ্রয় নিয়েছে (Gulati, 1988)। এ' নীতি বিবাদমান দু'দেশের সংলগ্ন উপকূলের নিকটতম পানিভাগে দেশ দুটির মধ্যে সমদূরবর্তী স্থানের উপর দিয়ে একটি বিভাজন রেখা টেনে কোন বিতর্কিত ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণের প্রয়াশ পায়। "মধ্যরেখা" জ্যামিতিক পদ্ধতিতে প্রতিবেশী দু'টি দেশের মধ্যবর্তী স্থানকে ঠিক দু'ভাগে বিভক্ত করে (চিত্রঃ খ-১)। চিত্র ঃ খ-১ দ্বারা ভারত সরকারের আঞ্চলিক সমুদ্রাঞ্চল (Territorial sea) বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত 'মধ্যরেখা নীতি'-র ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। চিত্রটির গ-ঘ রেখা দ্বারা ভারত ও বাংলাদেশের বিতর্কিত দ্বীপ সংলগ্ন নিকটতম মূল দু'টি ভূ-খন্ডের ('গ' ভারতে এবং 'ঘ' বাংলাদেশের দুইটি বিন্দুকে যুক্ত করেছে। এখন ঐ দুইটি বিন্দু থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল ব্যাসার্ধের দু'টি বৃত্তচাপ দক্ষিনের সমুদ্রাভিমুখে স্থাপন করা হলে সেগুলো 'ক' ছেদ করে। মধ্যরেখা 'ক-খ' নির্ণয় করা হয়। এই জ্যামিতিক রেখার পশ্চিমে 'নিউমূর' দ্বীপের অবস্থান থাকার ফলে ভারত দ্বীপটির মালিকানা নির্ধারণে এই "মধ্যরেখা-ফর্মূলায়" অনড় রয়েছে। ভারত নিজ আঞ্চলিক সমুদ্র সীমা নির্ধারণী এই ফর্মূলাটি ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় নির্ধারণী নীতি হিসাবে ব্যবহার করেছে (Kadikara, 1942/Gulati, 1988)। বাংলাদেশের সাথে ভারতের অন্য সকল সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে 'রেডক্লিফ রোয়েদাদ' ও তার পরের নিষ্পত্তিকৃত বিরোধে ব্যবহৃত নীতির ভিত্তিতে। ঐসব বিরোধ নিষ্পত্তিতে সাধারণতঃ নদী-বিভাজিত সীমান্তে "নদীর মূল স্রোতধারার মধ্যরেখা" বা Mid-Channel/Thalweg-কে দু'দেশের মধ্যকার আন্তর্জাতিক সীমানা হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয় (Ahmed, 1958)। এই সীমানা নির্ধারক-নিষ্পত্তি নীতিকে "Mid-channel flow principle" বা 'Thalweg Doctrine'

www.pathagar.com

বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশ দক্ষিণ তালপট্টির মালিকানা নির্ধারণের প্রশ্নে ঐ একই সাধারণ নীতির বাস্তবায়নে গুরুত্ব প্রদান করে (Govt. White Paper On South Talpatti Island, 1981)। চিত্র ঃ খ-২ দ্বারা বাংলাদেশের প্রস্তাবিত 'নদীর মধ্য-স্রোতরেখা নীতি'র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের মতে, ভারতের দাবিকৃত 'মধ্য-রেখানীতি' (Median-Line Principle) কোন আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত আইন বা প্রতিষ্ঠিত কনভেনশন (Convention) নয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ১৯৫৯ সালের উত্তর-সাগরের (North-Sea) বিতর্কিত সমুদ্রাঞ্চলের মালিকানা প্রশ্নে পশ্চিম-জার্মানি (F.R.G.), নেদারল্যান্ডস্ ও ডেনমার্কের মধ্যকার আন্তর্জাতিক আদালতে নিষ্পত্তিকৃত মামলার রায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে যে, তখন ঐ "মধ্যরেখা নীতি"-কে আন্তর্জাতিক আদালত সমুদ্র আইনে বিরোধ মীমাংসার একটি "কৌশল" (Method) হিসাবে উল্লেখ করেছেন মাত্র (India Backgrounder, 1981)। সুতরাং ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার দক্ষিণ তালপট্টি/নিউমূর দ্বীপের মালিকানা নির্ধারণে উভয় দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও বহুল ব্যবহৃত 'নদী স্রোতের মধ্য-রেখা' (Mid-channel flow or Thalweg principle) ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি বা কৌশল কার্যকর হতে পারে না। বাংলাদেশ প্রস্তাবিত এই 'নদী স্রোতের মধ্যরেখা' নীতির বাস্তবায়নে বিতর্কিত দ্বীপটি বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হয় (চিত্রঃ খ)। কারণ, নদী–তাত্ত্বিক প্রভাবে হাড়িয়াভাঙ্গার মূল স্রোতধারা দ্বীপটির পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। যদি এই মধ্যস্রোত রেখাকে (যা' 'রেডক্লিফ লাইন' হিসাবে দু'দেশের মধ্যকার সীমানা চিহ্ন হিসাবে স্বীকৃত) সমুদ্রের দিকে নদীধারার স্বাভাবিক গতি অনুযায়ী প্রবর্ধিত করা হয় তবে ঐ বর্ধিত রেখাটি ('ক-খ রেখা') দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁক নিয়ে দ্বীপটির পশ্চিম দিক দিয়ে গভীর বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে যায় (The New York Times, 1980)। বাংলাদেশের এই প্রস্তাবের জবাবে ভারত "মুল স্রোতধারার মধ্য-রেখা-নীতিকে" বাদ দিয়ে "রেডক্লিফ রেখা"-র বর্তমানে স্বীকৃত মূল ভূ-খণ্ডস্থিত শেষ সীমারেখা বিন্দুকে 'একই দিক গতি'-তে সমুদ্রের দিকে প্রবর্তিত করে, (নদীর মুল ধারার মধ্যস্রোত-রেখা বরাবর নয়) বিতর্কিত দ্বীপটির মালিকানা নির্ধারণের প্রস্তাব করে যার ফলে এ' পদ্ধতির বাস্তবায়নে দক্ষিণ তালপট্টি ভারতের ভাগে পড়ে (চিত্র ঃ খ-২ এর 'ক–গ'-রেখা)।

www.pathagar.com

ভারতের এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে বলা হয় যে, যেহেতু দ্বীপটি ভারত-বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে অবস্থিত সেহেতু রেডক্লিফের "নদী-বিভাজন রেখার নীতি" এখানে প্রযোজ্য হতে পারে না। তাছাড়া, ভারতের মতে ঐ নীতিটিও কোন 'আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত আইন বা কনভেনশন নয় (Gulati, 1988)। এর ফলে দেশ দু'টির মধ্যে 'দ্বীপ-বিতর্ক'-টি আরো জটিল হয়ে দেখা দেয়। এরই মধ্যে বাংলাদেশ নিজ 'আঞ্চলিক সমুদ্র এলাকা' (Territorial Sea) ও 'আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমুদ্র এলাকা' (Exclusive Economic Zone) নির্ধারনে বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের (Abyssal Topography) এবং মহীসোপানের গভীরতাকে নিয়ামক হিসাবে বিচার করে সমুদ্রের ১০ ফ্যাদম (৬০ ফুট) গভীরতা বিশিষ্ট তলদেশ পর্যন্ত সমুদ্র এলাকাকে বাংলাদেশের 'আঞ্চলিক সমুদ্রাঞ্চল' (Territorial Sea) বলে ঘোষণা করে এর বাইরে দক্ষিণে ২০০ মাইলের অর্থনৈতিক অঞ্চল (E.E.Z.) নির্ধারণ করে (Franda, 1982)। বাংলাদেশের '১০-ফ্যাদম সমুদ্রতল রেখা' দ্বারা দাবিকৃত আঞ্চলিক সমুদ্রাঞ্চল দেশের উপকূল থেকে প্রায় ২৫ থেকে ৪৫ কিঃ মিটার দূরবর্তী (দক্ষিণ বরাবর) মহীসোপান পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র-এলাকাকে আওতাভুক্ত করে। বাংলাদেশের দাবিকৃত এ' আঞ্চলিক সমুদ্র-এলাকা নির্ধারণী নীতির সমর্থনে কোন আন্তর্জাতিক আইন বা কনভেনশন না থাকলেও দেশটির প্রতিকূল "ফানেলাকৃতি বিশিষ্ট উপকূল" (Funnel-shaped coast-line)-এর বিরূপ প্রাকৃতিক ও ভূ-রূপতাত্ত্বিক পরিস্থিতি এবং ক্ষুদ্র আয়তনে বিপুল জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক-সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদির বিবেচনায় আন্তর্জাতিক আইনের মানবিক ন্যায়পরতা (Equity)-র নীতির ভিত্তিতে এই দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয় (Rahman, 1988/a)।

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের মালিকানায় বাংলাদেশের দাবির যৌক্তিকতা

দক্ষিণ তালপট্টি/নিউমূর দ্বীপ বিতর্কের শুরু থেকে নিয়ে বাংলাদেশ বিতর্কিত দ্বীপটিতে নিজ অধিকার প্রশ্নে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমান উপস্থাপন করে আসছে এবং সব সময়ই এসব যুক্তির বাস্তবতা ও যথার্থতা পরীক্ষার জন্য বিবাদমান দেশ দু'টির বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত একটি যৌথ জরিপের প্রস্তাবনাও উপস্থাপন করে আসছে।

www.pathagar.com

দক্ষিণ তালপট্টির বাংলাদেশ-সীমানাভুক্তির পক্ষে প্রধান যুক্তি হিসাবে প্রথমতঃ বলা যায় যে, ভারত-বাংলাদেশ সীমানা নির্ধারণে অতীতে সব সময়ই রেডক্লিফ রোয়েদাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "মূল নদী ধারার মধ্যস্রোত" "(Mid-channel flow or Thalweg principle)"-নীতির যে ব্যবহার হয়েছে–সেই একই নীতির প্রয়োগ দ্বারা বর্তমান 'দ্বীপ-বিতর্ক'টিরও নিষ্পত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত। এই সীমানা-নির্ধারণী পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে দেখা যায় যে, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার স্থানীয় সীমানা-বিভাজক হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মূল স্রোতধারার মধ্যরেখা (Thalweg) সুস্পষ্টভাবে দক্ষিণ তালপট্টির পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। হাড়িয়াভাঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ-তালপট্টি দ্বীপের নদীতাত্ত্বিক ও ভূ-রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সহজেই এই সত্যাটি উদঘাটিত হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ঐ উপকূলীয় সমুদ্রাঞ্চলের ভূ-উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিতর্কিত দ্বীপটি ডুবন্ত চড়া (Submerged shoals)-র দ্বারা উত্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের তালপট্টি নামক মূল ভূ-খণ্ডের সাথে যুক্ত হতে চলেছে। দ্বীপটির পশ্চিম দিক দিয়ে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মূল স্রোতধারা (যা' ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারক চিহ্ন) প্রবাহিত হওয়ার ফলে বিতর্কিত দ্বীপটির ভারতিয় ভূ-খণ্ডের সাথে যুক্ত হবার সম্ভাবনা মোটেই নেই। এর ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই দ্বীপটি বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হবার দাবি রাখে।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ ১০ ফ্যাদম সমুদ্রতল সমোন্নতি রেখাকে (10 Fathom Abyssal Contour) 'দেশের আঞ্চলিক সমুদ্র' বা 'Territorial Sea' ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সমুদ্র-আইনের মানবিক ন্যায়পরায়নতার (Principle of equity) আলোকে বাংলাদেশের মত প্রতিকূল উপকূলরেখা সম্বলিত একটি রাষ্ট্রের জন্য এরকম ভূ-রূপতাত্ত্বিক (Geomorphological) অবস্থার বিচারে আঞ্চলিক সমুদ্র ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমুদ্র (E.E.Z.) দাবি করার যৌক্তিকতাকে স্বীকার করা হয়েছে (Continental Shelf Convention, LOS Convention, 1982 and Rahman, 1990)। এই ন্যায়পরতা আইনের ভিত্তিতে দক্ষিণ তালপট্টি বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্র এলাকাভুক্ত একটি দ্বীপ হিসাবে চিহ্নিত হবার দাবি

www.pathagar.com

রাখে। যদি ভারত দ্বীপটিকে নিজ সীমানাভুক্ত করে নিতে সক্ষম হয় (মধ্য-রেখা নীতি বা Median-Line Principle-এর ভিত্তিতে) তবে এই দ্বীপের অবস্থানের ভিত্তিতেই দু'দেশের আঞ্চলিক সমুদ্র (Territorial Sea) ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক এলাকা (E.E.Z.) এর সীমানা চিহ্নিতকরণ অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের প্রায় ২৫,০০০/৩০,০০০ বর্গ কিঃ মিটার আঞ্চলিক সমুদ্র পরিসর এবং প্রায় ১০০,০০০ বর্গ কিঃ মিটার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমুদ্র এলাকা থেকে বঞ্চিত হবে। বাংলাদেশের মত বিপুল জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত এবং প্রাকৃতিক ভূ-সম্পদের দিক দিয়ে বঞ্চিত একটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশের জন্য এহেন সম্ভাবনাময় বিরাট সমুদ্রাঞ্চল হারানো আত্মহত্যারই শামিল।

চতুর্থতঃ বিতর্কিত দ্বীপটি গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার উপকূলীয় অঞ্চলের একটি নবীন ভূ-খণ্ড। ঐ অঞ্চলে এখনো ব-দ্বীপ-ভূমির ভূ-গঠন প্রক্রিয়া (Land accretion) পুরোদমে চলছে (Bagchi, 1944, Pramanik, 1983 and Rob, 1989)। বিতর্কিত দ্বীপটি এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার নদীতাত্ত্বিক ও ভূ-রূপতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ থেকে ধারণা করা যায় যে, গাঙ্গেয় দ্বীপের মূল ভূ-ভাগ অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটিকে গ্রাস করে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, অতীতে ব-দ্বীপটির দক্ষিণ প্রান্ত বঙ্গীয় উপত্যকা (Bengal Basin)-র বর্তমান উপকূল-রেখা থেকে আরও অনেক উত্তরে অবস্থিত ছিল এবং ক্রমে উপকূলীয় অগভীর সমুদ্রে বিপুল পরিমাণে নদী অবক্ষেপনের ফলে ব-দ্বীপের দক্ষিণাভিমুখী ভূ-গঠন প্রক্রিয়ার দ্বারা ভূ-ভাগ বর্তমান অবস্থানে উপনীত হয় (Chowdhury, 1959)। এমতাবস্থায় "রেডক্লিফ সীমানা নির্ধারণ নীতি"-র আওতায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বিতর্কিত দ্বীপটি বাংলাদেশের আঞ্চলিক সীমানাভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, তখন দ্বীপটি সমুদ্রাঞ্চলে না থেকে মূল ভূ-খণ্ডভুক্ত একটি এলাকার অংশে পরিণত হবে।

এসব যুক্তির বাস্তবতার আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ তালপট্টি/নিউমূর দ্বীপের মালিকানার প্রশ্নে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের দাবি অত্যন্ত জোরালো এবং বাস্তব সম্মত। এব্যাপারে ভারতের উপস্থাপিত একমাত্র যুক্তি 'মধ্যরেখা নীতি' (Median-Line Principle) অত্যন্ত একপেশে এবং চাপিয়ে দেয়া বলে অনুমেয়।

www.pathagar.com

উপসংহার

ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সুপ্রতিবেশীসুলভ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দক্ষিণ তালপট্টির মত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। আবার এই ছোট্ট দ্বীপটির মালিকানার সাথে জড়িত রয়েছে বাংলাদেশের মত গরিব অথচ ক্ষুদ্রায়তনের বিরাট জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত একটি দেশের বিপুল অর্থনৈতিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন এবং এরই সাথে নির্ভর করছে এদেশের বঙ্গোপসাগরের অঢেল সম্পদ-সমৃদ্ধ সমুদ্রাঞ্চলের বিরাট পানিসীমানার উপর স্বীয় সার্বভৌমত্বের দাবি প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতার যথার্থতা।

ভারত বাংলাদেশের নিকটতম প্রধান প্রতিবেশী রাষ্ট্র। দেশ দু'টির জনগণের মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বন্ধন। তাছাড়া একই ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান হেতু দেশ দু'টির মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে অবিভাজ্য সম্পৃক্ততা। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দু'টি দেশ ভারত এবং বাংলাদেশ নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই পরস্পরের মধ্যে বিরাজমান বর্তমান সকল বিরোধ-বিসম্বাদ যদি সুপ্রতিবেশীসুলভ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবের বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করনে তবে তা' হবে উভয় রাষ্ট্রের জন্যই কল্যানকর এবং বাস্তবধর্মী।

দক্ষিণ তালপট্টি / নিউমূর দ্বীপের মালিকানা-বিতর্কের সমাধান যদি দ্বীপটির ভূ-প্রাকৃতিক পরিস্থিতির বিভিন্ন বাস্তবতার আলোকে নিষ্পত্তি না হয় তবে তা' অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনের মানবিক ন্যায়পরতা (Equity) নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে হতে পারে।

ভারত ও বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রই জাতিসংঘের দু'টি সদস্য এবং কমনওয়েলথভুক্ত দুই দেশ। রাষ্ট্র দু'টির কোন একটি পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিতর্কিত বিষয়ে একতরফা ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বিতর্কিত দ্বীপটির মালিকানা প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহনের আগে অবশ্যই দেশ দু'টিকে যৌথভাবে বিতর্কিত এলাকার (সমুদ্রাঞ্চলে) জরিপ-কার্য পরিচালনা করে তার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এবং দ্বি-পাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরাজমান সমস্যার সমাধানে পৌছতে হবে। এ ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রকেই প্রয়োজনে জাতিসংঘ (U.N.O) বা কমনওয়েলথের আইন-সংক্রান্ত বিভাগসমূহের সহযোগিতা বা সালিশীর সাহায্য গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে। তাছাড়া, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যকার আঞ্চলিক সমুদ্র-সীমার চিহ্নিতকরণের কাজ এখনো সম্পন্ন হয় নাই। যদি দেশ দু'টির মধ্যকার সমুদ্রাঞ্চলের সীমানা নির্ধারণী সুসম্পন্ন হয় তবে সহজেই বিতর্কিত দ্বীপটির মালিকানা-সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটবে। তাই দক্ষিণ তালপট্টি/নিউমূর দ্বীপের মালিকানা সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তির আগে দেশ দু'টির মধ্যকার সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

www.pathagar.com

রচনাপঞ্জি ঃ

Ahmed, N., 1958, *'Indo-Pakistan Boundary Disputes'*, Oriental Geographer, Vol. 2, P. 31, Dhaka.

Bagchi, K., 1944, *The Ganges Delta, Calcutta University* Press, PP. 3-61, Calcutta.

Chowdhury, M.I., 1959, *The Morphological Analysis of the Bengal Basin*, Vol. I and II, M.Sc. Thesis (Un-Published), University of Cambridge, P. 525, Cambridge.

Franda, M., 1982, Bangladesh : *The First Decade*, South Asian Publishers, P. 132, Delhi.

Gangal, S.C. 1982, *'A Tiny Island of Big Discord'*, Amrit Bazar Patrika, January 8, Calcutta.

Gulati, C.J., 1988, Bangladesh : *Liberation to Fundamentalism*, Commonwealth Publishers, P. 260, New Delhi.

Islam, M.A., 1978, *'The Ganges-Brahmaputra River Delta'*, Journal of the University of Sheffield Geological Society, Vol. 7.3 PP. 116-120, Sheffield.

Kodikara, S.U., 1982, *Foreign Policy of Srilanka : A Third World Perspective*, Chanakya, P. 31, Delhi.

Mallik, T.K., 1976, *'Shelf Sediments of the Ganges delta with Special Emphasis on the Mineralogy of the Western Part, Bay of Bengal'*, Marine Geology, Vol. 22, No.1, PP. 1-30, Amsterdam.

Miah, M.M., *Resources of the Bay of Bengal*, (Un-Published Report), B.I.D.S., P. 130, Dhaka.

Mitra, S., 1981, *'New Moore Island : Territorial Tug of War'*, India Today (June 1-15), Delhi.

Pramanik, M.A.H., 1983, *Remote Sensing Applications to Coastal Morphological Investigations in Bangladesh*, (Un-Published Ph. D. Thesis), Jahangir Nagar University, PP. 89-89, Dhaka.

www.pathagar.com

Rob, M.A., 1989, *Fluvial Morphology of the Ganges Delta*, (Un-Published M. Phil. Thesis), Aligarh Muslim University, P. 126, Aligarh.

Rahman, M.H., 1987, *'Whose is South Talpatty Island?'*, Asian Profile, Vol. 15, No. 5, (Oct.), PP. 437-444, Hongkong.

Rahman, M.H., 1988-a, *'Practice of UNCLOS between Developing Countries with reference to the conflict over the South Talpatti Island'*, Land and Politics in Africa Asia and Latin America, 21 Jahrgang-2, Quartal 1988, PP. 210-220, Baden Baden.

Rahman, M.H., 1988-b, *'The Maritime. Jurisdiction : Where is the End?'*, South Asian Studies, Vol. 5, No. 1 (January), Lahore.

Sinha, P.B., 1977, *'Indo-Bangladesh Maritime Boundary Dispute'*, Strategic Analysis, Vol. 1, No. 4, P.7, New Delhi.

সহায়ক সংবাদপত্র রিপোর্ট ও মানচিত্র ঃ

Asian Recorder, 1981 (October, 15-21), *'New Moore Island Dispute with Bangladesh'*, 27(42), PP. 16270, 16269, Delhi.

Bangladesh Observer, 1980 (23 May), *'Protest Rally against Indian Occupation of South Talpatti Island'*, (Staff Report), P.1, Dhaka.

Far Eastern Economic Review, 1980 (2 May), *'Indo-Bangladesh Dispute over the ownership of Tiny Island'*, P. 38, Hong Kong.

Govt. of Bangladesh, 1974, *'Territorial Waters and Maritime Zones Act*, 1974 (Act No. XXVI), Declaration of April, 13, (No. LT-I/3/74), Dhaka.

Govt. of Bangladesh, 1981, *'White Paper on the South Talpatty'*, Ministry of Foreign Affairs, Dhaka.

India Backgrounder, 1981 (10 Aug.), *'Indo-Bangladesh Relations'*, P. 260, Delhi.

www.pathagar.com

LANDSAT/SPARROSO, 1988, *'Satellite Image of the Coastal Area : Sundarbans* (R. & P., 138/045), Mohakash Gobeshana Kendra, Dhaka.

London Financial Times, 1981 (19 May), *'Indo-Bangladesh Island Dispute'*, P.4, London.

New York Times, 1980 (24 July), New York.

Statesman, 1981 1981 (30 May), Delhi,

Topographic Map, Bakarganj, Khulna and 24 Parganas Districts', No. 79-G, (Scale 1 : 253, 440), 2nd edn.

T-T Maps (Survey of India), 1989, *'Map of West Bengal'*, ISBN 81 7053 0172, (Discover India Series, scale 1 : 100,000), TT. Maps & Pubs. Ltd., Madras.

UNCLOS (U.N.O), 1982, 'UNDOC-A/Conf/ 62/121, 21 Oct.', New York. ❑

www.pathagar.com

৫

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি

ভূমিকা

সম্পদ-সম্ভাবনা আর সমূহ সমস্যায় সমাকীর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌম ভৌগোলিক এলাকা বিস্তৃত পার্বত্য-চট্টগ্রাম দেশের সবচেয়ে হালকা জনসংখ্যা অধ্যুষিত অথচ বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল। দেশের তিনটি পার্বত্য প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত এ অঞ্চলটির বেশির ভাগ ভূমিই বনভূমির অন্তর্ভুক্ত এবং এই অঞ্চলটির জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠই নানা মঙ্গোলীয় অভিবাসী বসতি স্থাপনকারিদের অন্তর্গত। উচুঁ-নিচু পাহাড়-পর্বত, পার্বত্য নদ-নদী, উর্বর উপত্যকা আর দুর্গম ঘন চিরহরিৎ বনভূমি অঞ্চলটিকে দান করেছে এক অনন্য বৈচিত্র্যময়তা।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে, দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাংশে আর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে প্রায় ২১°২৫ থেকে ২৩°৪০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৫৫ থেকে ৯২°৪৫ পূর্ব-দ্রাঘিমাংশ ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের পর্বতসংকুল এলাকাজুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা "Chittagong Hill Tracts"-এর অবস্থান। বাংলাদেশের প্রশাসনিক তিনটি জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন-এর মোট ১৩,১৪৮ বর্গ কি.মি. বা ৫,০৮৯ বর্গমাইল এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত (B.B.S. 1991)[১নং মানচিত্র]।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত বিভিন্ন জাতিসত্তার অসম উপস্থিতি আর বর্তমান বিশ্বের দুই উদীয়মান পরাশক্তি চীন ও ভারতের বিশেষ কাছাকাছি এলাকাটির অবস্থান এবং অঞ্চলটি থেকে অনায়াসে বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত মহাসাগরের উন্মুক্ত নীল জলভাগে প্রবেশের সুবিধার সম্ভাব্যতা পার্বত্য-চট্টগ্রামকে বিশ্ব ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে করে তুলেছে বিশেষ গুরুত্ববহ। অন্যদিকে, অঞ্চলটির বিপুল ভূমি–সম্পদ, অপরিমেয় আর প্রায় অব্যবহৃত পানিসম্পদ, মুল্যবান বনজ সম্পদ এবং সম্ভাবনাময় অনাবিষ্কৃত কিংবা

www.pathagar.com

অনাহরিত খনিজ সম্পদ, জনভারাক্রান্ত আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ ক্ষুদ্রায়তন বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে এক অপরিহার্য মহামূল্যবান অঙ্গে পরিণত করেছে। একজন সুস্থ সবল মানুষের দেহে যেমন তার একটি হাত বা একটি পা অত্যন্ত মুল্যবান অপরিহার্য অংশ তেমনি একটি শক্তিশালী সমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রয়োজনীয়তার স্বার্থ জড়িত। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশি জাতির জন্য ভবিষ্যত সম্পদ সম্ভাবনার এক অপরিমেয় এবং অফুরন্ত ভাণ্ডার; সম্ভাবনার প্রতিশ্রুত প্রান্তর বা "Land of Promise" (Ahmed and Rizvi, 1951)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আয়তনের বিশালতায় বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক-দশমাংশ হলেও জনসংখ্যার হিসাবে ঐ অঞ্চলে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ লোক বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জনসংখ্যার ৫০% মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং বাকি প্রায় ৫০% বাংলাভাষাভাষী বসতি স্থাপনকারি সমতলভূমির জনগণ। পাহাড়ি জাতিভুক্ত মোট জনসংখ্যা আবার ধর্ম, ভাষা ও জাতিতাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রায় এক ডজন উপজাতিতে বিভক্ত, যাদের পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং আচরণিক দিক দিয়ে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি প্রখর।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় লোকদের মধ্যে পূর্ব থেকে সঞ্চিত অসন্তোষ আরও বেশি করে ধূমায়িত হতে থাকে এবং ১৯৭৫ সালের পর তা প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে (Montoo, 1981)। অচিরেই এই আন্দোলন সশস্ত্র যুদ্ধে রূপ নেয় এবং বিশ্বের অন্যান্য নানা স্বার্থান্বেষী শক্তির হস্তক্ষেপের প্রভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতীয় তরুণদের তৎপরতা বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌম ভৌগোলিক এলাকার অস্তিত্বকে এক প্রচণ্ড হুমকির মুখে নিক্ষেপ করে (Hossain,1990 and Alam & Akhter, 1990)। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ গুরুত্ববহ ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবং অঞ্চলটির অফুরন্ত সম্পদ সম্ভাবনার নিরিখে বাংলাদেশসহ অন্যান্য অঞ্চলসংলগ্ন শক্তিসমূহের কাছে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বহুমুখী জটিল সমস্যা সমাধানের সামরিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক কোন প্রচেষ্টাই এখন পর্যন্ত কোন দৃশ্যমান সুফল বয়ে আনতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়নি। সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য সকল তৎপরতা এখনো চলছে। কিন্তু সমস্যাটি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করে বর্তমানে একটি আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে মোড় নিচ্ছে বলে প্রতিভাত হচ্ছে (Shelley, 1992)। ১৯৯৮ সনের প্রারম্ভে বাংলাদেশের আওয়ামী সরকার ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তি বাহিনীর মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তিও ঐ অঞ্চলে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে পারবে কিনা-তা' এখনো সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল

বাংলাদেশের বৃহত্তম পাহাড়ি এবং বনাবৃত অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত তিনটি প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত। বৃটিশ রাজত্বকালে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন সরকারের ২২তম প্রশাসনিক এ্যাক্ট বলে বৃহত্তম চট্টগ্রাম জেলাকে বিভক্ত করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নামে একটি আলাদা প্রশাসনিক জেলা গঠন করা হয় (Shelley, 1992)। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটিমাত্র বৃহত্তম জেলা ছিল যা ১৯৮৩ সালে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি-এই তিনটি প্রশাসনিক পার্বত্য জেলায় বিভক্ত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য প্রদেশ ও মায়ানমার পশ্চিম সীমান্তের সাথে ভৌগোলিকভাবে যুক্ত। অঞ্চলটির পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য (সাবেক লুসাই হিলস্ অঞ্চল), দক্ষিণে মায়ানমারের (বার্মার) আরাকান রাজ্য, উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত (Amin, 1988/89)।

ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এলাকাটি ফেনী, কর্ণফুলী, সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী এবং এদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপ-নদী, শাখা-নদীর উপত্যকায় সুস্পষ্ট চার ভাগে বিভক্ত করেছে। এসব উপত্যকার মধ্যে চেঙ্গী উপত্যকা (Changi Valley), কাসালং উপত্যকা (Maini Valley), রাইনখিয়াং উপত্যকা, সাঙ্গু উপত্যকা উল্লেখযোগ্য। এসব উপত্যকাগুলো ৩০ থেকে নিয়ে ৭০/৮০ কি.মি. দীর্ঘ এবং গড়ে ২-৩ কি. মি. থেকে ৮/১০ কি. মি. প্রশস্ত হয়ে থাকে। চেঙ্গী ভেলী বা মহালছড়ি উপত্যকা প্রায় ৮০ কি. মি. দীর্ঘ এবং গড়ে প্রায় ৬.৫ কি. মি. প্রশস্তবিশিষ্ট একটি উর্বর ঢালু সমভূমি। পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐসব উপত্যকার

www.pathagar.com

সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত দীর্ঘ এবং মাঝারি উচ্চতার কয়েক সারি পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকশ' মিটার থেকে নিয়ে ১,০০০ মিটারের চেয়েও বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বত শ্রেণী দেখা যায় (যেমন, মওডক মুয়াল-এর উচ্চতা ১,০০৪ মিটার)। দুটি পবর্তমালার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ উপত্যকাকে কোন কোন স্থানে ২০/৩০ কি. মি. পর্যন্ত প্রশস্ত হতে দেখা যায়। এই অঞ্চলের পর্বতমালাকে লোয়ার ইয়োসিন যুগের টারশিয়ারীকালের বেলে পাথরে গঠিত আরাকান-ইয়োমা ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বলে ধারণা করা হয় (Rizvi, 1952 and Ahmad & Rizvi, 1951)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নদীগুলোও নদী অববাহিকা উপত্যকাসমূহের মত পরস্পর সমান্তরাল থেকে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিতভাবে সুবিন্যস্ত। বেলে পাথর ছাড়াও ঐসব পর্বতমালার শিলা গঠনে কালো শিলা, শেল, কংগ্লোমারেট এবং কোন কোন স্থানে চুনাপাথরের অস্তিত্ব দেখা যায় (Wadia, 1953)।

কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, ফেনী প্রভৃতি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান নদ-নদী। ঐসব নদ-নদীর বেশির ভাগই স্থানীয় পর্বতমালার মধ্যবর্তী অববাহিকা-উপত্যকাগুলোর মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পশ্চিমে মোড় ঘুরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলী, ফেনী ও মাতামুহুরী পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলকে চট্টগ্রামের সমতল এবং বঙ্গোপসাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। এসব নদ-নদী এবং এগুলোর উপনদীসমূহের অববাহিকা ২-৩ কি. মি. থেকে নিয়ে ৮/১০ কি. মি. পর্যন্ত প্রশস্ত। অত্যন্ত উর্বর এসব অববাহিকা কৃষিকাজ, বিশেষ করে ফলমূল এবং শাক-সব্জির (Horticulture) চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অববাহিকাগুলোর কোন কোনটি ৩০/৪০ কি.মি. থেকে নিয়ে ৭০/৮০ কি. মি. কিংবা তার চেয়েও বেশি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হওয়ায় এসব দীর্ঘ এবং প্রশস্ত অববাহিকায় অনেক বর্ধিষ্ণু লোকালয়, শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, চন্দ্রঘোনা এমনি অববাহিকার কোলে গড়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য শহর। অত্যন্ত খরস্রোতা এবং গভীর অববাহিকায় প্রবাহিত ঐসব নদ-নদী জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী (Johnson and Ahmed, 1957)। কর্ণফুলী নদীতে একই উদ্দেশ্যে বাঁধ দিয়ে একটি প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদ (Lake) তৈরি করা হয়। কাপ্তাই নামক স্থানে ১৯৫৭ সালে কাজ শুরু করে ১৯৬৩ সালে

www.pathagar.com

ঐ জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয় এবং এর ফলে সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদের আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ৪০০ বর্গ কি. মি. বা ২৫৬ বর্গমাইল (Khisha, 1966)। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশের চেঙ্গী ভেলী, মাইনি ভেলী এবং কাসালং ভেলী দীর্ঘ ও প্রশস্ত অববাহিকা, পূর্বাংশের সাজেক ভেলী এবং দক্ষিণাংশের সাঙ্গু ভেলী, রেইংখিয়াং ভেলী ও মাতামুহুরী ভেলী তুলনামূলকভাবে গভীর এবং অপ্রশস্ত অববাহিকা। উত্তরাংশের পর্বতগুলোর তুলনায় দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পর্বতমালাসমূহ বেশি খাড়া।

জলবায়ুগত দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল চিরহরিৎ উদ্ভিজ্জ মণ্ডলীর উষ্ণতা প্রধান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত পার্বত্য-চট্টগ্রামের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৫০ সে. মি. (Rashid, 1991)। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত টোঙ্গা ও তিয়াম্বাং (কক্সবাজারের পূর্বাঞ্চলে)-এ প্রায় ৫০০ সে. মি, মধ্যাংশের নাইখ্যংছড়িতে ২৯৫ সে. মি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লামা বাজারে ৩০০ সে.মি মাইনিমুখ-এ ২৫৯ সে.মি. কাপ্তাই-এ ২৮২ সে. মি. এবং রাঙ্গামাটিতে ২৫৭ সে. মি.। পার্বত্য চট্টগ্রামের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল এবং গড় গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস। এখানে শীত ঋতু থাকে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। শীতকালে গড় তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস। তবে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ৪০°/৪২° সেঃ এবং শীতকালে সর্বনিম্ন ৪°/৫° সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠা-নামা করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মৃত্তিকা "অশ্রেণীভূক্ত পাহাড়ি মৃত্তিকা" (Unclassified Hill Soils) হিসাবে চিহ্নিত (Hutchinson, 1909 and Rashid, 1991)। বেলে পাথর, নুড়িপাথর, শেল এবং কাদা পাথর চূর্ন-বিচূর্ণ হয়ে চর্ণিত উপাদানের সাথে উদ্ভিজ্জ উপাদান যুক্ত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মৃত্তিকা গঠিত হয়। পাহাড়ের ঢালে এবং উচ্চ অসমান স্থানে মৃত্তিকা কম উর্বর এবং গভীরতাও কম, বর্ণ হালকা। পক্ষান্তরে, সমতলে এবং অববাহিকার নিম্ন এলাকায় বেশি গভীরতা সম্পন্ন গাঢ় বর্ণের উর্বর মৃত্তিকা দেখা যায়। বনাঞ্চলেও জৈব উপাদান সমৃদ্ধ গাঢ় বর্ণের মৃত্তিকা দেখা যায়। সাম্প্রতিককালের ফরেস্টাল রিপোর্ট অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের মৃত্তিকাকে ধর্ম ও গুণানুসারে সাতভাগে ভাগ করা যায় (Forestal Report-1966)। এসব মৃত্তিকার মধ্যে কাদা-দো আঁশ, বেলে দো আঁশ, বেলে পলি কাদা (Clay Loam , Sandy Loam and

www.pathagar.com

Silty Clay) উল্লেখযোগ্য। পার্বত চট্টগ্রামের মোট মৃত্তিকা পরিসরের ৬৭% ভাগই পলিকাদা দো-আঁশ শ্রেনীভুক্ত মৃত্তিকা। এখানকার বেশির ভাগ মৃত্তিকাই বড়দানা বিশিষ্ট মাঝারি উর্বরতা সম্পন্ন এবং কম পানি ধারনে সক্ষম। নদী অববাহিকাগুলোর মৃত্তিকার উর্বরতা খুবই বেশি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ভূমির অর্ধেকের চেয়েও বেশি অংশ বনাচ্ছাদিত পাহাড়ি অঞ্চল। এখানকার এসব বনভূমি এবং অন্যান্য অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ চিরসবুজ পর্ণমোচি বৃক্ষ এবং ঘন ঝোঁপ-ঝাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে মোট ১,০২৬ বর্গ কি. মি. এবং দক্ষিণাংশে মোট ৫১২ কি. মি. সংরক্ষিত ঘন বনভূমি রয়েছে। বাকি বনাঞ্চলের প্রায় ৫,৪০০ বর্গ কি. মি. এলাকা অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত। এসব বনাঞ্চলে সেগুন, তূন, তেলসুর, গর্জন, জারুল, গামার, কড়ই, চাপালিশ, বাঁশ, বেত ইত্যাদি মূল্যবান বৃক্ষ এবং উদ্ভিজ্জ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সেগুন, মেহগনি, রাবার, চা ইত্যাদির বাগান এখানে সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে সর্বমোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৭,০৪৬ বর্গ কি. মি. (Rashid, 1991)। এসব বনভূমি থেকে আহরিত কাঠ এবং অন্যান্য মূল্যবান বনজ সম্পদ থেকে দেশ প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার রাজস্ব লাভ করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজসম্পদভুক্ত কাঠ এবং বাঁশের উপর নির্ভর করে এখানে গড়ে উঠেছে কয়েকটি পাল্পউড, রেয়ন এবং কাগজ শিল্প। চন্দ্রঘোনার বিশালায়তন পেপার মিলটির মূল কাঁচামাল বাঁশ সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল থেকে। বনাঞ্চলের সমৃদ্ধি বন্যপ্রাণী যেমন-হাতী, বাঘ, বানর, বনগরু (গয়াল) ইত্যাদি এবং নানা প্রজাতির দুষ্প্রাপ্য পাখ-পাখালি বাংলাদেশের অমূল্য জাতীয় সম্পদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা তত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনসংখ্যা, নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস এবং জাতিতাত্ত্বিক বিভিন্নতার মধ্যেই ঐ এলাকাটির বর্তমান অশান্তি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদিতার কারণ নিহিত রয়েছে। পাবর্ত্য চট্টগ্রামই বাংলাদেশের একমাত্র অঞ্চল, যেখানকার মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অবাঙালি এবং অমুসলিম। অঞ্চলটি মূলতঃ একটি মিশ্র জনগোষ্ঠী–অধ্যুষিত বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, নানা ভাষাভাষী এবং নানা

www.pathagar.com

ধর্মাবলম্বী বহু সংস্কৃতিবিশিষ্ট জনসংখ্যার একটি এলাকা। নৃতাত্ত্বিক এবং জাতিতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে একথা এখন সুস্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারি কোন জনগোষ্ঠীই এখানকার কোন আদিবাসি (Aborigins) বা ভূমিপুত্রের (Son of the soil) দাবিদার হতে পারে না (Lewin, 1869; Khisha, 1964, Bernot, 1960, and Ahmed, 1990)। এসব গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনগোষ্ঠীই আগে বা পরে পার্শ্ববর্তী অথবা একটু দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল বা সমতল ভূমি থেকে দেশান্তরি হয়ে ঐ অঞ্চলে আশ্রয় নেয় এবং নিবাস গড়ে তোলে। শত শত বছর পাশাপাশি অবস্থান করলেও এসব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বহুলাংশে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে এদের মধ্যে কোন কোন উপজাতীয় জনগোষ্ঠী, তুলনামূলকভাবে বড় এবং প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর কিছু কিছু গ্রহণ করে নিয়েছে। যেমন, চাকমারা শক্তিশালী বাঙালিদের ভাষা এবং খাদ্যাভ্যাস এবং টিপরা (ত্রিপুরা) হিন্দুধর্ম এবং লুসাই ও বোমরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। তথাপি এসব প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীই তাদের সাংস্কৃতিক বিষয়াদির অনেক ক্ষেত্রেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের অনেক অংশই বজায় রেখে চলেছে।

জনসংখ্যা তত্ত্ব

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মধ্যে একটি বিশেষ বৈচিত্র্যের দাবিদার, সেখানকার জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টন হালকা এবং অনিয়মিত। বর্তমানে এখানে মাত্র ১০ লক্ষের মত লোক বসবাস করে। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল, ৯,৬৭,৪২০ এবং জনসংখ্যা বণ্টনের গড় ঘনত্ব প্রতিবর্গ কি. মিটারে ১৯০ জন (P.R.P.C.,1991)। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের গড় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি.-এ প্রায় ৮০০ জন। বন্ধুর পার্বত্য ভূমিরূপ, ঘন সংরক্ষিত অরণ্যাচ্ছাদিত পরিসর এবং প্রতিকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঐ এলাকাটিকে এত কম জন-অধ্যুষিত রাখতে সাহায্য করেছে। ভারতিয় উপমহাদেশে বৃটিশদের আগমন থেকে নিয়ে বৃটিশ রাজত্বের মধ্যভাগ পর্যন্ত (১৭৬২-১৮৯২) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল ছিল। ১৭৬০ সালে ঐ অঞ্চলের আনুমানিক জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১,০৭,০০০-এ।

www.pathagar.com

উচ্চমৃত্যুহার এবং অভিগমন আইনের কড়াকড়ি এখানকার ঐ সময়ের জনসংখ্যার এই স্থবিরতার জন্য দায়ী (Shelley, 1992)। বর্তমান শতকের প্রথমভাগ থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।

১৯৬১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৮৫,০০০। ১৯৭৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫,০৮,০০০। ১৯৮১ সালে দাঁড়ায় ৭.০৮,৪৫৬ জনে এবং ১৯৯১ সালে এর সাথে যুক্ত হয় আরও ৩ লক্ষ। নীচের সারণী থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বণ্টন চিত্র দেখা যায়ঃ

সারণী-১ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বণ্টন চিত্র

সন	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১
মোট জনসংখ্যা	২,৯০,০০০	৩,৮৫,০০০	৫,০৮,০০০	৭,০৮,৪৫২	৯,৬৭,৪২০
প্রতি বর্গ কি. মি-এ ঘনত্ব	৫৭জন	৭৫জন	১০০জন	১৪৭জন	১৯০জন

Source: *(Statistical year book of Bangladesh, 1982 and (ii) Preliminary Report of Populaton Census, B. B.S, 1991)*

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ মোট ৪,৯৮,৫৯৫ (১৯৯১) জন অবাঙালি বা উপজাতীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মায়ানমার বা ব্রহ্মদেশ থেকে আগত চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের ভাষা স্থানীয় এবং চাটগাইয়া বাংলাভাষার মিশ্ররূপ। মারমা জনগোষ্ঠী আরাকান থেকে আগত মগ উপজাতিভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। ভাষা, আচরণ ও জীবনাচরণের দিক দিয়ে এরা চাকমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এদের ভাষা আরাকানী বর্মী উপভাষা (Ahmed, 1990 P-63)। টিপরা বা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃতীয় প্রধান উপজাতি। চাকমা এবং মারমারা (মগ) ধর্মের দিক দিয়ে বৌদ্ধ হলেও ত্রিপুরারা কিন্তু প্রায় সবাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ২,৩৯,৪১৭ জন চাকমা; ১,৪২,৩৩৪ জন মারমা এবং ৬১,১২৯ জন টিপরা উপজাতির লোক বাস করে। তাছাড়া ঐ সময়ের আদমশুমারীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট ২২,০৪১ জন মুরং, ১৯,২২১জন তনচংঙ্গ্যা, ৭,০০০ জন ব্যোম এবং ৩,২২৭ জন পাংখো উপজাতির জনসংখ্যা রয়েছে বলে দেখা যায়। নিচের সারণীতে ১৯৯১-এর আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যার বণ্টন ও শতকরা অংশ দেখানো হলোঃ

www.pathagar.com

সারণী-২ ঃ ১৯৯১ সনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার বণ্টন ও হার

জনগোষ্ঠীর নাম	মোট জনসংখ্যা☆☆	শতকরা হার(%)
বাঙালি☆	(প্রায়) ৫,০০,০০০	৫০
চাকমা	(,,) ২,৪০,০০০	২৪
মারমা	(,,) ১,৪৩,০০০	১৪
টিপরা (ত্রিপুরা)	(,,) ৬১,০০০	৬
মুরং	(,,) ২২,০০	২.২
তনচংঙ্গ্যা (ত্যগনাক)	(,,) ১৯,০০	১.৯
ব্যোম	(,,) ৭,০০০	০.৭
পাংখো	(,,) ৪,৫০০	০.৩৫
চাক	(,,) ২,০০০	০.২০
খ্যাং	(,,) ২,০০০	০.২০
খুমী	(,,) ১,২০০	০.১২
লুসাই	(,,) ৬৬২	-
ম্রো (কুকি)	(,,) ৫০০০/৮০০০ (?)	(?)

Source: *PRPC, 1991 (B.B.S)।*

☆ পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালি জনসংখ্যার ২০% অস্থায়ী জনসংখ্যা।

☆☆ পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৯৯১ সালের জনসংখ্যার সরলীকৃত অংক।

২নং ছক থেকে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বাঙালি এবং বাকি অর্ধেক বিভিন্ন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতীয় শ্রেণীভুক্ত। এখানকার বাঙালিদের সিংহভাগই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কালে জিয়াউর রহমান ও হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে অভিবাসিত হয়। পক্ষান্তরে, পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি জাতি বহির্ভূত অন্য সকল উপজাতীয় গোষ্ঠীই এখানে তুলনামূলকভাবে নতুন বসতি স্থাপনকারি। এখানকার আদিম জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ম্রো, খ্যাং, পাংখো এবং কুকিরা মূল "কুকি" উপজাতির ধারাভুক্ত। ধারণা করা হয়, এরা প্রায় ২শ' থেকে ৫শ' বছর আগে এখানে স্থানান্তরিত হয়ে আগমন করে। চাকমারা আজ থেকে মাত্র দেড়শ' থেকে ৩০০

www.pathagar.com

বছর পূর্বে মোঘল শাসনামলের শেষ থেকে ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথম দিকে মায়ানমার আরাকান অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে (Lewin, 1869)। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এবং বৃটিশ প্রশাসক টি, এইচ, লেউইন এর মতে, "A greater portion of the hill tribes at present living in the Chittagong Hill Tracts undoubtedly come about two generations ago from Aracan, This is asserted both by their own traditions and by records in Chittagong Collectorate" (Lewin, 1869, p-28)। পার্বত্য অঞ্চলের মারমা বা মগ জনগোষ্ঠী ১৭৮৪ সালে এ অঞ্চলে দলে দলে অনুপ্রবেশ করে এবং আধিপত্য বিস্তার করে (Shelley, 1992 and Lewin, 1869)। এরা ধর্মে বৌদ্ধ মতাবলম্বী। এরা তিনটি ধারায় বিভক্ত যেমনঃ জুমিয়া, রোয়াং ও রাজবংশী মারমা।

ব্যোমরা মায়ানমার চিন পর্বত থেকে নিয়ে তাশন পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন করে। খ্রিস্টান মিশনারি তৎপরতার ফলে এদের অধিকাংশই বর্তমানে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। লুসাইরাও এখন অধিকাংশই খ্রিস্টান। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য একটি বড় জনগোষ্ঠী মুরং। এদের বেশির ভাগই এখন পর্যন্ত প্রকৃতি পূজারী এবং এদের কোন ধর্মগ্রন্থও নেই (Bernot, 1960)। চাকমারা এখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও ভাষার দিক দিয়ে তারা ত্রিপুরা, মারমা বা অন্য যে কোন পার্বত্য জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এদের ভাষা এখন অনেকটা বাংলাভাষার কাছাকাছি। মারমা (মগ) গণ আরাকানী বর্মী উপভাষায় কথা বলে এবং ত্রিপুরাগণ ত্রিপুরি তিব্বতিধর্মী উপভাষায় কথা বলে। বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের ধর্ম প্রচারের জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত-সংলগ্ন মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরার বেশিরভাগ উপজাতীয় জনগোষ্ঠী খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যত ঐ অঞ্চলে ঐসব বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠিকে খ্রিস্ট-ধর্মের ছত্র-ছায়ায় একত্রিত করে বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে ভারত-বাংলাদেশের এই পার্বত্য ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপুর্ণ উত্তর-পুর্বাংশে যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য শক্তি ইসরাইলের মত একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনায়ই নয় বরং অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখেও দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐসব মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল এবং বিস্তর অনৈক্য বর্তমান। এদের এক একটি জনগোষ্ঠীর বিবাহরীতি, আত্মিয়তা সম্পর্ক (Keenship Relations), সম্পত্তির মালিকানা বণ্টনরীতি এবং উত্তরাধিকার প্রথা, জন্ম এবং মৃত্যুর সামাজিক ও ধর্মীয় কৃত্যাদি বা অন্যান্য সামাজিক প্রথা এবং রীতি এক এক ধরনের এবং প্রায় প্রত্যেকটি থেকে প্রত্যেকটি আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত (Denise and Bernot, 1957)। পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব জনগোষ্ঠীগুলোর প্রায় সবাই যুদ্ধবিগ্রহ এবং হিংস্র দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে তাদের পুরাতন বসতিস্থান থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে। নতুবা, এক জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীর পশ্চাদ্ধাবন করে আক্রমণকারি হিসাবে এদেশে প্রবেশ করেছে (Hutchinson, 1909, Bernot, 1960 and Risley, 1991)। বর্তমানেও এদের পরস্পরের মধ্যে প্রচুর রেষারেষি এবং দ্বন্দ্ব বর্তমান রয়েছে বলে জানা যায় (Belal, 1992)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের জনসংখ্যার বণ্টন চিত্রও সমান নয়। এরা গোষ্ঠী ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে সারা পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে। তবে কোন কোন স্থানে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মিশ্র জনসংখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়। চাকমারা প্রধানতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের চাকমা সার্কেলে কর্ণফুলী অববাহিকা এবং রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বাস করে। মগরা (মারমা) পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের বোমাং এবং মং সার্কেলে বাস করে। ত্রিপুরা (টিপরা) গণ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সার্কেলে, চাকমা সার্কেল, বোমা সার্কেল এবং মং সার্কেল সকল স্থানেই ছড়িয়ে থাকলেও নিজেরা দল বেঁধে থাকে। ম্রো, খ্যাং, খুমী এবং মুরং, বোমাং সার্কেলের বাসিন্দা। বাংলাভাষী বাঙালি অভিবাসীরা সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেও এদের বেশির ভাগই দলবদ্ধভাবে রা ঙ্গামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রামগড় প্রভৃতি শহরাঞ্চলে বসবাস করে। বাকি বাঙালি জনসংখ্যা এখানকার উর্বর উপত্যকাগুলোর সমভূমিতে গুচ্ছগ্রামে বসবাস করে থাকে।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ সম্ভাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যত সম্পদ সম্ভাবনার এক অপরিমেয় এবং বিপুল ভাণ্ডার বা "সম্ভাবনার প্রতিশ্রুত প্রান্তর" (Land of Promise)। বিপুল ভূমি-সম্পদ (Land Resources), অপরিমেয় আর প্রায় অব্যবহৃত পানি সম্পদ, মূল্যবান বনজ সম্পদ এবং সম্ভাবনাময় অনাবিষ্কৃত কিংবা অনাহরিত (Un-explored) খনিজ সম্পদ বাংলাদেশের এই জনবিরল পার্বত্য অঞ্চলটিকে দেশের ১২ কোটি মানুষের জন্য করে তুলেছে এক অপরিহার্য ও মহামূল্যবান দেহাঙ্গাস্বরূপ। প্রায় ১৩,০০০ বর্গ কি. মি. আয়তনের এই বিপুল এলাকার প্রতি বর্গ কি. মি. অঞ্চলে বর্তমানে মাত্র ১৯০ জন লোক বসবাস করে। পক্ষান্তরে এর অতি কাছের অন্যান্য সমতল জেলাগুলোর প্রতি বর্গ কি. মি. এলাকায় অবিশ্বাস্য এক ঘনত্বে গড়ে প্রায় ৮০০ জন লোক বাস করে। ক্ষুদ্রায়তন বাংলাদেশের এই বিপুল জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হারের ভবিষ্যত পরিসর সংকুলানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের কম বসতির উপত্যকা আর অববাহিকাগুলো অন্যতম ভবিষ্যত সমাধান হিসাবে জাতির কাছে বিবেচ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩য় অনুচ্ছেদের ৩৬ এবং ৪২ ধারায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেশের ১২ কোটি মানুষের যে কোন জনকে বাংলাদেশের সার্বভৌম এলাকার যে কোন স্থানে যাতায়াত, বসতিস্থাপন, জমি খরিদ বা সম্পত্তি গড়ে তোলার মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) প্রদান করেছে (....."every citizen shall have the right to move freely throughout Bangladesh, to reside and settle in and place therein and to leave and re-enter Bangladesh" (36/3)" ..... every citizen shall have the right to acquire, hold, transfer or otherwise dispose of property..... "(Ministry of Law and Justice (42/3) G.O.B. 1986)। বাংলাদেশের সংবিধানের এই ধারা দু'টির দ্বারা বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সম্পদসহ যে কোন সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ , ব্যবহার বাণিজ্য এবং বিনিময়ের আইনানুগ অধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে যে কোন বাংলাদেশির জন্য নিশ্চিত হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও অতীতে বিশেষ করে বৃটিশ এবং

www.pathagar.com

পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে উঠে নাই। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দুর্গম পার্বত্য ভূমিরূপ, জনসংখ্যার অপ্রতুলতা আর তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর ঔদাসিন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করেছে (Rob, 1990)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বিশেষ করে বিগত '৮০ এবং চলতি '৯০-এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তুমুল উন্নয়নের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। পাহাড়-পর্বত আর গভীর উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুর্গম এলাকাগুলো যুক্ত হয়েছে শত শত মাইল বাঁধানো সড়ক পথ আর উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। স্থানে স্থানে গড়ে উঠেছে বৃহৎ এবং মাঝারি কলকারখানা। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কাগজ কল, একমাত্র রেয়ন মিল এবং বৃহত্তম ও একমাত্র জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এই অঞ্চলেই অবস্থিত। প্রতিবছর ঐসব শিল্প স্থাপনায় নতুন নতুন ইউনিট যুক্ত হয়ে এগুলোকে ক্ষমতায় এবং কলেবরে করে তুলছে এশিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠানে। এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকগুলো কলেজ, হাইস্কুল, এবং অসংখ্য প্রাইমারি স্কুল, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইনস্টিটিউট, হাসপাতাল এবং অন্যান্য উন্নয়ন ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যেই স্থানীয় উপজাতীয়দের বিশেষ করে চাকমাদের মধ্যে শতকরা শিক্ষিত জনসংখ্যার হার বাংলাদেশের গড় জাতীয় শিক্ষিত হারের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। যেমনঃ বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষিত জনসংখ্যা প্রায় ৩৫%, অথচ চাকমাদের শিক্ষিতের হার প্রায় ৭২%। অবশ্য স্থানীয় বাংলাভাষী বিপুল অশিক্ষিত লোকসংখ্যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোর মোট গড় স্বাক্ষরতা অনেক কমে গিয়ে ১৯৯১ আদমশুমারী অনুযায়ী মাত্র ২৫%-এ ঠেকেছে। এসব তৎপরতা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতি এখন পর্যন্ত ভূমিনির্ভর বা কৃষিভিত্তিক (Roy, 1992 and Shelley, 1992)। স্থানীয় উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৫% ভাগ বর্তমানে আদিম "ঝুম" নামক স্থানান্তরি কৃষিব্যবস্থা (Shifting Cultivation)-এর মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে থাকে (Rob, 1989)। জলবিদ্যুৎ, বনজ সম্পদ আহরণ, মৎস্য এবং কিছু শিল্প স্থাপনা থেকে দেশ প্রতিবছর পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা থেকে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব আয় করে থাকলেও এখন পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের বিপুল সম্ভাব্য সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। নীচে সংক্ষেপে পার্বত্য চট্টগ্রামের নানা ধরনের সম্পদ সম্ভাবনার দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলঃ

www.pathagar.com

ভূমি সম্পদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার বর্তমান মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩২ লাখ ৬০ হাজার একর (৩২,৫৯,৬২০ একর)। এই ভূমির শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই প্রকৃতির দখলে অর্থাৎ বনাবৃত (অবশ্য বর্তমানে প্রকৃত গভীর বনভূমির আওতায় মোট ভূমির মাত্র ৫০% এরও কম জমি রয়েছে)।

দেশ ও বিদেশের কোন কোন মহল এবং ব্যক্তি নানা যুক্তি-তর্ক এবং পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চান যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির পরিমাণ এত বেশি থাকলেও ব্যবহারোপযোগী ভূমি–সম্পদের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল (Roy, 1992 and Forestal Reoprt, 1964)। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, পার্বত্য, বন্ধুর এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট ঐ অঞ্চলের ভূমির উপযোগমান এবং ধারণ ক্ষমতা খুবই কম (Least carrying capacity of the land)। তাঁরা যে ভুলটি প্রথমেই করেছেন তা' হচ্ছে, অসমর্থিত এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে প্রায় তিন দশক আগে সংগৃহীত জরিপের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভুল পরিসংখ্যানকে তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের উপাত্ত হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন।

বর্তমান নিবন্ধের লেখকের নিজস্ব 'রিকনেসেন্স' জরিপের ভিত্তিতে এবং সংগৃহীত বিমানচিত্র ও ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চেঙ্গী ভেলী, সাঙ্গুভেলী, মাতামুহুরী ভেলী, মাইনী ভেলী এবং কাসালং ভেলী প্রভৃতি দীর্ঘ এবং যথেষ্ট প্রশস্ত উপত্যকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান মোট জনসংখ্যার (১০লক্ষ) প্রায় পাঁচ গুণ বেশি ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার স্থান সংকুলান এবং সুষ্ঠু জীবিকার সংস্থান হতে পারে। তাছাড়া উর্বর এবং যথেষ্ট জৈবসার মিশ্রিত পার্বত্য ঢালে ফিলিপাইন, জাভা কিংবা হাওয়াইর মত "ধাপ বা Terrace" কেটে ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল পার্বত্য বৃষ্টি ব্যবস্থার মতো লাগসই পদ্ধতির চাষাবাদ করে এবং হর্টিকালচার (Horticulture) বা ফলমূলের চাষ এবং বাগান চর্চার (Plantation) মতো উপযুক্ত বিকল্প অর্থনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে অনায়াসেই পার্বত্য-চট্টগ্রামের বিপুল অসুবিধাজনক পার্বত্য বন্ধুর ভূমিরূপকে অনুকূল এবং কয়েকগুণ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত ভূমিতে পরিবর্তন করা সম্ভব। এ গেল কৃষি অর্থনীতির কথা। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, বান্দরবন কিংবা প্রলম্বিত দীর্ঘ উপত্যকাগুলোর বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলা যেতে পারে অনেকসংখ্যক ছোট এবং মাঝারি "শিল্প-নগরী" (Industrial townships) বা পর্যটন উপশহর (Tourism-suburbs)-এর মতো সেটেলাইট টাউন (Satellite town)। কুটিরশিল্প, গার্মেন্টিস শিল্প,

www.pathagar.com

ফলমূল বা খাদ্যদ্রব্য (যেমন-জ্যাম, জেলী, সিরাপ ইত্যাদি) প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এখানে নানা ধরনের রাসায়নিক বা নির্মাণ-ধর্মী মাঝারি স্কেলের শিল্পায়নের মাধ্যমে এখানে পরিকল্পিত নগরায়ন স্বার্থক করে যুক্তিসঙ্গতভাবেই আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেনেভা, বৈরুত বা হংকং-এর মতো উন্নত নগরী এবং সমৃদ্ধ উৎপাদনমুখী ঘন লোকালয়ে পরিণত করতে পারি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমানে ব্যবহৃত ত্রুটিপূর্ণ যেসব ভূমি ব্যবহার জরিপ রিপোর্ট বা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় (ফরেস্টাল রিপোর্টসহ, Forestal Report, 1966) সেগুলোর উপস্থাপিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ সালে সেখানে বনভূমি ছাড়া মোট আবাদি জমি বা Total Cropped Area-র পরিমান প্রায় ২,৪৪,৩৮০ একর ছিল বলে দেখতে পাই। ঐ সময় নিট কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ছিল ১,৫৮,৩৪০ একর এবং সাময়িকভাবে অব্যবহৃত বা ব্যবহার উপযোগী পতিত মোট ভূমির পরিমাণ ছিল প্রায় আরো ৩০,০০০ একর। কাপ্তাই হ্রদের জলাধারে নিমজ্জিত মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৬০,০০০ একর যা মৎস্য চাষ বা জলজ ফসল চাষে (Acqua Culture) ব্যবহৃত হতে পারে। এভাবে দেখা যায় যে, বনাঞ্চল ও পার্বত্যাঞ্চলের প্রতিকুল ভূমি ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নত, মধ্যম এবং নিম্নমানের (A' 'B' 'C' and 'D' Categories) প্রায় ৫ লাখ একর কৃষিযোগ্য ভূমি এখনই প্রস্তুত রয়েছে। ঐসব জমিতে বর্তমানে মান্ধ্যাতার আমলের কৃষি পদ্ধতিতে ধান এবং অন্য ফসলের চাষাবাদ হয়ে থাকে। উন্নত প্রযুক্তির কৃষি কাজের মাধ্যমে অত্যন্ত উর্বর ঐ ৫ লাখ একর জমিতে কৃষি কাজ করে বর্তমানে উৎপাদিত ফসলের ১০ গুণ কিংবা তারও বেশি পরিমাণ "বিকল্প ফসল"-এর উৎপাদন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোটেই অসম্ভব নয়। এর ফলে অতি সহজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির সাধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে। আইনজীবী চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় নিতান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার যুক্তিকে দাঁড় করাতে গিয়ে যে নিবন্ধ রচনা করেছেন, তাতে উপাত্তগত শক্তি এবং বিজ্ঞানগত যথেষ্ট সমর্থন না থাকার ফলে বিশ্লেষণটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার আসল চিত্রটি প্রতিভাত হতে পারেনি (Roy, 1992)। নীচে বিশ্বের কয়েকটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের বর্তমান ভূমি ব্যবহার চিত্রের সাথে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামাঞ্চলের ভূমির পরিমাণের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির সম্ভাব্য ধারণ ক্ষমতা এবং ভূমি–সম্পদ চিত্রের একটি ধারণা পেতে পারি।

www.pathagar.com

সারণী-৩ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের তুলনামূলক ভূ-পরিস্থিতি

দেশ	মোট এলাকা (বর্গ কি. মি)	জনসংখ্যা	কৃষি ভূমি%	অকৃষি ভূমি%
লেবানন	১০,৪৫২	৩০,০০,০০০	৩০	৭০
সাইপ্রাস	৯,২৫১	৭,৫০,০০০	৩২	৬৮
ইসরাইল	২০,৭০০	৪৬,০০,০০০	১৮	৮২
পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৩,১৮১	১০,০০,০০০	৫	৯৫
সিঙ্গাপুর	৩৬০	৩০,০০,০০০	২০	৮০

Source: *১. Gordon (1980), ২. Marksides (1977), ৩. Frankel (1980), ৪. Encyclopedia Britanical (1983), ৬ Shelley (1992).*

বিশ্বের প্রায় পৌনে দু'শ' ছোট বড় স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধ শতাধিক রাষ্ট্রের আয়তন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন অপেক্ষা কম। বিশ্বের অন্ততঃ ২৫/২৬ টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের আয়তন এবং ভূমি-সম্পদের অবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ও ভূমি-সম্পদের অবস্থার চাইতেও দুর্বল। তবুও ঐসব দেশ অতি সহজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশি জনসংখ্যা ধারণ করে আর্থনীতিক উন্নয়নের সূচকে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রের তালিকায় নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলছে (Gordon, 1980 and Marksides, 1977)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের লেবানন, ইসরাইল কিংবা কুয়েত, কাতার এবং ভূ-মধ্যসাগরের সাইপ্রাস পৃথিবীর ক্ষুদ্র অথচ সমৃদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত। লেবানন, সাইপ্রাস, কিংবা ইসরাইল তৈলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রও নয়। লেবাননের আয়তন পার্বত্য চট্টগ্রামের চাইতে অনেক কম এবং লেবানন পার্বত্য চট্টগ্রামের মত এত সুজলা, সুফলাও নয়। দেশটি একটি আধা শুষ্ক পার্বত্য ভূমি। এদেশের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সমতল কৃষিযোগ্য ভূমি বেকা উপত্যকা (Becaa Valley) পার্বত্য চট্টগ্রামের চেঙ্গী, সাঙ্গু, কাসালং, সাজেক কিংবা মাতামুহুরী যে কোন একটি উপত্যকার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। তবু এই অনুর্বর আর পাহাড়ি রাষ্ট্র লেবানন বর্তমান প্রায় ৩০/৩৫ লক্ষ লোকসংখ্যাকে অত্যন্ত অনায়াসেই ধারণ করতে পেরেছে। উন্নত প্রযুক্তি আর পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে রুক্ষ, বিরান প্যালেস্টাইনের মরুময় আর পাহাড়ি ভূমিতে গড়ে উঠেছে ৪৫/৫০ লক্ষ জনসংখ্যা সমৃদ্ধ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী আর সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ইসরাইল

www.pathagar.com

(Brawer, 1988)। তাছাড়া প্রায় প্রাকৃতিক সম্পদশূন্য সাবেক ফরমোজা দ্বীপের ছোট্ট পরিধিতে গড়ে উঠেছে এশিয়ার অন্যতম নব্য অর্থশক্তি তাইওয়ান। ঠিক এমনি ক্ষুদ্রায়তন প্রাকৃতিক সম্পদহীন সিঙ্গাপুর এবং হংকংও ধারণ করতে পেরেছে বিপুল জনসংখ্যাকে। পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পায়ন, নগরায়ন আর সমস্ত জনসংখ্যার সুশৃঙ্খল নিরলস কর্মতৎপরতা ঐসব প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে দুর্বল ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রগুলোকে এমনি উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে। সমুদ্রবন্দর থেকে মাত্র ৪০/৫০ মাইল বা ৭০/৮০ কি. মি. দূরে অবস্থিত বাংলাদেশের সুজলা সুফলা পার্বত্য চট্টগ্রামও একই পথে সমৃদ্ধির চরম উৎকর্ষতা লাভ করে সহজেই বর্তমান জনসংখ্যার পাচঁ গুণ কিংবা তার চাইতেও কয়েকগুণ বেশি জনসংখ্যা ধারণ করতে পারে (Rob, 1990)। হিসাব করে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অপেক্ষাকৃত নীচু পার্বত্যসমূহের গাত্রে বৈজ্ঞানিক পন্থায় ধাপ কেটে (Terracing) কৃষি ভূমি তৈরি করলে ভূমির 'ত্রিমাত্রিক" (Three-Dimensional Use) ব্যবহারজনিত কারণে এখানকার মোট সম্ভাব্য ভূমিব্যবহার কমপক্ষে প্রায় আরো ৫০০,০০০ একর নতুন জায়গায় পরিব্যাপ্ত হতে পারে (Rob,1990)। এভাবে আমরা দেখি যে, উপযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক পন্থার ভূমি ব্যবহার পদ্ধতির প্রচলন হলে পর্বত এলাকার মোট জমির পরিমাণ সমতল ভূমি থেকে প্রায় দেড়গুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। টেরেসিং-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পন্থার প্রচলনের সাহায্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনায়াসেই কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ আরো দুই থেকে তিনগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে যে সকল উপত্যকা বা নদী অববাহিকা রয়েছে তার দৈর্ঘ্য বরাবর দু'পার্শ্বের নীচু উর্বরা সমতল এবং মৃদু ঢাল বিশিষ্ট ভূমির মোট পরিমাণ ২,৫০,০০০ একর থেকে ৩,০০,০০০ একরের মধ্যে। শুধুমাত্র এই বিপুল পরিমাণ উর্বর সমতল ১ম শ্রেণীর কৃষিভূমিতে উন্নত বৈজ্ঞানিক পন্থায় চাষাবাদ করলে "বর্তমানের কৃষি প্রগাঢ়তা (Cropping Intensity) আরো বৃদ্ধি পেতে পারে এবং মোট ফলন বা উৎপাদন (Yield) কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহার, কৃষি উৎপাদন বা ভূমির ধারণক্ষমতা সম্পর্কে যেসব নেতিবাচক বা হতাশ চিত্র আমরা দেখতে পাই তা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে বিবেচ্য। তাছাড়া কোন কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূর্ণ রিপোর্টে এখানকার ভূমি ব্যবহারের যে মনগড়া

www.pathagar.com

পরিসংখ্যান যেমন, পাহাড়ি জমি ১,২৫,০০০ একর, মিশ্র জমি, ১,০০,০০০ একর, ধানী জমি ৬২,৫০০ একর ইত্যাদি দেখানো হয়েছে তা আদৌ বাস্তব সম্মত নয় বা সত্যও নয়। মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন পর্যন্ত কোন সার্বিক এবং পূর্ণাঙ্গ ভূমি ব্যবহার জরিপই (Land Use Survey) সম্পাদিত হয়নি (Rob, 1990, and Rob,1989)। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহারচিত্র বর্তমানে যদিও ১৯৬৬ সালে সম্পাদিত "The Forestal Report 1966"-এর সাথে মোটেও মিল খাবে না, তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বর্তমানে এখানকার বেশির ভাগ জমিই কৃষি কাজের অনুপযুক্ত পাহাড়ি এবং বনাবৃত ভূমি। যে কোন ব্যবহারের জন্যই নতুন ভূমি যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামে বের করতে হয় তবে অবশ্যই এর সিংহভাগই পাহাড়ি এবং মিশ্র বন বিভাগের আওতাধীন ভূমি থেকে গ্রহণ করতে হবে। নীচে ১৯৬৫-৬৬ সালে ভূমি-প্রশাসন রিপোর্ট (পূর্ব-পাকিস্তান) অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহার চিত্রের পরিসংখ্যান দেখানো হলঃ

সারণী-৪ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহার চিত্র (একরে) ১৯৬৬ ঃ

ধরন	পরিমাণ (একক)
১। বনাচ্ছাদিত ভূমি	২৯,০২,৭৩৯
২। কৃষির অনুপযোগী ভূমি	২,৭০,৯৮১
৩। কৃষির উপযুক্ত পতিত ভূমি	৪৫,০০০
৪। কৃষিভুক্ত ফসলী ভূমি	১,৩০,০০০
৫। সাময়িক (বর্তমান) পতিত ভূমি	১,০৮,০০০
৬। বহু ফসলী জমি (নীচু)	৯৩,০০২
৭। মোট চাষভুক্ত ভূমি	২,২৩,০০২
৮। সর্বমোট জমির পরিমাণ	৩২,৫৯,৫২০

Source: *Chittagong Hill Tracts District Gazetteer, 1974, p. 125,*

কৃষি সম্পদ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার বেশির ভাগই কৃষি-নির্ভর তৎপরতার সাথে জড়িত। আজ থেকে প্রায় পৌণে দু'শ বছর আগে ১৮১৮ সালে তৎকালীন

www.pathagar.com

চাকমা রাজা সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে হাল-চাষের প্রচলন করেন (Khan and Khisha, 1970)। তার আগে ঐ অঞ্চলে 'ঝুম' পদ্ধতিই (Shifting Cultivation) একমাত্র কৃষি হিসাবে চালু ছিল। 'ঝুম' পদ্ধতির আদিম কৃষিতে পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল সাফ করে পুড়িয়ে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত পদ্ধতিতে একইসাথে নানা ফসলের চাষ করা হয়ে থাকে। সময়ের পরিক্রমণে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশই ঝুম চাষের সাথে জড়িত। ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, বর্তমানে প্রায় ১৫,০০০ পার্বত্য পরিবার প্রায় ২৪,৩০০ হেক্টর পার্বত্য ভূমিতে ঝুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে (Rob, 1989)। উপরন্তু বর্তমানে ঝুম চাষকে ঐসব পাহাড়ি পরিবারের বেশির ভাগ অংশই তাদের সহজীবিকা হিসাবে (Subsidiary Economic Activity) গ্রহণ করেছে।

১৮৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র ৫০ হেক্টর উপত্যকা-ভূমিতে হালচাষ (লাঙ্গল-বলদ চালিত) করা হত এবং এর মাত্র তিন যুগ পর ১৯০০ সালে হালচাষের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৫০ হেক্টরে (Hutchinson, 1909)। এভাবে ক্রমে অত্র এলাকার সমতল উপত্যকায় হালচাষ কৃষির প্রচলন বাড়তে থাকে এবং অনিবার্য কারণে প্রাচীন স্থানীয় পদ্ধতির 'ঝুম' চাষ হ্রাস পেতে থাকে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ক্রমাগত 'ঝুম' চাষের ফলে পার্বত্য ভূমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং সাম্প্রতিক সরকারসমূহের আইনগত নিষেধাজ্ঞা স্থানীয় প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। স্থানীয় কৃষি রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, ১৯০০ সালে 'ঝুম' পদ্ধতির চাষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি হেক্টরে প্রায় ৭৫০ কি. গ্রাম শস্য উৎপাদন হত। কিন্তু বর্তমানে ঝুমের ফলন প্রতি হেক্টরে ২৪০ কি. গ্রামে নেমে এসেছে (Khan and Khisha, 1970)। ঠিক একইভাবে দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালে যেখানে মাত্র ৪০,৫০০ হেক্টর জমিতে হালচাষ হত সেখানে বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১,০০,০০০ হেক্টরে পরিণত হয়েছে। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হলে এর জন্য সৃষ্ট বিশাল কৃত্রিম হ্রদের পানিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে উর্বর প্রায় ২০,০০০ হেক্টর কৃষি-ভূমি তলিয়ে যায়। ফলে এখানকার প্রায় ১০,০০০ পরিবার কৃষি-নির্ভর মানুষ তাদের মূল্যবান কৃষি জমিসহ বাড়িঘর সবকিছু হারায়। একইসাথে আরও প্রায় ৮০০০ ঝুমিয়া পরিবারও স্থানচ্যুত হয়। স্থানচ্যুত কৃষকদের উল্লেখযোগ্য

www.pathagar.com

অংশ বাংলাভাষী প্রারম্ভিক হালচাষ ছিল। এসব ক্ষতিগ্রস্ত কাসালং রিজার্ভ ফরেস্টে উপযুক্ত ভূমি সাফ করে পুনর্বাসিত করা হলেও এক উল্লেখযোগ্য স্থানচ্যুত ও ঝুমিয়া পরিবার তেমন কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি (Shelley, 1992) এবং এর মধ্যেই নিহিত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমানের অশান্তির একটি অন্যতম কারণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল 'A' (o to 0. 5 per cent slope), 'B'(২০% Slope) এবং C (40% Slope) মানের ভূমিকে কোন না কোন ধরনের কৃষি কাজের আওতাভুক্ত করা যায়। 'A' শ্রেণীভুক্ত উপত্যকা ভূমির পরিমাণ খুবই কম হলেও ঐসব জমিতে খুব ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং এখানে কৃষির প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি করা যায়। 'B' শ্রেনীর উঁচু-নিচু ভূমির ঢালে ভাল ঝুম পদ্ধতির চাষ এবং সবজি ও ফলমূলের চাষ করা যায়। এখানে খুব ভাল তুলা, ভুট্টা এবং কাকরল, কুমড়া, পেঁপে, কলা, মিষ্টি আলু, কচু, আদা, হলুদ ইত্যাদির চাষ করা যায়। 'C' শ্রেণীভুক্ত পাহাড়ি জমি অধিক উঁচু ও ঢাল বেশি খাঁড়া হওয়ার ফলে এসব জমিতে ধাপ বা টেরেসিং (Terracing)- এর মাধ্যমে গম, ভুট্টা, ধান এবং অন্যান্য সজি বা মসলার চাষ হতে পারে। এসব জমিতে খুব ভাল ফলমূলের বাগান করা যায় (Horticulture)। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর পরিমাণে আনারস, কলা, কমলা, কাঁঠাল উৎপন্ন হয়ে থাকে। উত্তরাঞ্চলের সাজেক ভ্যালীর কমলা এবং আনারসের উৎপাদন এবং মান বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানকে হার মানিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জমিতে ভাল কাজু বাদামের চাষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব ফলমূলের চাষ বাড়িয়ে এখানে অনেকগুলো ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (Fruit Processing Plants) স্থাপন করে সহজেই স্থানীয় অনেক লোকের জীবিকার এবং একই সাথে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় অনুকূল প্রভাব ফেলা যেতে পারে। হিসাব করে দেখা যায় যে, এখানকার ঐসব পাহাড়ি ঢালু জমিতে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় কৃষিকাজ ও ভূমি ব্যবহার চালু করে যে পরিমাণ উৎপাদন বা ফলন পাওয়া যেতে পারে তা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বাসিন্দাকে খাইয়ে-পরিয়ে বিপুল অংশের ফসল দেশের সমতলের ঘনবসতিপূর্ণ জেলাগুলোতেও সরবরাহ করা যেতে পারে। তবে একইসাথে মনে রাখতে হবে, কৃষির বিনিময়ে এখানকার মূল্যবান সংরক্ষিত বনভূমিকে ধ্বংস করা যাবে না। উপরন্তু, এখানে "এগ্রোফরেস্ট্রি (Agro-

www.pathagar.com

Forestry) বা কমিউনিটি ফরেস্ট্রি (Community Forestry)" প্রভৃতি আধুনিক বনায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে গাছপালার সংখ্যা বাড়াতে হবে। কৃষিকাজ হবে শুধুমাত্র বনশূন্য বা বনায়নের অনুপযোগী খালি ঝোপঝাড় যুক্ত অব্যবহৃত ভূমিতে এবং বর্তমানের কৃষিভুক্ত জমিতে গবেষণায় দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের গভীর অরণ্যাঞ্চলেও বড় বড় বৃক্ষের নীচে পাহাড়ি জমিতে নানা ধরনের খাদ্যভুক্ত 'কন্দ' বা 'মূল' জাতীয় ফসল (Root Crops) বিপুল পরিমাণ উৎপন্ন হতে পারে, সে সবের খাদ্যমানও অনেক বেশি। পার্বত্যাঞ্চলের জনগণের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করে এসব স্থানীয় 'কন্দ' যেমন-জঙ্গী আলু, মিষ্টি আলু, ইয়াম (yam), ওলকচু ইত্যাদির প্রচলন করে বনাঞ্চল ধ্বংস না করেও বর্ধিত লোকসংখ্যার জন্য যথেষ্ট এবং উপযুক্ত খাদ্যমানসম্পন্ন ফসলের যোগান দেয়া সম্ভব।

মৎস্য সম্পদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৪০০ বর্গ কি. মি. বিস্তৃত বিশালায়তন মনুষ্য নির্মিত জলাধারে (Kaptai Lake) বিপুল মৎস্য চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে এই হ্রদ থেকে প্রায় ১০০,০০০ মণ বা প্রায় ৫০০০ টন উন্নত প্রজাতির মৎস্য আহরণ করা হয়। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মৎস্য চাষ পদ্ধতিতে এই বিপুল জলাধার থেকে বর্তমানের চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশি (১০,০০০,০০ মণ) বার্ষিক মাছ আহরণ করা সম্ভব। বর্তমানে হ্রদে রুই, কাতলা, মৃগেল এবং সিলভার কাপ ইত্যাদি মাছের চাষ হয়ে থাকে।

কাপ্তাই হ্রদ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ১,০০০ একর জুড়ে প্রায় ২০,০০০ ছোট ও মাঝারি পুকুর রয়েছে। অতি সহজেই এ সব পুকুরে কমপক্ষে ১০ থেকে নিয়ে ২০/৩০ হাজার মণ মাছের চাষ করা যেতে পারে। এখানকার উল্লেখযোগ্য পাহাড়ি নদীগুলোতে (কর্ণফুলী, মাতামুহুরী, সাঙ্গু, চেঙ্গী, কাসালং) প্রচুর উপযুক্ত প্রজাতির মাছের চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া উপযুক্ত স্থানে পাহাড়ি ক্ষুদ্র খাল বা ছোট নদীসমূহে বাঁধ দিয়ে ক্ষুদ্র কৃত্রিম জলাশয় সৃষ্টি করে এখানে প্রচুর মাছের চাষ করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

www.pathagar.com

বনজ সম্পদ

পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম এবং সমৃদ্ধতম মূল্যবান বনভূমি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি পার্বত্য জেলার মোট ৭০৪৩.৮৬ বর্গ কি. মি. এলাকা বনাচ্ছাদিত ভূমি। এর মধ্যে প্রায় ১৫৩৮.৭৯ বর্গ কি. মি. এলাকাজুড়ে রয়েছে সংরক্ষিত (Reserved Forest) বনভূমি (Rashid, 1991,P-107)। বাকি প্রায় ৫৪৫২.৫০ বর্গ কি. মি. অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের বেশিরভাগ বৃক্ষরাজি উজাড় হয়ে এখন শুধুমাত্র ঝোপঝাড় বা নতুন বনায়নের আওতাধীন কিছু বন রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলকে (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর, (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ, (৩) অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল (Unclassified State Forests) এবং (৪) 'ঝুম' বনবিভাগ-এ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর"-এর আওতায় মোট ৩৩,৮৪০ বর্গ কি. মি. বনভূমি রয়েছে। এর বেশিরভাগ অংশই কাসালং রিজার্ভ ফরেস্টের অন্তভুর্ক্ত। দুর্ভেদ্য এই গভীর অরণ্যে মূল্যবান চাপালিস, তেলসুর, নাগেস্বর, গর্জন, সিভিট ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ" ডিভিশন র‍্যাংঘিয়াং, সীতাপাহাড় এবং বরকল রিজার্ভ বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত। এ বনাঞ্চলে কদম, শিমুল, খাগড়া, চম্পা, চিকরাশী, বাঁশ, শন এবং গল্লাবেত প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। গৃহ-নির্মাণ ও শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বাঁশ, বেত এবং নরম কাঠের বিপুল চাহিদা রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের বৃক্ষ-উজাড় এলাকায় দেশের বনবিভাগ বনায়ন বাগান পদ্ধতিতে সেগুন ও মেহগনির বাগান গড়ে তুলেছেন। ইদানিং এখানে তেজপাতা, ইউক্যালিপটাস এবং অন্যান্য দরকারি বৃক্ষের বাগান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে এখানে প্রায় ২৩,১৯৬ একর উজাড় ভূমিতে নতুন বনায়ন করা হয়েছে এবং আরো প্রায় ৬,৩১৮ একর ভূমিতে নরম কাঠের (pulp wood plantation) বনায়ন করা হয়েছে (B.B.S., 1991)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমিতে কাঠ ও বাঁশ-বেত ছাড়াও অন্যান্য অনেক সম্পদের সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার বন্য হাতি, বন্যপ্রাণী, পাখি এবং

www.pathagar.com

ভেষজগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ দেশের অর্থনীতিতে বিপুল অবদান রাখতে পারে। শিল্পের কাঁচামাল, বাড়ি-ঘর ও আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠ, ঔষধ এবং খাদ্য-সামগ্রীর উৎসস্থল হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্য এক অপরিহার্য যোগানস্থল। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ের হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল থেকে মোট ৪৬,৪২০,০০,০০০/- টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে মাথাপিছু আয় ছিল বার্ষিক গড়ে ১৫,৩৮০ টাকা-যা বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় বণ্টন থেকে অনেক বেশি। বলাবাহুল্য যে, ঐ অধিক হারের কারণ এখানকার বনজ সম্পদ ও জলবিদ্যুৎ-এর উৎপাদন ও রাজস্ব আয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি সমস্ত বাংলাদেশের মোট বনাঞ্চলের অর্ধেকের চেয়েও বেশি হওয়ার ফলে এর অস্তিত্বের সাথে সমস্ত জাতির অস্তিস্ত অনেকটা জড়িত।

খনিজ সম্পদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের খনিজ সম্পদের প্রায় পুরোটাই এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এখানকার ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তৈল, চুনাপাথর, কঠিন শিলা ইত্যাদি মূল্যবান খনিজের সম্ভাবনাকে ঘোষণা করে। একই ধরনের ভূ-তাত্ত্বিক এবং ভূ-রূপতাত্ত্বিক (Geological and Geomorphological situations and structures) পরিস্থিতি ও গঠন সম্পন্ন আসাম ও সংলগ্ন মায়ানমার অঞ্চলে প্রচুর খনিজ তৈল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ায় বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেও খনিজ প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এপর্যন্ত এখানকার খাগড়াছড়ি জেলার সামুটাঙ্গ নামক স্থানে উন্নতমানের মিথেন-সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে। ১৯৬৯ সনে এস্টিমেটেড আহরণযোগ্য গ্যাসের মজুদ ছিল প্রায় ০.১৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। তাছাড়া রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই এবং বান্দরবন জেলার আলী কদমে কঠিন শিলা পাওয়া গেছে-যা রাস্তাঘাট তৈরি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত জলবিদ্যুতের জন্য বাঁধ তৈরিতে খুব কাজে লাগবে আশা করা যায়। অতি সাম্প্রতিককালে পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিককালের জরিপের ফলাফল থেকে জানা যায় যে,

www.pathagar.com

বান্দরবন জেলার রুমা থানার ঘেরাউ এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস, আলী কদম থানার তৈল মৌজায় পেট্রোলিয়াম এবং লামা থানার চলম ঝিলিতে প্রচুর কয়লা সম্পদ রয়েছে (Daily Sangram, Oct 24, 1993)। তাছাড়া বাঘাইছড়ি ও কাপ্তাই থানায় প্রচুর পেট্রোলিয়াম রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৯০ সালের ২১ আগস্ট থেকে শুরু করে বান্দরবন জেলার নাইক্ষাংছড়ি থানার পাহাড়ি ঝিরির পাশে ভূ-অভ্যন্তর থেকে অবিরাম ধারায় অনেক দিন ধরে খনিজ তৈল উঠতে থাকার রিপোর্ট ঐ সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উঠে। ১৯৮১ সনে শেল ওয়েল কোম্পানি বাঘাইছড়ি থানায় খনিজ তৈলের সন্ধান পায়। তারা উক্ত থানার শিল্প ও কাসালং অঞ্চলে ড্রিলিংও শুরু করে। কিন্তু শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাসমূলক তৎপরতার ফলে উক্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

জলবিদ্যুৎ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ি খরস্রোতা নদী ও পার্বত্য ভূমিরূপ বিপুল পানিশক্তির দ্বারা প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অপরিমেয় সম্ভাবনা ধারণ করে। এখানকার কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশের একমাত্র পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র। খরস্রোত কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে একটি বিশাল জলাধার তৈরি করে ঐ পানির সাহায্যে এই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিপুল বিদ্যুৎ শক্তি পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিডের মাধ্যমে (১৩২ কে, ভি, লাইন) সিদ্ধিরগঞ্জ পর্যন্ত পাঠানো হয়। সমস্ত চট্টগ্রামের বিপুল শিল্প ইউনিট সমূহ ও লক্ষ লক্ষ বসতবাড়ি, কলকারখানা, কৃষি সেচপাম্প, নগর-বন্দর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয় কাপ্তাই উৎপাদিত কর্ণফুলীর পানিশক্তিজাত বিদ্যুৎ। বর্তমানে এখানে দুইটি ফেজে মোট ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন জরিপ থেকে জানা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাঙ্গু, মাতামুহুরী নদীতে বাঁধ দিয়েও বিপুল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। ঐসব নদীগুলোর সর্বমোট পানিশক্তিকে যথাযথ কাজে লাগালে সমস্ত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদার প্রায় এক-চতুর্থাংশ মেটানো যেতে পারে। বাঁধ দেয়ার ফলে সৃষ্ট নতুন জলাশয়গুলোতে মাছের চাষ এবং পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলে প্রচুর আয় বাড়ানো যাবে।

www.pathagar.com

পর্যটন সম্পদ

ঢেউ খেলানো পাহাড় শ্রেনীর সবুজ হাতছানি, চোখ জুড়ানো কাপ্তাই হ্রদের মনোহর রূপ আর স্থানীয় উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বিচিত্র বর্ণাঢ্য জীবনাচার পার্বত্য চট্টগ্রামকে দান করেছে এক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রের মর্যাদা। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, বান্দরবন কিংবা দূরবর্তী সাজেক বা বরকলে গড়ে উঠতে পারে সমৃদ্ধ পর্যটন নগরী। কাসালং-এর গভীর অরণ্যে বন্য প্রাণী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Wild Life Observation Tower) বা কাপ্তাই কিংবা রাঙ্গামাটিতে মাছ-ধরা, নৌ-ভ্রমন, জলক্রীড়া কেন্দ্র (Fishing, Angling, River Cruise and Water Sports Facilities) স্থাপন করে সহজেই দেশি এবং বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করা যায়। তাছাড়া এখানকার নিরিবিলি পরিবেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আবাসিক কনভেন্ট বা ডরমিটরি ধরনের আধুনিক বিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপন করা যায়। এক কথায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিসর্গের সবকিছুই আদর্শ পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কুটির শিল্প বিকাশেরও বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার উপজাতীয়দের তৈরি তাঁতের বস্ত্র, চাদর, থলে, পুঁতির মালা, হাঁড়া এবং হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম, কাঠ এবং বাঁশ-বেতের আকর্ষণীয় দ্রব্যাদির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। পর্যটকদের কাছে এসব উপজাতীয় হস্তশিল্পজাত স্যুভেনিরের প্রচুর আকর্ষন রয়েছে। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকার এসব কুটির শিল্পজাত বা হস্তশিল্প দ্রব্য দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন স্থানে রফতানি করা হয়। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে লাভজনক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এসব উপজাতীয় হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ ভূ-রাজনীতি

ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেশের সবচেয়ে অরক্ষিত অথচ আঞ্চলিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক এলাকা। সমাজতান্ত্রিক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার (Uni-polar Global System) অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে এশিয়ায় ভারত এবং চীন ভবিষ্যৎ নব্য পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে চলেছে।

www.pathagar.com

এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগরের প্রবেশ পথে বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে মাত্র কয়েক কিঃমিঃ দূরে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যন্ত তাৎপর্যময় ভৌগোলিক অবস্থান জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের এই পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত কিছুলোক বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী তৎপরতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহ যেমন- মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম এবং মায়ানমারের আরাকান, শান, কোচিন এবং চিন প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে (Sukhwal, 1971)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ এবং সংলগ্ন মায়ানমারের উত্তরাংশের উল্লিখিত রাজ্যসমূহের উপজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীসমূহের পুরো জনসংখ্যাই মঙ্গোলীয়, তিব্বতী এবং বর্মী জাতিতাত্ত্বিক ধারার অন্তর্ভুক্ত। এলাকাটির জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং এখানকার জনগোষ্ঠীর সাধারণ সাংস্কৃতিক-সামাজিক ধারার কিছু কিছু বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবেও ঐসব অঞ্চলে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। পুরো এলাকাটি পার্বত্য অরণ্য আচ্ছাদিত ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল ভৌগোলিক পরিবেশের আওতাধীন। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলটির জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত কম এবং জনসংখ্যার বণ্টনও যথেষ্ট অসম। পার্বত্য ঐ এলাকাটি নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অনুপবর্তী পশ্চাৎভূমি হিসাবে এবং চীন, ভারত আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্ব বহন করলেও কৌশলগত (Strategic) দিক দিয়ে ইহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য বহন করে। সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলটির সন্নিহিত অবস্থান (Vicinal or relative location) অত্যন্ত প্রতিকূল। একমাত্র পশ্চিমে বাংলাদেশের ঘন জনবসতিপূর্ণ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া এলাকাটির উত্তর-পূর্ব কিংবা দক্ষিণ-পূর্বাংশের ভারত এবং মায়ানমারের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত দুর্গম, পার্বত্য, বনাবৃত এবং জনবিরল অনুন্নত ভূ-ভাগের সমষ্টি মাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি উত্তর-পূর্ব দিকে ভারতের মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম ছাড়িয়ে প্রায় ৬৫০ কিঃমিঃ দূরে চীনের ইউনান প্রদেশের সীমান্ত অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি (উঃ-পঃ) জেলার প্রায় ১১০ কিঃমিঃ

www.pathagar.com

সীমান্ত ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন। পার্বত্য রাঙ্গামাটির ২৪০ কিঃমিঃ সীমানা ভারতের মিজোরাম (Lusai Hills) ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভক্তি নির্দেশ করে এবং পার্বত্য বান্দরবন জেলার প্রায় ১৫৫ কিঃমিঃ সীমান্ত রেখা মায়ানমারকে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করেছে (Bangladesh Administrative Map Prepared by Graphosman, Dhaka-1992)। পার্বত্য চট্টগ্রামের আকৃতি অসংবদ্ধ (Non-Compact) এবং দীর্ঘায়তন (Elongated)। প্রস্থের তুলনায় অঞ্চলটি কয়েকগুণ বেশি দীর্ঘ। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বৃহত্তম ভূ-ভাগ থেকে একটি দুর্বলভাবে সংযুক্ত অভিক্ষেপিত (Prorupt) ভূ-ভাগ। এসব ভূ-পারিসরিক বৈশিষ্ট্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতার দিক বলে বিবেচ্য। পূর্ব বর্ণিত মানচিত্র (Graphosman, 1992) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর-দক্ষিণে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮০ কিঃমিঃ এবং গড় প্রশস্ততা প্রায় ৫০ কিঃমিঃ। অঞ্চলটির পূর্ব-পশ্চিম দিকে সবচেয়ে প্রশস্ত স্থানের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ কিঃমিঃ (রামগড় থেকে বরকল-এর উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত) এবং অপ্রশস্ত স্থানের বিস্তৃতি প্রায় ৪০ কিঃমিঃ (চন্দ্রঘোনা থেকে মিজোরামের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত)। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে (কাপ্তাই কিংবা চন্দ্রঘোনা) সড়ক পথে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের দূরত্ব যদিও ৫০-৬০ কিঃমিঃ, বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবন জেলার নাইখ্যংছড়ি থানার শেষ প্রান্ত (পূর্বাংশ) থেকে নিকটতম সমুদ্র উপকূলে দূরত্ব মাত্র ১৩-১৪ কিঃমিঃ (Graphosman, 1992) । পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্ত এলাকার অবস্থান থেকে সমুদ্রের এই নিকটবর্তীতা সমস্ত অঞ্চলটিকে দান করেছে বিশেষ ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব। ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অনুপবর্তী পশ্চাৎভূমি হিসাবে এবং চীন, ভারত আর দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার আসিয়ানভুক্ত অর্থনৈতিক শক্তির প্রায় সমদূরবর্তী প্রভাব-ভূমি (Vicinal land) এশিয়ার এই ত্রিভূজ ভূ-ভাগটি বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এই গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ভূ-ভাগের বিশেষ তাৎপর্যময় স্থানে অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বমোট আয়তন ১৩,১৪৮ বর্গ কিঃমিঃ। আয়তনে অঞ্চলটি লেবানন, সাইপ্রাস, ব্রুনাই, কাতার কিংবা লুক্সেমবার্গের চেয়ে বড়। বাংলাদেশের এই বৃহৎ পার্বত্য অঞ্চলটি সবদিক দিয়ে ভূমি পরিবেষ্টিত। অঞ্চলটির সবচেয়ে নিকটতম সমুদ্র উপকূল দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রামের নাইখ্যংছড়ি থেকে মাত্র ১২ কিঃমিঃ পশ্চিমে

www.pathagar.com

কক্সবাজার জেলার উখিয়ার কাছে অবস্থিত। পার্বত্য রাঙামাটির পশ্চিম প্রান্তের কাউখালী থেকে মাত্র ৩০ কিঃমিঃ দূরে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামের অবস্থান এবং কাপ্তাই থেকে ৫০ কিঃমিঃ দূরে বঙ্গোপসাগরের উন্মুক্ত জলরাশির গভীর সমুদ্রের শুরু। এক কথায় বলা যায় যে, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলা আর সংকীর্ণ এক ফালি ভূ-ভাগ যা কোন স্থানেই পূর্ব-পশ্চিমে ৫০ কিঃমিঃ-এর চাইতে বেশি প্রশস্ত নয় তা পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমুদ্র থেকে পৃথক করে রেখেছে। চট্টগ্রামের বন্দর যা কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে তার নাব্যতা এবং সমস্ত চট্টগ্রামের বন্দর, কলকারখানা এবং নগরীসহ সমস্ত জেলা, পার্শ্ববর্তী কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর এবং চাঁদপুর জেলাসমূহের বিদ্যুতের সম্পূর্ণ সরবরাহ এই কর্ণফুলীর পানির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া নৌ–পরিবহন এবং কৃষির জলসেচ ব্যবস্থার জন্য কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলাদ্বয় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রবাহিত কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হলদিয়া ইত্যাদি নদীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এভাবে দেখা যায় যে, সমস্ত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলাদ্বয়ের প্রায় সোয়া কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা তথা অস্তিত্ব এবং বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরের অস্তিত্বও বিদ্যুৎ সরবরাহের অন্যতম উৎস পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে জড়িত। এসব দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া দুর্গম এবং পর্বঘেরা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের বন্দর, মহানগর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূ-ভাগকে ভূ-রাজনৈতিক এবং অবস্থানগত দুর্ভেদ্যতা দান করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতায় চট্টগ্রাম অঞ্চল, কৌশলগতভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি সহজভেদ্য (Vulnerable) এবং কৃশকায় (Thin in depth) হয়ে যায়, যা রণকৌশলগতভাবে (Strategically) ঐ এলাকাকে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত দুর্বল ও প্রতিকূল বৈশিষ্ট্য দান করবে।

ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস আজও প্রায় অজানা বা অনাবিষ্কৃত। দুর্গম, গভীর অরণ্যাবৃত আর বন্ধুর ভূমিরূপ বিশিষ্ট ঐ এলাকা প্রাচীনকালে হিংস্র বন্য-জন্তু-জানোয়ারের দখলে ছিল। ধারণা করা হয়, আজ থেকে প্রায় হাজার

www.pathagar.com

হাজার বছর আগে ঐ এলাকায় মুষ্টিমেয় কিছু ভ্রাম্যমান অরণ্যবাসী জংলি জনগোষ্ঠী ফলমূল সংগ্রহ এবং বন্য প্রাণী শিকার করে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলত। প্রায় জনশূণ্য ঐ অঞ্চলের সাথে সমতলের সভ্য জগতের প্রথম যোগাযোগ ঘটতে শুরু করে ভারতবর্ষে মোঘল শাসনামলে পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে। ঐ সময়ে মাত্র কয়েকটি অরণ্যবাসী উপজাতীয় জনগোষ্ঠী (যেমন কুকি জনধারাভুক্ত ম্রো, পাংখো, খুমি এবং লুসাই ইত্যাদি) পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যে বিচরণ করত। এদের পরবর্তিতে এখানে পাশ্ববর্তী মায়ানমারের আরাকান অঞ্চল থেকে মারমা, চাকমা এবং উত্তরের ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে ত্রিপুরা, (টিপরা) উপাজাতীয়রা দলে দলে এসে আশ্রয় নিতে থাকে। ভারতবর্ষের মোঘলদের সুবেদার বাংলার প্রশাসকগণ চট্টগ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতেন এবং বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কর আরোপ করতেন। মাঝে মধ্যে মায়ানমারের বিভিন্ন রাজাগণও পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রভাব বজায় রাখতে চাইতেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐসব জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই নিজেদের আদি নিবাসস্থল থেকে যুদ্ধ কিংবা অন্য কোন কারণে বিতাড়িত, দেশান্তরিত হয়ে এখানে আগমন করে। তারা প্রায় সময়ই একে অপরের সঙ্গে বৈরিভাব পোষণ করত। এমনকি প্রায়শঃই তারা এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে যুদ্ধে রত থাকত। মোঘলদের পর ঔপনিবেশিক বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে এবং ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তাদের সরাসরি দখলে নিয়ে আসে। ১৯০০ সালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ঐ অঞ্চলে শক্তিশালী বাঙালি ভারতিয় প্রভাব খর্ব করার লক্ষ্যে এবং ঐ এলাকায় একটি স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে "চিটাগাং হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন, ১৯০০" (Chittagong Hill Tracts Regulations, 1900) চালু করে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী জেলার প্রশাসক সেখানকার সব ধরনের অভিগমন বা জনস্থানান্তর (Migration and Resettlement) বন্ধ বা প্রতিরোধ করতে পারতেন। এই আইন প্রণয়নের দ্বারা ঔপনিবেশিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলোকে এক একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসে বাধ্য করানোর প্রয়াস চালায় (Cited in Ahmed, 1990)।

www.pathagar.com

১৯৩৫ সালে বৃটিশ প্রণীত ভারত শাসন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামকে "সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল" বা "Totally Excluded Area" হিসাবে চিহ্নিত করে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে সংলগ্ন বাংলাভাষী সমতল অঞ্চলের আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের এই কৌশলের কারণ ছিল ঐ অঞ্চলে বাঙালি ভারতিয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ এবং সেখানে বাঙালি প্রভাব ও বসতি স্থাপন প্রক্রিয়া বন্ধ করা। প্রায় জনশূণ্য এবং সম্পদ সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর মায়ানমারের আরাকান কিংবা উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আগত বসতিস্থাপনকারি উপজাতীয়দের যতটুকু দাবি ছিল-অঞ্চলটির কাছের, সংলগ্ন সমতলবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠীর ঐ অঞ্চলটির উপর দাবি বা অধিকার কোন যুক্তিতেই কম ছিল না। কিন্তু স্বার্থান্বেষী ঔপনিবেশিক বৃটিশরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে ভারতবর্ষে তাদের শাসন শোসন পাকাপোক্ত করে নিয়ে মানবিকতা এবং ন্যায়পরায়নতার যুক্তিকে লঙ্ঘন করে ঐসব অবৈধ আইনের ধারা খাড়া করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভবিষ্যৎ বিচ্ছিন্নতার পথ প্রশস্ত করে যায়। আজ ঐসব ঔপনিবেশিক আইনের অযৌক্তিক ধারার ধূয়া তুলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া দাড় করানোর চেষ্টা করছে (Amin, 1988/'89 and Shelley, 1992)।

১৯৪৭ সালে যখন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারত বিভক্তি মেনে নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানা চিহ্নিত করতে তৎপর হয় তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম হওয়ার ভিত্তিতে ভারতিয় জাতীয় কংগ্রেস অঞ্চলটির ভারতভুক্তি দাবি করে বসে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ জনবিরল সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলটির অহিন্দু জনসংখ্যাধিক্যের এবং চট্টগ্রাম জেলার স্বার্থ সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চলটির পাকিস্তানভুক্তির দাবি পেশ করে। বৃটিশ শাসকরা কংগ্রেসের দাবি প্রায় মেনে নিয়েও শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবের ফিরোজপুর (শিখ জনসংখ্যাসমৃদ্ধ) জেলার ভারতভুক্তির বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ বলে ঘোষণা করেন (Tayyeb, 1966)। মুসলিম লীগের দাবিতে সম্পূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্য, লুসাই (মিজোরাম) এবং কাছাড় জেলার দাবিও অন্তর্ভুক্ত ছিল (Sukhwal, 1991)। কিন্তু সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিতে রেডক্লিফ রোয়েদাদে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন

www.pathagar.com

ঐসব জনবিরল অহিন্দু জন-অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলসমূহ ভারতের আসামের সাথে জুড়ে দেয় (Ahmed, 1990 and Rahman 1958)। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন কিছু শিক্ষিত প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐ অঞ্চলটির ভারত ভুক্তির পক্ষে দাবি তুলেছিল এবং ১৯৪৬ সালে তারা ঐ প্রচেষ্টার অসারতা বুঝতে পেরে "The Hillman Association" এর ব্যানারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা বা কুচবিহারের মত দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা (The Status of a Princely State) দাবি উত্থপান করে। তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে চাকমা নেতা স্নেহ কুমার চাকমা মরিয়া হয়ে রাঙামাটিতে ভারতিয় পতাকা উত্তোলন করেন (Shelley, 1992) এবং এর বিপক্ষে স্থানীয় মারমা মগ গোষ্ঠীর দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার নেতৃবৃন্দ বান্দরবনে মায়ানমার পতাকা উত্তোলন করেন (পূর্বোক্ত)। ইতিহাসের এই চিত্র দুটি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই প্রধান জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের অনৈক্যের প্রমাণ মেলে।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৫ সালে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের 'বিশেষ মর্যাদা'র মাধ্যমে সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী করাচী থেকে ঐ অঞ্চলে প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন চালু হলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের সকল জনগণের জন্য ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করে দেয়া হতে থাকে (May, 1986)। ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে তার আগের মর্যাদা হারিয়ে ফেলে (Ahmed, 1990)। পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে "কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প" চালু হয়। এর ফলে কর্ণফুলী নদীতে বাধ দিয়ে কয়েকশ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বিশাল হ্রদ সৃষ্টি করা হয় এবং হ্রদের পানিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০% ভাগ চাষের ভূমি এমনকি রাঙামাটির চাকমা রাজবাড়িসহ পুরাতন শহরের সম্পূর্ণটা বন্যার পানিতে ডুবে যায়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাজার হাজার চাকমা পরিবার। সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কিছু ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছার আগেই লুটপাট হয়ে গেছে। তখন অনেকেই নিঃশ্ব হয়ে পার্শ্ববর্তী ভারতে ত্রিপুরা বা মিজোরামে চলে যায় (Rob, 1990, Ahmed, 1990

www.pathagar.com

and Shelley, 1992)। এই কৃত্রিম প্লাবন ও চাকমাদের দেশান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকলের অলক্ষ্যে আর নব্য ঔপনিবেসিক পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর অযুত অবহেলায় অবধারিত অদৃষ্টের মত অঙ্কুরিত হয় বাংলাদেশের সার্বভৌম অস্তিত্বের উপর বর্তমানের সবচেয়ে বড় হুমকি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার বাঙালি জাতীয়তাবাদকে একটি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সকল উপজাতি যারা বাংলাদেশে বসবাস করে তাদেরকে বাঙালি হয়ে যেতে আহবান করেন। তার এই আহবান অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যে সমস্যার সূত্রপাত বৃটিশ এবং পাকিস্তানিরা করেছিল শেখ মুজিবের এই ভ্রান্ত আহবানে তার মূল পানিসিক্ত হয়ে ফুলে ফেপে ওঠে। কারণ, এই আহবানের মাঝে পার্বত্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং অস্তিত্ব (যাদের সংস্কৃতি সমতলবাসীর সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং যা তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লালন করেছে) বিপন্ন এবং ধ্বংসের সম্মুখীন দেখতে পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তরুণ অধ্যাপক, গবেষক নূরুল আমিনের মতে "After the emergence of Bangladesh the Awami League Government led by Sheikh Mujibur Rahman created a reign of terror in the Chittagon Hill Tracts area. It committed anothers misdeed by not granting special status to the CHTs people under the constitution of 1972 which they had enjoyed under the 1900 regulations --- " (Amin, 1988). ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি চাকমা নেতা ও সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ একদল চাকমা প্রতিনিধি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে তাদের চার দফা দাবি উপস্থাপন করেন। দাবিগুলো ছিল (The Ray, 1985, Cited in Amin 1988/89):

১। নিজস্ব কানুনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন

২। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে বৃটিশ প্রণীত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত ধারার পুনঃ সংযোজন।

www.pathagar.com

৩। প্রশাসনিক পূর্ণ ক্ষমতাসহ স্থানীয় উপজাতীয় রাজাদের ক্ষমতা প্রদান এবং

৪। সাংবিধানিকভাবে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের অপরিবর্তনীয়তার নিশ্চয়তা বিধান এবং বাঙালি পরিবার সমূহের বসতি স্থাপন বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

শেখ মুজিবের মত উদার রাজনৈতিক নেতাও চাকমা প্রতিনিধিদের এই চারটি দাবির অন্তর্নিহিত ভবিষ্যৎ বাস্তবতার ভয়াবহ চিত্র অনুধাবন করে অত্যন্ত কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যাত করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চাকমাদের এসব দাবি-দাওয়া নিছক বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বলে অভিহিত করেন (Amin, 1988/89. P-140)।

১৯৭২ সালের ১৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু চীনপন্থি কম্যুনিস্ট চাকমা উপজাতীয়দের অধিকারের দাবি-দাওয়াকে স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে রূপান্তর করতে তৎপর হয় এবং তাদের উদ্যোগে জনসংহতি সমিতি নামের একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। শেখ মুজিবের অনমনীয় মনোভাব এবং কঠোরতার ফলশ্রুতিতে উপজাতীয়দের দাবি আদায়ের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 'জনসংহতি সমিতি' থেকে জন্ম নেয় শান্তিবাহিনী ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারিতে। স্বাধিকারের দাবি-দাওয়া ক্রমে উপজাতীয়দের স্বাধীনতা'র বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতায় পরিবর্তিত হয়। শান্তিবাহিনীর চোরাগোপ্তা হামলা ক্রমে গেরিলাযুদ্ধে মোড় নেয় এবং অশান্তি আর হত্যা-ধ্বংসের ভয়াবহতায় ভরিয়ে দেয় কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী আর কাসালং এর শান্ত উপত্যকা আর অধিত্যকাগুলোকে। এবার চাকমাদের দাবি-দাওয়ায় আরো সুস্পষ্টভাবে যোগ হয় নতুন কিছু ধারা। যেমনঃ

* ১৯৪৭ সালের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগত সকল অ-উপজাতীয় অর্থাৎ বাংলাভাষী সকল জনসংখ্যাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পুরোপুরি উঠিয়ে নিতে হবে।

* পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল নিরাপত্তা বাহিনী উচ্ছেদ করে স্থানীয় উপজাতীয়দের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

* পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন, অর্থ-ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় উপজাতীয়দের উপর ন্যস্ত করতে হবে।

www.pathagar.com

যে কোন সচেতন ব্যক্তিই এসব দাবি-দাওয়ার ধারাগুলো একটু বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবে যে, উপজাতীয়দের এসব দাবি-দাওয়া সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং স্বার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো। পার্বত্য চট্টগ্রামের নানা স্থানে অসহায়, গরিব অ-উপজাতীয় লোকজনের উপর 'শান্তিবাহিনী'র হামলার খবর আসতে লাগলে এবং ক্রমে তাদের আক্রমণ বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজনের উপরও পরিচালিত হতে শুরু করলে আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালা, আলী কদম ও রুমায় তিনটি ছোট সেনানিবাস এবং অনেকগুলো সামরিক চৌকি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। (Hossain, 1991)।

১৯৭৫ সালের আগস্টের পট-পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আগমন ঘটে তরুণ জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের। তিনি বাংলাদেশের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে জনবিরল, সম্পদ সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপুলসংখ্যক সমতলবাদী বাস্তুহারা এবং দরিদ্র, ভূমিহীন বাঙালি চাষী পরিবারকে পুনর্বাসিত করেন। বিচক্ষণ দেশপ্রেমিক জিয়া তিব্বতে 'সমাজতান্ত্রিক' চীন এবং জম্মু (কাশ্মির)তে 'গণতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ'(?) ভারত যেমন জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সংখ্যালঘু বিচ্ছিন্নতাবাদ-প্রবণ অঞ্চলে বিপুল জনসংখ্যার পুনঃস্থাপন (Resettlement) ঘটায়, তেমনি উদ্যোগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের একটি অংশের বিচ্ছিন্নতাবাদী অপতৎপরতার স্থায়ী মোকাবিলা করার উদ্যোগ নেন। সাথে সাথে তিনি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য অবকাঠামোগত অবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার উদ্যোগে মাত্র ২/৩ বছরের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের খাস জমিতে প্রায় এক লাখের মত ভূমিহীন গরিব মানুষ পুনর্বাসিত হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে জিয়ার করুণ মৃত্যু ঘটলে তার এসব আন্তরিক পরিকল্পনাসমূহ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। এবার পট-পরিবর্তনের ফলে জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় একই নীতি বহাল রাখেন। 'শান্তিবাহিনী'র তৎপরতা অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করার নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারত সরকার অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে চাকমা সন্ত্রাসীদের আশ্রয়, প্রশ্রয় ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতে থাকলে নিতান্তই সামান্য উৎপাত ক্রমে

www.pathagar.com

দরিদ্র বাংলাদেশের জন্য বিরাট ক্ষতিকর আপদ হিসাবে দেখা দেয়। উপায়ন্তর না দেখে এরশাদ সরকার চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে তৎপর হন। এই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ এরশাদের পরে আগত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম খালেদা জিয়ার সরকারও চালিয়ে যায়। কিন্তু চাকমা নেতারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের আগের দাবি-দাওয়ায় সম্পূর্ণ অনড় থাকে এবং মাঝে-মধ্যেই নানা মানবাধিকার সংস্থার ছদ্মাবরণে বিদেশি শক্তি এবং ভারতিয় প্রশাসন (বিএসএফ বা বিদেশ মন্ত্রণালয়)-এর অযৌক্তিক উদ্দেশ্যমূলক হস্তক্ষেপ এসব উদ্যোগকে বারবার নস্যাৎ করে দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন শক্তির ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট বিদেশি শক্তির প্রভাব ও সংযোগের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় (Shelley, 1992, Hossain Zin, 1991)। অঞ্চলটির মিশ্র জনসংখ্যা এবং বিপুল ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নানা আঞ্চলিক এবং দূরবর্তী আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহকে অঞ্চলটির উপর নজর রাখতে উৎসাহিত করেছে। ভারত মহাসাগরে এবং সংলগ্ন ভৌগোলিক এলাকায় নিজেদের প্রভাব বলয় তৈরি করতে বা ধরে রাখতে ভারত, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসিগোষ্ঠী বাংলাদেশের এই নাজুক আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে উৎসাহিত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐসব সমস্যায় দূরপ্রাচ্যের জাপান এবং দূরান্তের অস্ট্রেলিয়ার মত আপাত নিরীহ রাষ্ট্রের আগ্রহের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান 'বিশ্ব অর্থনীতির পরাশক্তি' (Economic Super Power) জাপান পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সাম্প্রতিক বিশ্বের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ধারায় 'বিশ্ব মঙ্গোলীয়' বা 'বিশ্ব বৌদ্ধ পুনরুত্থান' (Pan Mongolian or Pan Buddist Revivalism)-এর আওতায় এবং প্রকৃত অর্থে অদূর ভবিষ্যতে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগর ও দঃ এবং দঃ-পূঃ এশীয় অঞ্চলসমূহে স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখতে জাপানের ঐ সচেতনতা। অস্ট্রেলিয়া ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতের প্রভাব

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রিত রাখতে বা খর্ব করতে এবং শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে প্রখর নজর রাখছে এবং 'মানবাধিকার প্রশ্ন' তুলে বাংলাদেশের উপর চাপ ফেলতে প্রয়াস পাচ্ছে। নিচে সংক্ষেপে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যায় কয়েকটি শক্তির স্বার্থের সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করা হল।

বাংলাদেশের স্বার্থ

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে বাংলাদেশের অস্তিত্বের স্বার্থ জড়িত। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌম অঞ্চল। জনভারাক্রান্ত ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ভবিষ্যৎ বিপুল জনসংখ্যার পুনর্বাসনের জন্য অত্যন্ত কম জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি অতীব প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে দারুণভাবে বঞ্চিত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সম্পদ-সম্ভাবনাময় সমৃদ্ধ এই পার্বত্য অঞ্চলটিকে বাংলাদেশের 'Land of Promise' বা 'প্রতিশ্রুত সমৃদ্ধির লীলানিকেতন' বলা যায়। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং সমৃদ্ধ বনাঞ্চল, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উৎস, ফলমূল উৎপাদনের উপযোগী ক্ষেত্র এবং অনাহরিত-অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের জন্য এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিনত করেছে। ভূ-রাজনৈতিকভাবে অঞ্চলটি বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরসহ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগরী ও প্রায় সোয়া কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত চট্টগ্রাম অঞ্চলকে (কক্সবাজারসহ) কৌশলগত নিরাপত্তা (Strategic Security) বা ভূ-রাজনৈতিক আড়াল (Strategic Defence) ও গুরুত্ব দান (Thickness) করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া সম্পূর্ণ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল এক ফালি সরু প্রলম্বিত সহজভেদ্য ভূমিতে পরিণত হবে। (Thin, Elongated and Vulnerable Land)। চট্টগ্রামের প্রায় সকল নদ-নদী পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে এই অঞ্চলটির বিচ্ছিন্নতা বৃহত্তর চট্টগ্রাম (কক্সবাজার জেলাসহ) অঞ্চলের কৃষি জমির পানি সরবরাহ, নৌ-যোগাযোগ, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের নাব্যতা এবং কাপ্তাই হতে সরবরাহকৃত জলবিদ্যুতের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিপন্ন করে তুলবে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারি প্রায় পাঁচ লক্ষ বাংলাভাষী গরিব এবং মধ্যবিত্তের অস্তিত্বও অঞ্চলটিতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের সাথে জড়িত।

www.pathagar.com

মায়ানমারের স্বার্থ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে মায়ানমারের প্রায় ১৭০ কিঃমিঃ সাধারণ সীমানা বর্তমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বেশি অংশই মাত্র এক বা দুই/তিন শতক আগে মায়ানমার থেকে দেশান্তরি হয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রবেশ করে (Hutchinson, 1906 and Burman 1985)। এ অঞ্চলের উপজাতীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে মায়ানমারের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। বর্তমানে মায়ানমারের ঐ অঞ্চলসমূহের বিভিন্ন জাতিসত্তা বিশেষ করে কারেন, রোহিঙ্গা, শান, চিন ইত্যাদি উপজাতীয়রা বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধে লিপ্ত। তাছাড়া ঐ এলাকায় কম্যুনিস্ট গেরিলাদের তৎপরতারও প্রচুর পরিলক্ষিত হয়। আরাকানের রোহিঙ্গাদের প্রশ্নে বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের বর্তমান সম্পর্ক খুবই খারাপ। এমতাবস্থায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই মায়ানমারকে সম্পূর্ণ এলাকাটির উপর বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে। তবে নিজ দেশের বর্তমান অশান্ত এবং অনিশ্চিত অবস্থার প্রেক্ষিতে অভাবগ্রস্ত মায়ানমারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন আধিপত্যবাদী ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়।

ভারতের স্বার্থ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিস্থিতির পেছনে সবচেয়ে সক্রিয় শক্তি ভারত (Shelley, 1992; Rahman, 1994; Hossain, 1991 and Rob, 1991)। চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংগঠিত করা থেকে নিয়ে তাদের আশ্রয়দান, অস্ত্র যোগানো, সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ দান এবং আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহ এদেরকে সমর্থন দান করার ব্যাপারে ভারতের প্রত্যক্ষ সংযোগের অজস্র প্রমাণ রয়েছে (Rob, 1991)। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের ভীষণ রকমের ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ জড়িত। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় ভারতিয় কংগ্রেস পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতভুক্তির দাবি তুলেছিল (Tayab, 1966 and Ahmed, 1954)। বর্তমানে ভারত এশিয়ার অন্যতম শক্তি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরাশক্তি। বঙ্গোপসাগর থেকে নিয়ে ভারত মহাসাগরে ভারত আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে (Bindra, 1982)। কিন্তু বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিশেষ করে পাঞ্জাব, কাশ্মির,

www.pathagar.com

তামিলনাড়ু, আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, গোর্খাল্যান্ড (দার্জিলিং) প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যন্ত জোরালো স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন (Secessionist Movements) দানা বেঁধে উঠেছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যে (Seven Sisters States of India)-র বর্তমান প্রবণতায় ভারত বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারত চীনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে ভারতের এই অঞ্চলটির কৌশলগত এবং ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতা বিশেষভাবে ধরা পড়ে। চীন মাত্র ২/৩ দিনের মধ্যে বৃহত্তর আসামের সম্পূর্ণ উত্তরাংশ (ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাংশ) কব্জা করে নেয়। তাছাড়া একটি ভবিষ্যৎ শত্রু ভাবাপন্ন প্রতিবেশী নেপাল কিংবা বাংলাদেশ ভবিষ্যতের এ ধরনের সংঘর্ষে চীনের পক্ষ নিলে ভারতের ঐ অসুবিধাজনক, ভূ-কৌশলগত অঞ্চলটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে যেতে পারে (Sukhwal, 1971)। বর্তমানে আসাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর ও মিজোরামে 'সম্মিলিত আসাম মুক্তি ফৌজ' (United Liberation Forces of Assam-ULFA) এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী গেরিলা সংগঠনসমূহ ভারতের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধে রত। ভারত ঐসব দূরবর্তী অঙ্গরাজ্যসমূহে দ্রুত সরবরাহ পাঠাতে বা যোগাযোগ বজায় রাখতে রীতিমত হিমশিম খায়। ভবিষ্যৎ কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি কোনদিন নেপাল বা বাংলাদেশ অথবা চীন ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের সাথে সমগ্র উত্তর-পূর্বাংশের 'সাত বোন' রাজ্যসমূহকে সংযুক্তকারি সংকীর্ণ 'শিলিগুঁড়ি করিডোর' বন্ধ করে দেয়, তবে ঐ অঞ্চলে ভারতের আধিপত্য সহজেই খতম হয়ে যেতে পারে। ঐসব পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতকে মরিয়া হয়ে ঐ প্রায় ভূ-পরিবেষ্টিত (Land locked) উত্তর-পূর্বাংশের সাথে সমুদ্র পথের সংযোগ ঘটানোর জন্য একমাত্র উপায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর বা ঐ উপকূলীয় কোন সুবিধাজনক স্থানকে কেন্দ্র করে সোজা উত্তর-পূর্ব দিকের ভূ-খণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে মিজোরাম বা ত্রিপুরা রাজ্যের সংযোগ সাধনের চিন্তা-ভাবনায় দ্বারস্ত হতে হয়। শিল্প এবং প্রযুক্তিতে প্রায় অগ্রসর ভারত সহজেই বঙ্গোপসাগরের অগভীর দক্ষিণ চট্টগ্রাম (উখিয়া বা চকোরিয়ার চিরিঙ্গা মালুমঘাটের কাছের ঘাঁটিতে) উপকূলে ভাসমান বন্দর প্রতিষ্ঠা করে মাত্র ১৩/১৪ কিঃ মিঃ বাংলাদেশি ভূমির (প্রয়োজনে জোর করে বা ২৫ বছর চুক্তির মত চাপিয়ে দেয়া চুক্তির বলে) উপর দিয়ে চলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পৌঁছাতে সক্ষম। এখন শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামই হতে পারে ভারতের এই ভূ-কৌশলগত স্বপ্নকে

www.pathagar.com

সফল করার একমাত্র ক্ষেত্র। তাই সর্বশক্তি ও আন্তরিকতা দিয়ে ভারত সহায়তা করে যাচ্ছে তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সফলকারি তথাকথিত 'শান্তিবাহিনী'র লোকজনকে। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এবং ঋণগ্রস্ত দেশ ভারত দীর্ঘদিন ধরে পুষে চলেছে প্রায় অর্ধ লক্ষ চাকমা শরণার্থীকে তার ঐ সব উঃ-পূঃ অঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের সরকারি শিবিরগুলোতে। বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের কাছে আত্মসমর্পণকারি 'শান্তিবাহিনী'র সদস্যদের বর্ণনা এবং তাদের জমাকৃত অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা ও ব্রান্ড দেখে ভারতের সরাসরি সংযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় (Rahman, 1990 and Shelley, 1992)। তাছাড়া ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীনকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মাত্র ৬০০/৬৫০ কিঃ মিঃ ইউনান সীমান্ত থেকে ভবিষ্যতে ভারত-মাহসাগরে প্রবেশ করতে হলে ঐ একই পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যা ভারত মোটেই বরদাশত করতে পারবে না। সুতরাং আগেভাগেই নিজের দখলদারি এবং অধিকারের পথ ভারতকে করে নিতে হয়। কিন্তু ভারতের এই আধিপত্যবাদী দূরদৃষ্টিমূলক মনোভাব বাস্তবায়নের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, পার্বত্য দুর্গম মিজোরাম, মনিপুর, ত্রিপুরা কিংবা নাগাল্যান্ডের মঙ্গোলীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহ দারুন ভারত বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করে এবং অনেক দিন থেকে তারা স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু বাংলাদেশের সচেতন এবং অন্যান্য স্থানের বাঙালি এবং বিশেষ করে, মুসলমানগণ ভারতের বিন্দুমাত্র অপতৎপরতা সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। বাংলাদেশের যেকোন প্রতিষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ বা উপকূলীয় ভূ-খণ্ডে ভারতের কোন ধরনের হস্তক্ষেপ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মোড় নিতে বাধ্য। এসব পরিস্থিতি ভারতকে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সরাসরি বা বড় ধরনের কোন ঝুঁকি নিতে সাহসী করবে না। অবশ্য শুধুমাত্র বাংলাদেশের যে কোন জাতীয়তাবাদী সরকারকে চাপের মধ্যে রাখতে 'ফারাক্কা'র মত ভারত "চাকমা সমস্যা"কে সফল 'চাবি' হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে যাবে।

চীনের স্বার্থ

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের পতনের পর এশিয়ার বিপুল জনশক্তিতে বলীয়ান বিশাল চীন বর্তমান জামানার একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। এশিয়ার প্রধান শক্তি হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক ও অবস্থানগত কারণে

www.pathagar.com

চীন ভারত মহাসাগরের নীল জলভাগে সরাসরি প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে তার অন্যতম কিংবা এশিয়ার প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী (শত্রু?) ভারত নিউক্লিয়ার সাবমেরিন ও বিমানবাহী জাহাজ (৩টি)-এর বলে ভারত মহাসাগরে স্বীয় প্রভাব প্রবল প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে (Susha, 1977; Subrahmanyam, 1972, and Kodikara, 1979)। ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশিতে প্রবেশ করতে হলে চীনের নিকটতম সংযোগ পথ হচ্ছে তিব্বতের দক্ষিণ-পূর্বাংশের ভুটানের সীমান্ত সংলগ্ন চুম্বি উপত্যকা থেকে মাত্র ৬০ মাইল বা প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ দক্ষিণের দার্জিলিং-শিলিগুঁড়ি পেরিয়ে বন্ধুভাবাপন্ন বর্তমানের বাংলাদেশে (উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চল) অবতরণ পূর্বক আরও প্রায় ৫০০-৬০০ কিঃ মিঃ সমতল ভূমি পেরিয়ে মংলা বা ৭০০-৮০০ কিঃ মিঃ দূরের চট্টগ্রাম বন্দরের সুবিধা লাভ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে চীনকে মোকাবিলা করতে হবে বর্তমানে বিপুলভাবে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন ভারতের সঙ্গে। তাছাড়া বিজাতীয় সংস্কৃতির ভিন জাতি চীনাদের বাংলাদেশিরাও বেশিদিন আতিথেয়তা দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না। এ ক্ষেত্রে চীনকেও অপেক্ষাকৃত কম ঝামেলায় স্থায়ীভাবে ভারত মহাসাগরের প্রবেশদ্বারে পৌঁছতে হলে মায়ানমারের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ইউনান প্রদেশ থেকে যাত্রা করে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পরবর্তীতে পশ্চিম হয়ে প্রায় ৯০০ কিঃ মিঃ অত্যন্ত দুর্গম পার্বত্য এবং বনাবৃত জনবিরল মায়ানমার ও ভারতিয় (উঃ-পূঃ) ভূ-ভাগ অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে হবে। এবং এখান থেকে সহজেই মাত্র ৫০-৬০ কিঃ মিঃ দূরে চট্টগ্রাম বন্দর বা দক্ষিণে আর কম দূরত্বে বঙ্গোপসাগরের কূলে পৌঁছতে পারবে। এ ক্ষেত্রে মায়ানমার, ভারত এবং বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় মঙ্গোলীয় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলো নৃতাত্ত্বিক (মঙ্গোলীয়) স্বগোত্রীয় চীনদের সহজেই বরণ করে নিতে পারে। উল্লেখ্য, ঐ অঞ্চলের উপজাতীয়রা বৃটিশ-ভারতের ১৮২৬ সালের ইউনডাবো (Yundabo) চুক্তিবলে সৃষ্ট ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমার কৃত্রিম রাজনৈতিক সীমানাকে কখনো স্বীকার করে নিতে পারেনি (Vung, S. G. 1968)। মায়ানমারের উত্তরাংশের চীন, আরাকানী (চাকমা, মারমা ইত্যাদি), ভারতের মিজো ইত্যাদি জনগোষ্ঠীগুলো মূলতঃ একই নৃঃধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মায়ানমারের ঐ অঞ্চলের কারেন, কাচিন, শান জনগোষ্ঠী এবং ভারতের ULFA এবং অন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর কম্যুনিস্ট গেরিলা তৎপর রয়েছে। নাগা, লুসাই, মনিপুরী এবং আসামী সকল গেরিলাদের সাথে

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা শান্তিবাহিনীর একটি বড় অংশের সংযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনীর পূর্বসূরী জনসংহতি সমিতি মূলতঃ চীনপন্থি কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত একটি দল ছিল (Amin, 1988/89)। জানা গেছে,ভারতের উত্তর-পূর্বাংশের পার্বত্য অঞ্চল, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মায়ানমারের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশ নিয়ে স্থানীয় মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীসমূহ একটি বৃহৎ "কনফেডারেসী" ধরনের স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে চায় (Burman, 1983)। ভবিষ্যতের ঐ পরিকল্পিত স্বাধীন রাষ্ট্রটির আয়তন হবে সমস্ত বাংলাদেশের চেয়ে কয়েকগুণ বড়। ঐ রাষ্ট্রটির ভাবি রূপকাররাও সমুদ্র সংযোগ পথের প্রয়োজনে চট্টগ্রামের উপকূল রেখার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের বিভিন্ন আঞ্চলিক গেরিলা এবং কমিউনিস্ট গ্রুপসমূহের সাথে তাদের সংযোগ রয়েছে বলে জানা যায় (Sukhwal, 1971 and Burman, 1983) এবং বাস্তব ভূ-রাজনৈতিক তাগিদে দূরবর্তী চীন ঐ সকল কম্যুনিস্ট এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর সম্ভাবনাময় গুলোকে একত্রিত, সংগঠিত এবং প্রশিক্ষিত করে এদের তৎপরতার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে ধারণা করা যায়।

উপসংহার

ভূ-রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা কৌশলগত যে কোন দিকের বিবেচনায়ই ক্ষুদ্রায়তন এবং গরিব বিপুল জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত বাংলাদেশের জন্য স্বীয় এক-দশমাংশ সার্বভৌম এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের গুরুত্ব অপরিমেয়। ঠিক একইভাবে তাৎপর্যময় ভূ-রাজনৈতিক বা অবস্থানগত কারণে বিশ্বের দুই উদীয়মান শক্তি ভারত এবং চীনের কাছেও দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত এই পার্বত্য অঞ্চলটি নিজ নিজ ইপ্সিত বলয়ে প্রবেশের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নির্বাচিত প্রবেশদ্বার হিসাবে বিবেচ্য। অপরদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরোনো বসতি স্থাপনকারি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতীয়দের কিছুসংখ্যক লোক, বিশেষ করে চাকমাদের কিছু সদস্য, কিছু যৌক্তিক এবং বেশির অংশে অযৌক্তিক প্রেক্ষিতে এবং বহুলাংশে বাইরের স্বার্থান্বেষী শক্তির ইন্ধনে ঐ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদিতার এক আত্মঘাতী খেলায় মেতে উঠেছে। তারা বিগত এক দশকে বহিঃশক্তির সক্রিয় সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্ত পরিবেশকে করে

www.pathagar.com

রেখেছে দারুণ অশান্ত। 'শান্তিবাহিনী' নামক বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের চোরাগোপ্তা হামলায় এ পর্যন্ত শতাধিক অফিসারসহ প্রায় সহস্রাধিক সামরিক নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং বাংলাভাষী ও উপজাতীয়সহ মোট প্রায় তিন/সাড়ে তিন হাজার নিরীহ পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী প্রাণ হারিয়েছে। এখানকার এসব পরিস্থিতির কারণে অসংখ্য লোকালয় উজাড় হয়ে গেছে এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদের (বনজ সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি) ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিপুল জনশক্তি সমর্থিত, সুসংগঠিত, সুসজ্জিত এবং প্রশিক্ষিত শক্তিশালী বাংলাদেশি নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনীর প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপে এবং উৎপীড়িত অধিবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠীর ক্রুদ্ধ প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়ায় বিদেশি শক্তির সাহায্য-নির্ভর মুষ্টিমেয় স্বল্প জনসংখ্যা সমর্থিত চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এক অবধারিত পরাজয় ও সম্ভাব্য বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিপথগামী অভিমানী এসব পাহাড়িদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও করুণ পরিণতি কোন বাংলাদেশিরই কাম্য হতে পারে না। একই সাথে এসব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বা অযৌক্তিক দাবি-দাওয়াকে মোটেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাদের উপস্থাপিত দাবি-দাওয়ার মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধানের ধারাসমূহের সুস্পষ্ট লংঘন রয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন বা মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের সার্বিক পরিসমাপ্তি ঘোষিত হবে।

শুধু বাংলাদেশই নয়, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রশ্নে বিশ্বের যে কোন উদার বা প্রগতিবাদী রাষ্ট্র বলে যারা অনেকের কাছে স্বীকৃত, সেসব রাষ্ট্র অত্যন্ত আপোষহীন ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজতন্ত্রী চীন মাওবাদী নীতিকে অগ্রাহ্য করে সংখ্যালঘু তিব্বতী জনসংখ্যার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে দমানোর জন্য এবং তিব্বতকে চীনের সার্বভৌম অখণ্ড অংশ হিসাবে ধরে রাখার স্বার্থে বিরল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এবং ভিন জাতীয় এবং ভিন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত তিব্বতের ভৌগোলিক আয়তনের মধ্যে চীনের প্রধান জনগোষ্ঠী হুন জাতির (হুন জাতি চীনের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৪% ধারণ করে)বিপুল জনঅভিবাসন ও পুনর্বাসন ঘটায় (Pye, 1975)। চীনের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই পরিকল্পিত পুনঃ স্থাপন (Resettlement) বর্তমানে চীন থেকে তিব্বতের স্বাধীন বা আলাদা হয়ে যাবার সম্ভাবনাকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে (Tripura, 1992)। বর্তমানে তিব্বতে মূল তিব্বতীদের জনসংখ্যা চীনের মূল জনধারা

www.pathagar.com

হুনদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক একইভাবে কাশ্মিরের জম্মু অঞ্চলে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর থেকে কাশ্মিরিদের বিচ্ছিন্নতাবাদিতাকে প্রতিহত করতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে পরিচিত ভারত বিপুলসংখ্যক হিন্দু এবং শিখ জনসংখ্যাকে পুনঃস্থাপিত বা পুনর্বাসিত করে। এর ফলে এক সময়ের জম্মুর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা বর্তমানে একটি সংখ্যালঘু জনসংখ্যায় পরিণত হয়েছে (Shahabuddin, 1989)। বাংলাদেশের সাবেক দুইজন জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য সার্বভৌম অংশ জনবিরল পার্বত্য চট্টগ্রামে জনভারাক্রান্ত জেলাসমূহ থেকে বিপুল সমতলবাসী লোকের পুনঃস্থাপন ও পুনর্বাসন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত আন্তরিক হলেও অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও কয়েকটি রাষ্ট্র বিশেষ করে ইহুদী অর্থপুষ্ট কিছু তথাকথিত মানবাধিকার সংস্থাও বিশ্বব্যাপী প্রচুর হৈ-চৈ শুরু করে দেয় এবং তাদের এই অবৈধ হস্তক্ষেপ এখনো বলবৎ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ডেনমার্কভিত্তিক "International Work Group for Indigenous Affairs" ঠিক তেমনি এক বর্ণবাদী এবং ইহুদী অর্থপুষ্ট সংস্থা যা অত্যন্ত নগ্নভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যায় নাক গলিয়ে উদ্দেশ্যমূলক ও কল্পিত বানোয়াট মানবাধিকার লংঘনের রিপোর্ট তৈরি করে। ধারণা করা হয় যে, এদের প্রকাশিত বাংলাদেশ বিরোধী এসব রিপোর্টের পেছনে হয়ত ভারত-ইসরাইল আঁতাতের গোপন সম্পর্ক রয়েছে (May, 1984)। বাংলাদেশের নিজ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম অঞ্চলের অখণ্ডতা রক্ষার যুক্তিসঙ্গত উদ্যোগের প্রখর সমালোচনা করলেও এসব সংস্থা এবং সাবেক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো প্যালেস্টাইন, বসনিয়া, কসোভো এবং কাশ্মিরের মুসলিম জনসাধারণের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে এমনকি ঐসব অঞ্চলে অমুসলিম দখলদার শক্তির চরম অত্যাচার ও মানবাধিকারের চরম অমর্যাদায়ও সম্পূর্ণ নীরব। এদের তৎপরতার এই বৈষম্য থেকেই তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তির এসব সংস্থাসমূহ পুরোপুরি অবহিত আছে যে, তাদের পূর্ব পুরুষরাই অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড এবং বিশ্বের আরো অনেক জায়গার মূল আদিবাসী (Aboriginal People) দেরকে চরম নৃশংসভাবে হত্যা করে কিংবা ধ্বংস করে দিয়ে নিজেরা ঐসব মহাদেশ ও অঞ্চলের নিয়ন্তা হিসাবে জেঁকে বসেছে। আর ঐসব স্থানের মূল বাসিন্দারা 'নিজগৃহে পরবাসী'র মত অপেক্ষাকৃত অনুন্নত

www.pathagar.com

দুর্গম ও অনুর্বর অঞ্চলে জবর দখলকারিদের দ্বারা বরাদ্দকৃত 'রিজার্ভ' বা সংরক্ষিত উপজাতীয় অঞ্চলে চরম দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে এখনো ধুঁকে ধুঁকে মরছে (যেমনঃ যুক্তরাষ্ট্রের রেড-ইন্ডিয়ান, নিউজিল্যান্ডের মাউরি)।

বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ মনে করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এখানে বসবাসরত নতুন এবং পুরাতন সকল অধিবাসীই বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রশ্নে সারা জাতি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে এখানে বসবাসরত সকল জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠীর লোকদের সকল বৈধ এবং ন্যায্য দাবি-দাওয়া অবশ্যই পূরণ করতে হবে। ষাটের দশকে কর্ণফুলী জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সময় কাপ্তাই হ্রদের গ্রামে স্থানীয় উপজাতীয় বা অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ যথাসম্ভব এখনো পূরণ করে দিতে হবে। সাথে সাথে স্থানীয় ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাদের সার্বিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য উদার ও মানবিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শুধুমাত্র ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে কোনরূপ বৈষম্যই চলতে দেয়া যাবে না। এবং যে কোন তরফ থেকে এ ধরনের অযৌক্তিক দাবি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য যে কোন স্থানে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের উপজাতীয় কিংবা অ-উপজাতীয় সবার সমান সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে দুর্বল করে এমন যে কোন তৎপরতাকে মোকাবিলা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিহত করতে হবে। দেশের এক-দশমাংশ অঞ্চলের সার্বভৌমত্বের উপর সরাসরি আক্রমণকারি সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতাকে 'সামাজিক অসন্তোষ' বলে তাকে নিতান্ত হালকা করে দেখে 'রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা' করার সকল উদ্যোগই সমস্ত দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত বাস্তব কারণে একান্ত পলায়নবাদী ও আত্মঘাতী পদক্ষেপ বলে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিকে সম্পূর্ণরূপে অবহিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্বাধীন বাংলাদেশের যে কোন সার্বভৌম এলাকার প্রকৃত মালিক সারা জাতি– কোন একক গোষ্ঠী বা কোন বর্ণ ধর্মের একার হতে পারে না। দেশের বারো কোটি মানুষ দেশের যে কোন অংশের যে কোন ধরনের অঙ্গহানির কারণকে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিহত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

www.pathagar.com

রচনাপঞ্জি

Administrative Map of Bangladesh, 1992, Graphosman, Dhaka.

Ahmed, N. 1958, "The Evolution of the Boundaries of East Pakistan", *Oriental Geographer*, Vol II, No. 4, Dhaka.

Ahmed, R. 1990, "Krantikale Parbattya Chattagramer Janagushthhi : Ekti Parjalochana", *Journal of Anthropology (in Bengali)*, Jahangir Nagar University, Dhaka, PP. 58-75.

Alam, S.M. and Akhtar, R. 1990, "Problem of Ethnic Identity and national Integration : A case story, from Chittagong Hill Tracts of Bangladesh", *The Jahangirnagar Review*, Vol. XIII and XIV, Part-2 Dhaka.

Amin, M.N. 1988/89, "Secessionist Movement in the Chittagong Hill Tracts", *Regional Studies*, Vol. VII, No. 1, Islamabad.

Bernot, L. 1960, "Ethnic Groups of Chittagong Hill tracts", in Pierre Bessaignet (ed.) *Social Research in East Pakistan*, Asiatic Society of Pakistan, Publication No. 5, Dhaka.

Bindra, S.S. 1982, *Indo-Bangladesh Relations*, Deep and Deep Publications, New Delhi.

Braner, M. (ed.) 1988, *Atlas of the Middle-East*, Mac-Millan Publishing Company, New York.

Barman, D.C. 1983, "Regionalism in Bangladesh : The Study of Chittagong Hill Tracts", *Regionalism in South Asia*, (ed. by Rana Kant), Asia Studies Centre, Aalekh Publishers, Jaipur, PP. 116-137.

Chatterjee, S.P. 1947, "The Partition of Bengal : A Monograph", *Calentta Geographical Society Publication*, No. 8, Calcutta University, Calcutta.

Mankel, W. 1980, Israel Observed : An Anotomy of the State, London.

www.pathagar.com

Gordon, D.C. 1980, Lebanon : *The Fragmented Nation*, London

G.O.B. 1974, *Chittagong Hill Tracts District Gazetteer*, Government of Bangladesh, Dhaka, P. 125.

G.O.B. 1986, *Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, Ministry of Law and Justice, Dhaka.

Hossain, A. 1989, *"Geopolities and Bangladesh Foreign Policy"*, C.L.I.O. Journal, Dhaka.

Hossain, S.A. 1990, "Shanti-Ashantir Dolachale Parbattya Chattagram", *Weekly Bichitra*, Vol. 26, 1990, Dhaka.

Hossain, S.A. 1991, "Religion and Ethnicity in Bangladesh Politics", *The B.I.I.S.S. Journal,*, Vol XII, No. 4, Dhaka.

Hutchinson, R.H.S. 1906 *An Account of the Chittagong Hill Tracts*, Calcutta.

Jaffa, J. 1989, "Chakmas : Victims of Colonialism and Ethno-Centric Nationalism", *The Mainstream*, (Oct. 28, 1989), New Delhi, P. 107.

Johnson, B.L.C. and Ahmed, N. 1959, "The Karnafuli Project : Georgraphical Record", *Oriental Geographer*, Vo. I, No. 1 (July), Dhaka.

Karim, P.P. 1953, "Indo-Pakistan Boundaries", *The Indian Geographical Journal*, Vol. 4, No. 1.

Khan, F.K. and Khisha, A.L., 1970, "Shifting Cultivation in East Pakistan", *Oriental Geographer*, Vol. 14, Dhaka, PP. 22-44.

Khisha, A.L. 1966, Shifting Cultivation in Chittagong Hill Tracts ((Un-Published M.A. Thesis), Department of Geography, Dhaka University.

Kdikara, S. 1979, "Strategic Factors in Inter-State Relations in South Asia", *Canberra Papers on Strategy and Defence*, No. 19, Canberra.

www.pathagar.com

Mark Bides; K.C. 1977, *The Rise and Fall of the Cyprus Republic*, London.

May, W. (ed.), 1984, "Genocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh", Document no. 51, *International Work Group of Indigenous Affairs*, Copenhagen.

Montu, K. 1981, "Tribul Insergency in Chittagon Hill Tracts", Economic and Political Weekly.

P.R.P.C. (B.B.S.), 1991, "Preliminary Report of Population Census of Bangladesh", Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka.

Pye, L.W. 1975, "China : Ethnic Minorities and National Security", in N. Glazer and D.P. Moynihan (ed.) *Ethnicity : Theory and Experience*, Harvard University Press Cambridge.

Rahman, M. 1976, "Geographical Analysis of Bangladesh Boundaries" *B.N.G.A. Journal*, Vol. 4, No. 1, J.N.U., Dhaka, PP. 31—51.

Rahman, M. 1990, "The Problems Behind the National Consensus" (in Bengali), *B.I.I.S.S.* Papers-12, Bangladesh Institute of International and Strategic Studies,Dhaka, P. 39.

Risleg, H.H. 1891, *The Tribes and Castes of Bengal (Vo.* 1), Calcutta, P. 118.

Rob, M.A. 1989, "Changing Role of the Shifting Cultivation in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, Abstracts of the Papers, *International Seminar on the Role of Agriculture in the Economic Development of Third World Countries*, A.M.W.G.S., Aligarh (2-7 Sept. 1989), India.

Rob, M. A. 1991, "Resource Potentials and Geopolitical Significance of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh", Seminar Paper Presented at A.M.U.G.S., (Sept. 1991), Aligarh, India.

www.pathagar.com

Roy, D. 1992, "The Tennral Problems of the Chittagong Hill Tracts" (in Bengali), *The Daily Sangbad*, (15th July, 1992), Dhaka.

Shahabuddin, S. 1989, "Repression onthe Muslims of Kashmir : An Untold Story", *Muslim India*, Vol. XXII, New Delhi.

Shelley, M.R. (ed) 1992, The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : The Untold Story, Centre for Development Research, Dhaka.

Subrahmanyam, K. 1983, "India" Securities in Eighties", *Strategic Analysis*, Vol. 7, No. 6 (September, 1983),

Sukhwal, Bh. 1971, *India : A Political Geography*, Allied Publishers, Bombay, PP. 219-223.

Susha, B.B. 1977, "Indo-Bangladesh Maritime Boundary Issue", Strategic Analysis----------?

Tyeb, A. 1966, *Pakistan : A Political Geography*, The Oxford University Press, London.

Tripura, P. 1992, "The Colonies Strike Back : Tribal Ethnicity and Modern State Building in South Asia", Paper Presented at the *National Seminar on Bangladesh and SAARC Issues, Perspectives and Outlooks*, B.I.I.S.S. and I.R. Department, D.U. (23-24 August, 1984), Dhaka.

The Daily Sangram 1993, "Prospect of Mineral Resources in Chittagong Hill Tracts" (In sengali) News Paper Report Published on 24th Oct. 1993, Dhaka. PP. 3-4.

Vung, S.G. 1968, "Frntier of Freedom", Far-Easttern Economic Review, Vol. XLI, No. 33 (August 15), P. 318.

Wadia, D.N. 1953, *Geology of India*, McMillan and Company, London. ❑

www.pathagar.com

৬

সার্ক বনাম উপ-আঞ্চলিক জোট ঃ ভূ-রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের নতুন মাত্রা

ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলের অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান জুড়ে অবস্থিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ তার সিকি শতাব্দীর অস্তিত্বের মধ্যে বর্তমানে এক অতীব সংকটময় ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে এবং আগামি এক-দেড় বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও জাতির ভাগ্যের চূড়ান্ত ফয়সালা সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের এ নীতি নির্ধারণী চূড়ান্ত খেলায় আজ তার বৃহত্তর পররাজ্যলোভী আগ্রাসী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত- যে এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সহযোগিতার দাবিদার হিসাবে পরিচয়দান করে থাকে- সেই আঞ্চলিক শক্তিধর রাষ্ট্রটি যেন মরিয়া হয়ে ওঠা উদ্যোগে মাঠে নেমেছে। আর ভারতের এই আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী আগ্রাসী খেলায় তার সঙ্গে সহযোগিতায় রয়েছে বিশ্বের 'এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা'র প্রবক্তা ও 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি'র ধারক-বাহক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পাশ্চাত্যের মিত্রশক্তিসমূহ। একুশ বছর পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার মাত্র ছয়-সাত মাসের মধ্যেই ভারত বাংলাদেশের উপর তার ভূ-রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পাকাপোক্ত ও চিরস্থায়ী করার এক সুদূর প্রসারী বাসনায় সাত-আটটি ভয়াবহ চুক্তিরূপী চাণক্য-চক্রান্ত চাপিয়ে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব 'গোলামি চুক্তি'সমূহের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি পানিচুক্তি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ট্রানজিট চুক্তি, চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে ভারতের মালামাল (অস্ত্রপাতি?) পরিবহন চুক্তি, এশিয়ান হাইওয়ে বাস্তবায়নের নামে আসামসহ 'সাতবোন' রাজ্যসমূহে যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশের ওপর দিয়ে অবাধ যাতায়াতের চক্রান্ত বাস্তবায়ন, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রফতানি চুক্তি

www.pathagar.com

এবং সবশেষে 'উপ-আঞ্চলিক জোট' গঠনের মৃত্যু-শীতল ভয়াবহ চুক্তি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর এত তড়িঘড়ি করে এতগুলো চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ ও সেগুলোর যুগপৎ বাস্তবায়নের তোড়জোড়ের পেছনে এশিয়ার অন্যতম আঞ্চলিক শক্তি ও পারমাণবিক মারণাস্ত্র সমৃদ্ধ সিকিমগ্রাসী আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র ভারতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আর মাত্র ক'দিন পরেই (মার্চ ১৯, ১৯৯৭) 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি'র মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই যাতে করে আবার ঐ একই ধরনের তথাকথিত মৈত্রীচুক্তির মত স্বীয় (ভারতের) স্বার্থ সংরক্ষণকারি ও আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী মনোবাঞ্ছা বাস্তবায়নকারি ধারাযুক্ত অনেকগুলো নতুন চুক্তি সম্পাদন করা এবং এসব বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভারতিয় নেতা নেহেরু, প্যাটেল, গোপালাচারী, ইন্দিরা-বাজপেয়ী আর অন্যান্য 'অখণ্ড-ভারত'-এর স্বপ্নদ্রষ্টাদের শত বছরের লালিত স্বপ্ন 'আসমুদ্র-হিমাচল' ব্যাপী বিস্তৃত 'পশ্চিমে ইরান-আফগানিস্তান থেকে নিয়ে পূর্বে মায়ানমার এবং উত্তরে তিব্বত-নেপাল ভুটান ও হিমালয় থেকে নিয়ে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত শ্রীলংকা, মালদ্বীপ এমনকি মালয়-সিঙ্গাপুর-সুমাত্রা-ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিপুলায়তন ভূ-ভাগ ও সমুদ্র সীমানার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে এক মহারাজ্য গঠন করে বিশ্বে নতুন মহাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা। আর এ দুঃসাধ্য স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রাথমিক ধাপ হিসাবে হিমালয় পাদদেশীয় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য 'সিকিম'কে ১৯৭৪ সনে চিরতরে দখল করে নেয় ভারত তার স্থানীয় সিকিমী 'কুইসলিং' বা 'মীরজাফররূপী লেন্দুপ দোর্জীদের সহযোগিতায়। হিমালয় কন্যা নেপাল ও ভুটানকেও ভারত নানা চাণক্য-চুক্তিতে বেঁধে বর্তমানে প্রায় অর্ধ হজম করে নিয়েছে। ঐ রাষ্ট্র দু'টিরই প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও অর্থনীতি প্রায় পুরোপুরিই ভারত-নির্ভর হয়ে পড়েছে এবং ক্রমেই জাতিদ্বয়ের স্বকীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উপমহাদেশের অন্য দু'টি রাষ্ট্র ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ শ্রীলংকা ও ক্ষুদে মালদ্বীপও রয়েছে ভারতের নানা ষড়যন্ত্র ও হুমকির মুখে। শুধুমাত্র বিপুল জনসংখ্যায় সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শক্তিতে বলিয়ান পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রাণপণে প্রতিহত করে চলেছে ভারতের সকল আগ্রাসী চক্রান্তকে।

ভারতের এসব আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদী তৎপরতার মূলে রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে বহুল পরিচিত *'ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন' বা ইন্দিরা ডক্ট্রিন*

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের এক সুপরিসর গভীর তৎপরতা বা চক্রান্ত। ভারতের দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক নেহেরু ও কন্যা ইন্দিরার উচ্চাভিলাষী ইন্ডিয়া ডক্ট্রিনকে কোন কোন ভূ-রাজনীতিবিদ 'বর্ধিত সীমান্ত মতবাদ' বা Extended Frontier Concept বলেও চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে এ মতবাদ অনেকটা মার্কিন 'মনরো ডক্ট্রিন'-এর মত। ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন-এর মূল কথা হচ্ছে 'উপমহাদেশে ভারতই হবে মূল শক্তি, চালক বা নীতিনির্ধারক। এখানে অন্য কোনো দেশই স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত নীতিনির্ধারণ করবে না বা অন্য কোন বহিঃশক্তি উপ-মহাদেশের কোন রাষ্ট্রকেই ভারতের মতামত ছাড়া কোন বিষয়েই সাহায্য সহযোগিতা বা চুক্তিভুক্ত করতে পারবে না। স্থানীয় সকল দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রকেই ভারতের মর্জিমাফিক চলতে হবে'। আর 'Extended Frontier Concept' অনুযায়ী 'ভারতের ঐ ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন' বাস্তবায়নের জন্য ভারত তার রাষ্ট্রের কেন্দ্রভূমিকে সুরক্ষিত করার জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ যেমন-আফগানিস্তান, তিব্বত, মায়ানমার, সিঙ্গাপুর, মালয় প্রভৃতি দূরবর্তী সীমান্ত রাষ্ট্রসমূহকেও দখল বা প্রভাববলয়ভুক্ত করে নিজ রাষ্ট্রের বহিঃসীমাকে প্রবর্তিত করে দেবে'....। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঐ Extended Frontier Policy গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৭-এ ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানের সৃষ্টি হলে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক (Geo-political situation) পরিস্থিতিতে ভারত সাময়িকভাবে ঐ Extended Frontier Policy ত্যাগ করলেও পরবর্তীতে ভিন্ন আঙ্গিকে ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন বা ইন্দিরা ডক্ট্রিন নামে একই ভারতিয় আধিপত্যবাদী পন্থা ও কৌশল গ্রহণ করে। আর ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঐ একই নীতি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার কৌশল গ্রহণ করে। কিন্তু স্বাধীনচেতা বাংলাদেশিদের তৎপরতা খুব দ্রুত ও সহজেই ভারতের ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অপচেষ্টাকে রুখে দেয়। তাছাড়া মুসলিম পাকিস্তান, বুদ্ধ শ্রীলংকা ও স্বাধীনচেতা, যোদ্ধা জাতি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠিভুক্ত নেপালও ভারতের ঐ আধিপত্যবাদী মনোভাবকে বরদাশত করতে পারলো না এবং তাদের ঐ মনোভাবের স্ফূরণ ঘটলো উপমহাদেশে ভারতের একক আধিপত্যবাদী তৎপরতাকে নস্যাৎ করে দেবার জন্য এবং সম্মিলিতভাবে উপমহাদেশের সাতটি শরিক ছোট-বড় রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সার্ক (SAARC) নামক এক সহযোগিতামূলক জোট গঠনের মাধ্যমে। সার্ক বা South Asian

www.pathagar.com

Association for Regional Co-operation নামক আঞ্চলিক জোটটি ১৯৮০ সালে রূপলাভ করে এবং উপ-মহাদেশের সাতটি রাষ্ট্রসমূহের নানাবিধ আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানে ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পারস্পরিক সহযোগিতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক দারুণ আশার সঞ্চার করে। কিন্তু ঐ দশকেই সার্ক-এর দ্বিতীয় বৃহত্তর ও শক্তিধর শরিক পাকিস্তান সামরিক শক্তি (পারমাণবিক), আর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি ও শিল্পায়ন-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জন করলে এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ নানা গোলযোগ বিশেষ করে পাঞ্জাবের শিখদের 'স্বাধীন খালিস্তান' আন্দোলন, কাশ্মিরের মুসলমানদের মরণপণ আজাদির সংগ্রাম এবং ভারতের নানা স্থানের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার শত শত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাবরী মসজিদ ধ্বংস ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। পাকিস্তান কাশ্মির দাবিতে ক্রমেই শক্ত মনোভাব দেখাতে থাকে এবং ভারত স্বীয় প্রায় সকল অন্তর্ঘাত ও সংঘাতের সাথে পাকিস্তানকে জড়াতে থাকে। অন্যদিকে ঐসময়ই ভারত বাংলাদেশের সাথেও নানা সীমানা সংক্রান্ত ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ফারাক্কা বাঁধের সাহায্যে ভারত বাংলাদেশের ন্যায্য গঙ্গার পানির হিস্যা মেরে দেয়। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমাভুক্ত সার্বভৌম অঞ্চল দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ জোর করে দখল করে নেয়। বেরুবাড়ি দখলে নিয়ে বদলে ৩ বিঘা করিডোরের দখল না দেয়া, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি, মুহুরীরচর জবরদখল করা, 'পুশব্যাক' নামক অমানবিক উদ্যোগসহ অজস্র আগ্রাসী অপতৎপরতার মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক নিম্নতর পর্যায়ে নেমে আসে। শ্রীলংকার হিন্দু তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্ত্র, আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দিয়ে বিচ্ছিন্নতায় মদদ দান করে ভারত বৌদ্ধ শ্রীলংকার সাথেও বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ভূ-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র প্রতিবেশী শান্তিপ্রিয় নেপালের স্থল-বাণিজ্যের জন্য বহিঃসংযোগ পথ কলকাতা বন্দর নেপালের জন্য বন্ধ করে দিয়ে ভারত নেপালকেও এক চরম অসহায়ত্বের মধ্যে ফেলে দেয়–ফলে শান্তিপ্রিয় নেপালিরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ভারতের বিরুদ্ধে। এভাবে সার্কের প্রায় সবক'টি সদস্য রাষ্ট্রকেই ভারত নানাভাবে হুমকির মধ্যে ফেলে দেয়–ফলে অনেক আশা-ভরসায় গড়ে ওঠা এ সহযোগিতামূলক জোটটি অচিরেই ভারতের জন্যই অকার্যকর হয়ে ওঠে এবং এর তৎপরতা শুধুমাত্র নানা সম্মেলন, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও চুক্তি আর মাঝে-মধ্যে 'সাফ গেমস' (SAF Games) অনুষ্ঠানের

www.pathagar.com

মধ্যেই বন্দি হয়ে পড়ে এবং এর মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে সার্কের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার জন্য ভারত তার নামেমাত্র স্বাধীন মুমূর্ষু দুই ক্ষুদ্র প্রতিবেশী নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে বাংলাদেশকে কব্জা করার নিমিত্তে নতুন চাণক্য চাল 'উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক জোট' বা 'Sub-Regional Co-operation Block' গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার পরিবর্তিত রূপায়ণ হচ্ছে ১৯৯৭-এর শেষাংশে স্বাক্ষরিত "বিসটেক" নামক এক ষড়যন্ত্রের বিষফোঁড়া।

কী এই উপ-আঞ্চলিক জোট

ভারত অতি সাম্প্রতিক নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশকে নিয়ে তার উত্তর-পূর্বাংশে একটি 'সহযোগিতামূলক জোট' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে এবং ঐ তিনটি রাষ্ট্রের বর্তমানের ভারতের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন সরকারসমূহও ভারতের ঐ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে। এই নতুন প্রস্তাবিত জোটটি উপমহাদেশে বিরাজমান ও এখন পর্যন্ত কার্যক্ষম সার্ক নামক জোটের ভেতরকার কয়েকটি রাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত হতে যাচ্ছে বলে জোটটিকে একটি 'উপ-আঞ্চলিক জোট' হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। আসলে এ নতুন প্রস্তাবনাকে একটি সহযোগিতামূলক উন্নয়নধর্মী জোট বলে উল্লেখ করা হলেও মূলতঃ এটি যে সার্কের মোকাবেলায় বা বদলে একটি নতুন ভারতিয় আধিপত্যমূলক অঞ্চল বা 'প্রভাব বলয়' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তা সহজেই অনুধাবন করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট, এশিয়ান হাইওয়ে, বিদ্যুৎ রফতানি চুক্তি ও উলফা ও অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় স্বাধীনতাকামী গেরিলা দমনের জন্য যৌথ অপারেশন চুক্তি সবই মূলত একই সূত্রে গাঁথা ঐ 'ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন' বাস্তবায়নেরই রূপরেখাভুক্ত বিষয়। আর এই চার দেশিয় 'উপ-আঞ্চলিক জোট' এতদাঞ্চলে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক-বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণও নিশ্চিত করার এক চূড়ান্ত পদক্ষেপ।

ভারতের 'ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন' বা 'ইন্দিরা ডক্ট্রিন' নামক নীতি বা মতবাদকে রূপায়ণের জন্য ভারতের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও গবেষক ভবানী সেনগুপ্ত, ইন্দর মালহোত্রা, জয়ন্ত রায়, সুব্রাহ্মনিয়াম, কান্তি বাজপেয়ীসহ অসংখ্য পণ্ডিত ও কৌশলবিদগণ অনেক ভেবে-চিন্তে বহু বছরের সাধনার পর এই 'উপ-আঞ্চলিক জোট' বা 'Sub-Regional Block/Group'-এর কাঠামো দাঁড় করান।

www.pathagar.com

ট্রানজিট, এশিয়ান হাইওয়ে, মহাকালি পানিচুক্তি, ফারাক্কা/গঙ্গা পানি চুক্তি, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার চুক্তিসহ অন্যান্য সমস্ত সাম্প্রতিক প্রস্তাবনাই ঐ মূল উপ-আঞ্চলিক জোটের একেকটি বিষয় বা Components।

এ 'উপ-আঞ্চলিক জোট' সাধারণ হিসাবে একটি নিতান্ত সহযোগিতামূলক চুক্তি হিসাবে প্রতিভাত হলেও এর বাস্তবায়নের মধ্যে প্রথমেই সার্কের বিলুপ্তি ও ক্রমে চুক্তিভুক্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রত্রয়ের (বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং সিকিমের মত নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ নামে ভারতের তিনটি নতুন প্রদেশের সৃষ্টি হবে। এবং এর ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন ভারত তার বহু দিনের লালিত অখণ্ড ভারত-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে অন্যদিকে সে সহজেই তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতবোন রাজ্যমালার স্বাধীনতাকামী বেয়াড়া জাতিগোষ্ঠীগুলোর বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করে তার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে ভারত এ 'উপ-আঞ্চলিক জোট' গঠনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এশিয়ায় তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর চীনকে মোকাবেলায় বাংলাদেশের ভূমিজ পরিসরকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। তাছাড়া 'ASEAN' জোটের সাথে বাণিজ্যিক ও ভূ-কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ বাংলাদেশকে একটি 'পা রাখার জায়গা' (Foot Stand) হিসাবেও ব্যবহার করা ভারতের জন্য খুবই জরুরি ও অপরিহার্য। আর মূলত ভারত বাংলাদেশকে 'উপ-আঞ্চলিক জোটভুক্ত' করে চীনের সাথে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সমরে একটি পশ্চাৎভূমি এবং আসিয়ান (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান জোট)-এর সাথে বাণিজ্যিক ও ভূ-কৌশলগত সংযোগে একটি 'ফুট স্ট্যান্ড' বা কৌশলগত সেতু' (Strategic Bridge) হিসাবেই ব্যবহার করতে চায়। ভারতের এই সামরিক, কৌশলগত ও আর্থিক-বাণিজ্যিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এ 'উপ-আঞ্চলিক জোটে'র অন্যতম রূপকার ভারতিয় গোয়েন্দা সংস্থা 'R.A.W'র কর্মকর্তা ও নয়াদিল্লীস্থ ভারতিয় কৌশল গবেষণা কেন্দ্র 'Crntre For Policy Research'-এর গবেষক অধ্যাপক ভবানী সেনগুপ্তের গবেষণাপত্র 'Co-operative Development and Security in South Asia ঃ Towards Twenty First Century'-এর ছত্রে ছত্রে। (Sengupta, BIISS Seminar, 6-8 Feb.,1994)। তাছাড়া খুব সাম্প্রতিক এ উপজোট গঠনের সংবাদ প্রচারের প্রায় সাথে সাথেই ভারতের

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী শ্রী দেবগৌড়ার বাংলাদেশ সফর (জানুয়ারি ১৯৯৭)কালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনাকালে আসামসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলা দমনে দু'দেশিয় যৌথ অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত প্রস্তাবনায় ভারতের নতুন উপজোট গঠনের মূল উদ্দেশ্যের খানিকটা পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতের প্রভাবপুষ্ট এই আধিপত্যবাদী 'উপজোট' তৈরি হলে সার্কের কেবলমাত্র মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তান ও ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্র মালদ্বীপ এবং বৌদ্ধ দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকা এ তিনটি রাষ্ট্র বাদ পড়বে উপমহাদেশের সকল উন্নয়ন তৎপরতা ও সহযোগিতা থেকে। আর ভারত অনেক ভেবে-চিন্তেই এ কাজটি করছে। কারণ সার্কের এ তিনটি দেশের সাথে মুসলিম বাংলাদেশ যুক্ত হয়ে সব সময়ই সার্কের যাবতীয় সিদ্ধান্তে ভারতের কোনই আধিপত্যবাদী স্বার্থ বা মতলববাজিকে বাস্তবায়িত করতে দিত না। ফলে ভারত সার্কের সাতটি ভোটের ৪/৩ হিসাবে সবসময়ই পরাজিত হত। তাছাড়া মাঝে-মধ্যেই নেপালও বেঁকে বসেছে। তাই বিগ-ব্রাদার ভারতের জন্য নিতান্ত 'গুড়ে বালি' সার্ক জোটটিকে ভাঙ্গা ছাড়া নিজ মাতব্বরী ফলানোর আর কোন পথই খোলা ছিল না। এ জন্যই সে বেছে নিয়েছে 'চার' সংখ্যার আর একটি উপজোট যা জোটের ভিতরে হবে এক উপজোট এবং এ উপজোটই মৃত্যু ঘটাবে মূল বৃহত্তর জোট সার্ক-এর।

কেন এ জোট মানা যায় না

বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার জন্যই এ 'উপ-আঞ্চলিক জোট'। তাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে রক্ষা ও এদেশের উপর ভারতের আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদকে প্রতিহত করার জন্যই কোনক্রমে ভারতের 'ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন'-এর উপজাত উপ-আঞ্চলিক জোটের বাস্তবায়ন মেনে নেয়া যায় না এবং মেনে নিলে তা হবে নিতান্ত আত্মহত্যারই শামিল। এদেশের আপামর জনসাধারণ এ চক্রান্তসহ ট্রানজিট, এশিয়ান হাইওয়ে, চট্টগ্রাম বন্দর সংক্রান্ত সকল চুক্তিরূপী চানক্য-চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ সকল জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ঐক্য জোট ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ সকল মহল প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে ভারতের এসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

www.pathagar.com

দেশের ভেতরকার মুষ্টিমেয় যে ক'জন মুখচেনা এ 'উপ-আঞ্চলিক জোট' বা ট্রানজিটের পক্ষে ওকালতি করছেন, তারা বলছেন যে পৃথিবীতে নাকি আরও 'উপ-আঞ্চলিক জোট' রয়েছে, ট্রানজিট চলছে। সুতরাং আমাদের স্বার্থেই নাকি বন্ধুপ্রতীম ভারতকে ট্রানজিট, বন্দর, গ্যাস প্রদান কর্তব্য; চট্টগ্রাম বন্দরে ভারতের অধিকার রয়েছে; এবং 'উপ-আঞ্চলিক জোট' করাসহ দরকার হলে রাষ্ট্রীয় সীমানাও তুলে দেয়া প্রয়োজন ইত্যাদি। এসব আত্মবিক্রিত মহল ও স্বার্থজীবীগণ বিশ্বের অন্যান্য নানা 'উপ-আঞ্চলিক জোটে'র উদাহরণ দিতে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আসিয়ান জোটে 'ম্যাকং ডেল্টা সাব রিজিয়ন', 'মালয়-সিঙ্গাপুর সাব-রিজিয়ন', ইউরোপীয় জোটের মধ্যকার 'বেণোলুক্স সাব-রিজিয়ন' ইত্যাদি উদাহরণ তুলে ধরছেন। আসলে তাদের এসব উদাহরণের সাথে সার্কের মধ্যে এ নতুন যে উপজোটের কথা বলা হচ্ছে তার কোনই তুলনা চলে না। কারণ ঐসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বা মহল বিশেষের অঞ্চল, জোট বা উপজোট এবং আঞ্চলিক অর্থনীতি বা ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে হয় কোনই জ্ঞান নেই নতুবা তারা জেনে-বুঝেই ভারতের ঐ কূট চাণক্য চালের চামচা সেজেছেন নিতান্ত মীরজাফরী স্বার্থেই। ভৌগোলিক জ্ঞানের আওতায় 'প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক' দিক দিয়ে সমস্বত্ব ভৌগোলিক পরিসরকেই অঞ্চল বলা হয় (A region can be defined as a homogeneous area with physical and cultural characteristics distinct from those of neighbouring areas) । আর আঞ্চলিক জোট গড়ে ওঠে সাধারণত ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন (অবশ্য সব সময় এ বিষয় সত্য হয় না) এবং প্রাকৃতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমস্বত্ব অঞ্চলে অবস্থিতি পারস্পরিক স্বার্থে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে। উপরন্তু এই জোট সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা জাতিসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত সংযুক্তি (Voluntary Association) দ্বারা বাস্তবায়িত হয়- নিজ স্বার্থ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহযোগিতার উদ্দেশ্যেই। এ জোট বাঁধার ক্ষেত্রে কোন জোরজবরদস্তি বা কূটকৌশল খাটানো উচিত নয়। তবু প্রায়শ এসব জোট বাঁধার পেছনে পরাশক্তির হস্তক্ষেপ, ভূ-রাজনৈতিক অভিপ্রায় ও শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য কাজ করে থাকে। বিশ্বের নানা আঞ্চলিক জোট গঠনের পেছনে যেসব নিয়ামক কাজ করে থাকে সেগুলো হচ্ছে ঃ ভৌগোলিক, সামরিক ও কৌশলগত, রাজনৈতিক, আদর্শিক, জাতিতাত্ত্বিক, আর্থনীতিক এবং লেনদেন সংযুক্ত সংক্রান্ত

www.pathagar.com

OIC (ইসলামিক ঐক্য জোট) একটি আদর্শিক জোট, ইকো, আসিয়ান, সার্ক ইত্যাদি ভৌগোলিক জোট এবং এ্যাপেক, আসিয়ান, সাপ্টা, ইসি, একই সাথে আর্থনীতিক ও আঞ্চলিক জোটও বটে। 'ম্যাকং ডেল্টা সাব-রিজিয়ন' বা মালয় সাব-রিজিয়ন ছিল মূলত ভৌগোলিক, আর্থনীতিক ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক এবং পরীক্ষামূলক উপজোট। চীনা প্রধান সিঙ্গাপুর ও মালয়ী মুসলিম প্রধান মালয়েশীয়দের অসমস্বত্বতার কারণে বর্তমানে এ জোটটি কার্যত অনুপস্থিত ও অস্তিত্বহীন। 'ম্যাকং ডেল্টা সাব-রিজিয়ন' জোটটি প্রধানত একটি অববাহিকা উন্নয়নমূলক আঞ্চলিক পানি বণ্টন ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক একটি উপজোট যা সমস্বত্ব জাতিতাত্ত্বিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক মঙ্গোলীয়-বৌদ্ধ জাতি-ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত সমান জলবায়ু ও ভৌগোলিক অঞ্চলের উন্নয়নে গড়ে ওঠে। ঠিক একইভাবে আরবভাষী, মুসলিম ও প্রায় একই সমান ধনী আরব উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সামরিক ও আর্থনীতিক জোট 'গালফ-এরাব সাব রিজিয়ন'। 'বেনোলুক্স উপজোটটি ইউরোপের বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ডের সমন্বয়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় গড়ে ওঠা একটি ইউরোপীয় উপ-আঞ্চলিক জোট। ঐ উপ-জোটটিও সমস্বত্ব খ্রিস্টান ও এ্যাংলো-সাক্সান নৃ-তাত্ত্বিক ও ধর্মতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে প্রায় সমান আর্থনীতিক অবস্থাসম্পন্ন তিনটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উপ-আঞ্চলিক জোট। উল্লেখ্য, ঐ সকল উপ-জোটে কোনই অস্বাভাবিকভাবে বড়, বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত, ধনী বা সামরিকভাবে অসমশক্তির সদস্য রাষ্ট্রের উপস্থিতি নেই। উপ-জোটসমূহের সদস্যদের মধ্যে শক্তি, সামর্থ্য ও প্রভাবের প্রায় সমতা বিরাজিত দেখা যায়। কিন্তু ভারতের প্রস্তাবিত নতুন দক্ষিণ এশীয় উপ-জোটের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র নেপাল ও ভারতের মধ্যকার ধর্মীয় সমতা ছাড়া আর কোন বিষয়েই মিল বা সমস্বত্বতা দেখা যায় না। ভারত একাই এই উপ-জোটের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫% ভাগ, সামরিক শক্তির প্রায় ৯৬%, অর্থনীতির প্রায় ৯৫% এবং পারিসরিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রায় ৯২% ভাগ জুড়ে রয়েছে। বাংলাভাষী মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত ক্ষুদ্রাকৃতির বাংলাদেশ, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভুটিয়া ও লেপচা ভাষী ভুটান এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেপালি ও গোর্খাভাষী মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী সম্পন্ন ক্ষুদ্রাকৃতির পার্বত্য রাষ্ট্র নেপালের বিপুল হিন্দীভাষী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভৌগোলিক ও কিছুটা বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক মিল ছাড়া আর্থনীতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক বা আদর্শিক কোনই মিল নেই। সুতরাং বৃহত্তর

www.pathagar.com

ও শক্তিমান ভারতের সাথে তুলনামূলকভাবে গরিব, পশ্চাদপদ, ক্ষুদ্রায়তন, ভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন ও ক্ষুদ্র জনসংখ্যাসম্বলিত এ রাষ্ট্র তিনটির সার্ক থাকার পরও ভিন্ন উপ-জোট বাঁধার কোনই লাভ বা যৌক্তিকতা দেখা যায় না। শুধুমাত্র এর ফলে ভারতই একচেটিয়াভাবে লাভবান হবে এবং ভূ-কৌশল ও ভূ-রাজনৈতিকভাবে তার সকল বর্তমান অসুবিধা কাটিয়ে উঠে নিজ আঞ্চলিক আধিপত্য ও অবস্থানকে, স্বার্থ-সুবিধাকে আরো শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। উপ-জোটের প্রবক্তা ও সমর্থকদের 'অববাহিকা উন্নয়ন' বা 'Basin/ Watershed Development Block'-এর যুক্তিও ধোপে টিকে না। কারণ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা উন্নয়নের জন্য ঐ জোটে অববাহিকার অন্যতম শরিক চীন-এর অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য। কারণ ব্রহ্মপুত্র নদ চীনের তিব্বত প্রদেশের দীর্ঘ পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়েই ভারত ও বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উপরন্তু এদের কেউ কেউ সার্ক চুক্তির ৭নং উপধারার দোহাই পাড়ছেন। এ দোহাইও হালে পানি পাবে না। কারণ ভারতই ইতোপূর্বে সার্কের আওতায় গঙ্গার পানির হিস্যা সংক্রান্ত বিবাদ-মীমাংসায় শুধুমাত্র ভারত-বাংলাদেশ আলোচনায় অববাহিকার অন্যতম শরিক রাষ্ট্র নেপালকে অন্তর্ভুক্ত করার তীব্র আপত্তি জানিয়ে এসেছে। এখন সার্কের ঐ ৭ম ধারার দোহাই দেখিয়ে কিভাবে এ দ্বি-মুখীতাপূর্ণ উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করতে পারে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্যের জোটভুক্ত রাষ্ট্র ভারতের ঐ উদ্যোগকে অত্যন্ত উষ্ণভাবে অভিনন্দিত করেছে। খ্রিস্টবাদ ও মুক্ত অর্থনীতির ধারক বাহকরা তাদের 'অখণ্ড ভারত-নীতি'র স্বার্থে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্যকে মজবুতকরণ ও সম্ভাব্য চীনা কিংবা ভবিষ্যতের ইসলামী অভ্যুদয়, উত্থানকে রুখার উদ্দেশ্যেই এ উপ-আঞ্চলিক জোটকে এমন সমর্থন জানাচ্ছে যেখানে প্রখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হান্টিংটন-এর বিখ্যাত "Clash of Civilizations"-এর তত্ত্বের অদ্ভুত বাস্তবতার মিল পাওয়া যায়। আসলে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মুক্ত অর্থনীতির সমর্থক পুঁজিবাদী মিত্রগণ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের প্রভাববলয়কে আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যেই ভারতকে দিয়ে এমন একটি উদ্দেশ্যমূলক উপ-জোট গড়ে তুলছে। আর নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নে শংকিত ভারত ও যেকোন মূল্যে তার উত্তর-পূর্বাংশের সাথে (North-Eastern States) সংযোগ রক্ষা ও ট্রানজিট লাভ নিশ্চিত করার জন্য নিয়েছে এই মহা সুযোগটি। ❑

www.pathagar.com

৭

গণমাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ পরিপ্রেক্ষিত বিপন্ন বাংলাদেশ

ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বর্তমান বিশ্ব যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এক চরম উচ্চতর পর্যায়ে অবস্থান করছে ঠিক তখন বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র, পশ্চাদপদ, গরিব আর অনুন্নত দেশ ও জাতিসত্তাগুলোকে তাদের বিপন্ন সার্বভৌমত্ব আর সংকটাপন্ন সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক চরম অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্ষীণ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার এক করুণ সংগ্রামে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে। যদিও বর্তমান বিশ্বে 'গণতন্ত্রায়ন', 'মানবতাবাদ', 'মানবাধিকার', 'নারী মুক্তি', দারিদ্র্য বিমোচন' ও 'বিশ্ব পরিবার' প্রভৃতি নানা মনভরানো গালভরা বাণী ও শ্লোগান উচ্চারিত ও উচ্চকিত হচ্ছে নানা ফোরাম থেকে নানা আঙ্গিকে ও নানা ভঙ্গিতে। তবু এসবের সামান্য আড়ালেই চকিতে প্রকটিত হয়ে উঠছে বিশ্বশক্তিধর জাতি ও আগ্রাসী রাষ্ট্রসমূহের বহুমুখী আগ্রাসন, ত্রাসন আর শাসন-শোষণের ভয়াল স্বদন্তের হিংস্র ঘষটানি ও লোলুপ লোচনের জিঘাংসাভরা চাহনি। সারাবিশ্বকে এসব ক্ষমতাধর শক্তিমানরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে তাদের শাসন-শোষণকে পাকাপোক্ত ও স্থায়ী করার জন্য আজ "Uni-polar Global System" বা "New Economic World Order" চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে; উদ্যোগ নিয়েছে "মুক্ত অর্থনীতি" বা "Free Economy"-র নামে সারাবিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চাদপদ রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে ঐসব শোষিত জাতিসমূহের কোটি কোটি অনাহারক্লিষ্ট বনি আদমকে তাদের শিল্পের সহজলভ্য সস্তা শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করে এবং উৎপাদিত ঐ বিপুল পণ্যসম্ভারকে আবার ঐ দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহের বিশাল জনসংখ্যাসমৃদ্ধ বাজারে বিক্রি করে ধনিক রাষ্ট্র ও জাতিগুলো নিজেদের

www.pathagar.com

প্রচলিত পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী সমাজব্যবস্থাকে চালু রাখার। আর পাশ্চাত্যের এই নতুন এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার মুক্ত বাজার অর্থনীতির ভোগবাদী দর্শনের সুরক্ষা ও বিকাশের স্বার্থে তারা প্রথমেই তাদের নিকট ও দূর প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু-মিত্র নির্ধারণের উদ্যোগ নেয় এবং শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৌশল-প্রকৌশলে প্রাগ্রসর পাশ্চাত্য ও তার অনুগামী-সহগামী শক্তিরা সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, সম্পদ সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ, জাতি-তাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ধর্মতাত্ত্বিক তথা সাংস্কৃতিক সম্পর্কে সুসম্পর্কিত এবং ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থানে বা ভবিষ্যত সম্ভাবনায় উজ্জ্বল সমস্বত্ব একক জাতিসত্তা অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহই যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পাশ্চাত্য ও পুঁজিবাদী মিত্রদের সবচেয়ে যোগ্য ও ভয়ংকর ভবিষ্যত হুমকিস্বরূপ। পাশ্চাত্যের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও কৌশল গবেষণা কেন্দ্রসমূহের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফলাফল থেকে তারা বহুদিন আগেই ধরতে পেরেছিল যে, আদর্শিক দর্শন ও বুনিয়াদের গোঁজামিল, দুর্বলতা ও তাত্ত্বিকতার কূটতর্কের বহুমাত্রিকতা নানা জাতিসত্তার সংমিশ্রণের দানা বেঁধে ওঠা সমাজতান্ত্রিক পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া কোনক্রমেই টিকে থাকতে পারে না এবং সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থাও বেশিদিন বন্দুকের নল দিয়ে টিকিয়ে রাখা যাবে না। আর পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী মহলসহ আরো অনেক বিচক্ষণদের এ ধারণা আজ থেকে মাত্র ৬/৭ বছর আগে USSR ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজবাদী রাষ্ট্রমালার তাসের ঘরের মতে ভেঙ্গে পড়া থেকেই প্রমাণিত হলো। আর এরপরই U.S.A বা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী বিশ্ব "এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা"-র আওতায় বিশ্বের "মুক্ত অর্থনীতির" নাম দিয়ে এক "New Economic World Order" সৃষ্টির জন্য তৎপর হয়ে উঠে। আর তাদের ঐ নতুন আধিপত্যবাদী উদ্যোগের উদ্দেশ্য সাধনে Physical Agression বা "প্রত্যক্ষ আগ্রাসন"-র পরিবর্তে তারা একটি স্থায়ী, কার্যকর, নিরাপদ ও কম ঝামেলাপূর্ণ উপায় বা কৌশল হিসাবে বেছে নেয় 'সাংস্কৃতিক আগ্রাসন"কে। আর ঐ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা "Cultural Agression"-এর টেকনিক হিসাবে তারা সবচেয়ে উপযুক্ত ও কার্যকর "গণমাধ্যম" বা "Mass Media"–কেই বেছে নেয়। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রকৌশলের চরম বিকাশের যুগে "ইলেকট্রনিক মিডিয়া" যেমন টেলিভিশন, রেডিও, ডিস এ্যান্টিনা, সিনেমা এবং প্রিন্টেড মিডিয়া, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে খুব সহজেই যে কোন ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা,

www.pathagar.com

দর্শন-আদর্শ তথা জীবনাচরণ যে কোন দেশ, অঞ্চল বা জাতির মধ্যে বিশেষ করে নতুন এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রবেশ করানো যায় এবং ঐ মিডিয়া এ্যাপ্রোচে "সাংস্কৃতিক আগ্রাসন" বা কালচারাল এ্যাগ্রেশন খুব কার্যকরভাবেই বাস্তবায়িত করা যায়–অনায়াসে ও বিনা প্রতিরোধে। আগ্রাসী বা আধিপত্যবাদী শক্তি তাদের উদ্দেশ্য সাধনে আত্মসচেতন বা স্বকীয়তাপন্থি জাতিসত্তাকে তাদের অনুগত বা অধীন করার জন্য–প্রথমেই ঐ জাতির স্বকীয়তা, আত্মচেতনা, স্বাতন্ত্র্য, জাতীয়তা, ধর্ম, ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে বিনাশ বা ধ্বংস করে দেবার উদ্যোগ নেয়। কারণ আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শক্তি বা শক্তিসমূহ এবং তাদের অনুগামী ও সহগামী উপশক্তিসমূহ ভালোভাবেই জানে যে, যতদিন পর্যন্ত কোন দেশ বা জাতি নিজ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে বলীয়ান থাকে ততদিন পর্যন্ত ঐসব দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও পশ্চাদপদ জাতিসত্তাগুলোও স্বাধীনচেতা ও আত্মসচেতন থাকে। ধর্ম, ভাষা, নৃ ও জাতিতাত্ত্বিক ঐক্য, আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্যগত একাত্মতা বা Homogeneity-ই ঐসব ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীকে এমন আত্মমর্যাদায় বলীয়ান করে তুলে। ঐ সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক আত্মচেতনাই ক্ষুদ্র বিড়াল ছানার মত চেচেন জাতিকে তার তুলনায় বৃহদাকার শ্বেতভল্লুকসদৃশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক অচিন্ত্যনীয় অসম ইতিহাস সৃষ্টিকারি স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে ও বিজয়ী হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে এজন্যই আধিপত্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসররা সবচেয়ে বেশি ভয় করে এবং তা মুছে ফেলার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োজিত করা বর্তমানে অত্যন্ত সফল ও কার্যকর অস্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে "সাংস্কৃতিক আগ্রাসন" বা "Cultural Agression"কে। অত্যন্ত শঙ্কা ও দুঃখজনক হলেও একথা আজ দিবালোকের মত সত্যি যে, দক্ষিণ এশিয়ার ১২ কোটি জনঅধ্যুষিত বিশাল মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট ভূ-কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবদিক থেকে ভারতবেষ্টিত ভারত মহাসাগরের প্রবেশদ্বারের শরিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ আজ বৃহত্তর আগ্রাসী প্রতিবেশী ভারতসহ অন্যান্য নানা আধিপত্যবাদী শক্তির নানামুখী আগ্রাসনের শিকার। বর্তমানের আঞ্চলিক শক্তি ও ভবিষ্যতে, পরাশক্তি হবার উচ্চকাঙ্ক্ষী ভারত প্রত্যক্ষ ভূমিজ আগ্রাসন চালিয়ে বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূমি দঃ তালপট্টি, মুহুরীর চর, সিঙ্গার বিল, লাঠিটিল্লা দখল করে নিয়েছে; ধূর্ত কৌশলে বাংলাদেশের বেরুবাড়ি হাতিয়ে নিয়ে মাত্র "তিন বিঘা" করিডোরটিও

www.pathagar.com

আমাদের দেয়নি। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপথগামী বিচ্ছিন্নতাবাদী মুষ্টিমেয় কতিপয় তরুণকে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, আশ্রয় দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভারত আমাদের এক-দশমাংশ সার্বভৌম অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে পরোক্ষভাবেও তার আগ্রাসনের প্রমাণ রাখছে। ঐসব প্রত্যক্ষ আগ্রাসন বা "Physical Territorial Agression-এর সাথে ভারত একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী হুগলী দিয়ে প্রবাহিত করে বাংলাদেশের এককালের প্রমত্তা কীর্তিনাশা পদ্মাকে হত্যা করেছে এবং সাথে সাথে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব-দ্বীপ বাংলার চার কোটি মানুষের উপর চালিয়েছে এক নৃশংস পারিবেশিক আগ্রাসন বা পরিবেশ যুদ্ধ। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়ে এদেশকে পরিপূর্ণরূপে আর্থিক দিক দিয়ে ভারতের উপর নির্ভরশীল করে দেবার জন্য আমাদের সমৃদ্ধ কৃষিকে সমূলে বিনাশ করার জন্য ভারত নিয়েছে দীর্ঘমেয়াদী বিধ্বংসী পরিকল্পনা। বাণিজ্যিক আগ্রাসন ইতোমধ্যেই দেশের প্রায় সম্পূর্ণ বাজার অর্থনীতিই ভারতের কাছে হয়ে পড়েছে জিম্মি। ১৯৯৫-৯৬ সনে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের ভারতিয় পণ্য এই দেশে বাণিজ্য পায়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ ঐ হিসাবের শতকরা মাত্র ৪ ভাগ পণ্য ভারতে পাঠায়। ভারতের এইসব আগ্রাসনকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট, চট্টগ্রাম বন্দরের লীজ, "এশিয়ান হাইওয়ে" ও "সাব-রিজিওনাল কো-অপারেশন" ইত্যাদি নানা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত একটার পর একটা "ছিঁড়ে যাওয়া তসবি দানার মত বাংলাদেশের উপর ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য ভারত মহাসাগরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিলন কেন্দ্রের ভূ-কৌশলগত অত্যন্ত সংবেদনশীল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ভূ-খণ্ডটিকে স্থায়ীভাবে দখল করে নেয়া বা কব্জা করে নেয়া। আর এই জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক কৌশল হিসাবে ভারত ও তার পাশ্চাত্যের মদদদাতাগণ বেছে নিয়েছে বর্তমান বিশ্বের আগ্রাসন কৌশলের আধুনিকতর ও সবচেয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসূ টেকনিক "প্রচার মাধ্যমে আগ্রাসন" বা Media Agression.

"সংস্কৃতি" বা Culture হচ্ছে কোন জাতির স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক বৈশিষ্ট্যসমূহের সম্মিলিত রূপ। কোন সমস্বত্বা জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠের গড় জীবনাচরণ, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, ধর্ম, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়িঘরের ধরন ও নির্মাণ কৌশল, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও লৌকিক আচার-

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান সবকিছু মিলে ঐ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বা Culture সৃষ্টি হয়। ঐ সংস্কৃতি সতত চলমান, পরিবর্তনশীল। কখনো কোথাও বিকাশমান ও বর্ধিষ্ণু আবার অন্যখানে হয়তো ভিন্নতর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ক্ষয়িষ্ণু ও বিলীয়ান। সংস্কৃতি মানুষ ও তার সমাজকে পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও উন্নত করে। সংস্কৃতি ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধি ও উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। একদিকে সংস্কৃতি জাতিসমূহকে যেমন আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাশীল করে তুলে ঠিক তেমনি তা ব্যক্তি ও সমাজকে "রিফর্ম" বা সংস্কার করে সমৃদ্ধির দিকেও নিয়ে যেতে কাজ করে। সংক্ষেপে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায় "Culture is that what we do" অথবা "Culture is the man-made part of the environment." সংস্কৃতির অনুকূল প্রভাবের জন্য এতে অবশ্যই কল্যাণধর্মী ও আদর্শিক উপাদান বর্তমান থাকতে হবে। মোট কথা, উন্নয়ন প্রগতির ও স্বাতন্ত্র্যের উপাদানসমৃদ্ধ সংস্কৃতিই কোন জাতিকে টিকিয়ে রাখতে সবচেয়ে বেশি কাজ করে। আর এক্ষেত্রে কোন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম উপাদান ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি, সঙ্গীত, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, নীতি-নৈতিকতা, লোকাচার ইত্যাদির স্বতঃস্ফূর্ত অস্তিত্ব ও স্বকীয়তার ভূমিকা অপরিহার্য। কারণ, ঐসব উপাদান ঐ জাতিকে জোগায় স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা এবং করে তুলে মর্যাদাশীল স্বাধীনচেতা, বেপরোয়া আর নিয়ে চলে প্রগতি, সমৃদ্ধি ও জাগতিক উন্নতির দিকে। এই সংস্কৃতির অপসারণ, ধ্বংস বা বিচ্যুতি ঐ জাতিসত্ত্বাকে দুর্বল করে পরিণামে অন্য শক্তিশালী সংস্কৃতির সাথে একীভূত করে বিলুপ্ত বা নিঃশেষ করে দেয়। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন জাতিকে স্থায়ীভাবে গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করতে হলে ঐ জাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী যেমন ধর্ম, ভাষা, ঐতিহ্য চেতনা ইত্যাদি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে; ভুলিয়ে দিতে হয়–ঐ জাতির নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, আদর্শ আর অতীত-ইতিহাসকে। আর ঐ কাজে সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। প্রত্যক্ষ সমরে লোকক্ষয়, ধ্বংস ও তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় আগ্রাসী বা আধিপত্যবাদী শক্তিকে। তারপরও ঐ আগ্রাসন যদি বিজিতের সংস্কৃতিকে পরাভূত করতে না পারে তবে ঐ ভূ-খণ্ডগত যুদ্ধজয় হয় সাময়িক। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসনজাত বিজয় হয় স্থায়ী ও ফলপ্রসূ। তাই পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের ভূ-খণ্ডকে স্থায়ীভাবে নিজেদের প্রভাব বলয়ে বা দখলে নেয়ার জন্য আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিমা খ্রিস্টান জগত ও ভারত একদিকে যেমন এনজিও (NGO) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক

www.pathagar.com

আগ্রাসন জাল বিস্তার করে চলেছে ঠিক একই সঙ্গে ঐসব আধিপত্যবাদী শক্তি আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ "প্রচার মাধ্যম" বা "Media"-র সাহায্যে বাংলাদেশের জনগণের বিশেষ করে এদেশের নতুন প্রজন্মের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন বা "মগজ ধোলাই"-এর জন্য পরিচালনা করছে এক সর্বগ্রাসী "প্রচার মাধ্যম আগ্রাসন" বা "মিডিয়া এগ্রেশান"। প্রচার মাধ্যম আগ্রাসনের কৌশল হিসাবে তারা সফলভাবে ব্যবহার করে চলেছে একদিকে যেমন ঃ "প্রিন্টেড মিডিয়াভুক্ত" সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক ইত্যাদি-অন্যদিকে ঐ কাজে আরো দ্রুততর ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের "ইলেকট্রনিক মিডিয়াভুক্ত" টিভি চ্যানেলস, ডিশ এন্টেনা, রেডিও, ভিসিআর, ভিডিও ইত্যাদির মত আধুনিকতম উপায়-উপকরণসমূহ। আগ্রাসী শক্তিসমূহের "মিডিয়া" বা গণমাধ্যম আগ্রাসনের মূল টার্গেট এদেশের তরুণ সমাজ বা নতুন প্রজন্মকে মনোস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দুর্বল বা Cripple করে দিয়ে তাদেরকে স্বীয় ধর্ম, ভাষা, আদর্শ, মূল্যবোধ ও চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে ক্রমে ঐ তরুণদের মনে ইসলাম ও অন্যান্য স্বাতন্ত্র্যবোধক সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রতি এক বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা ঢুকিয়ে দেয়া ও একই সাথে পাশ্চাত্য বা ইসলাম-বিদ্বেষী সকল সংস্কৃতি এবং ভারতিয় সংস্কৃতির প্রতি তাদেরকে অনুরক্ত বা অনুরাগী করে তোলা।

প্রচার মাধ্যম আগ্রাসনের উদ্দেশ্য সাধনে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রবর্গ কখনো আলাদা আলাদা আবার কখনো সম্মিলিতভাবে ঐসব উদ্যোগ নিয়ে চলেছে। সংবাদপত্রকে তারা বেছে নিয়েছে - শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের মগজ ধোলাইয়ের মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে। মাত্র ৪/৫ বছরের মধ্যেই ভারত ও পাশ্চাত্যের (খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক ও ইহুদী লবির আর্থিক মদদপুষ্ট) আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সহায়তায় এবং তাদের নানা সংস্থা ও উৎসের মাধ্যমে (এনজিও, কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংস্থার ছদ্মাবরণে) তারা রাতারাতি প্রায় একশতেরও অধিক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন চালু করে। ঐসব "প্রিন্টেড মিডিয়া"-র প্রধান টার্গেট ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের ধারক ও বাহক শক্তি, সংগঠন ও এদেশের আলেম সম্প্রদায়। ঐসব সংবাদপত্রে নিরন্তর ছাপানো হচ্ছে ইসলাম, কুরআন, হাদিস ও আলেম সমাজ-বিরোধী অজস্র কাল্পনিক ও মনগড়া অথচ অত্যন্ত আকর্ষণীয় চাতুরীময় নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও সংবাদাদি। "ফতোয়াবাজি", নারী নির্যাতন, প্রতিক্রিয়াশীলতা, অন্ধতা, কুসংস্কার ইত্যাদি নানা শিরোনামে নানা বিষয়ে তারা প্রতিদিন লিখে চলেছে অত্যন্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণা-

www.pathagar.com

উৎপাদনকারি রচনাবলী। তাছাড়া বিবিসি, ভোয়া, সিএনএন, রয়টার, আকাশ বাণী, দূরদর্শনসহ নানা টিভি ও রেডিও চ্যানেল সব সময়ই বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি বিশেষ করে ইসলাম ও তার নানা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে উচ্চমানের বুদ্ধিবৃত্তিক বিভক্তি, বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টিকারি প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের আধিপত্যবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে তৎপর ও সোচ্চার ইসলামী চেতনা ও স্বকীয়তাকে দুর্বল ও ধ্বংস করে দিয়ে এদেশে পরোক্ষভাবে নিজেদের আগ্রাসন ও আধিপত্যকে পাকাপোক্ত করে নেয়া। ❑

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৮

দ্বিজাতি-তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা

যদিও মহামতি কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বিখ্যাত দ্বিজাতি-তত্ত্বের সাথে ভারতিয় উপমহাদেশের পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামের দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ঐ বাস্তবধর্মী তত্ত্বটি উপমহাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীকে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে সচেতন ও স্বাধীনতার স্বপ্নে সঞ্জিবীত করে তুলেছিল তবু আজকে এসব অঞ্চলের কতিপয় জ্ঞানপাপী ঐ প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার করে অত্যন্ত ধূর্ত বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার মাধ্যমে ইতিহাসকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে আমাদের নতুন প্রজন্মকে দারুণভাবে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট এবং হিমালয়ের মত সুপ্রতিষ্ঠিত যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস ভারতিয় উপমহাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য আর আত্মপ্রতিসার সংগ্রামের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-যাকে "ভারতের হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত" বলে আখ্যা দেয়া হত এবং যিনি ভারতিয় কংগ্রেসের একজন অন্যতম নেতাও ছিলেন–সেই জিন্নাহ মোহমুক্ত হয়ে অবশেষে উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত ভিন্নতার বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন এবং উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে তাঁর কালজয়ী "দ্বিজাতি-তত্ত্বটি" উপস্থাপন করেন। এ তত্ত্বটির মূল বক্তব্য হচ্ছে, "ভারতের বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছে ধর্মের মত একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক উপাদান। উপমহাদেশের হিন্দু এবং মুসলিম, এ দু'টি জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, জীবন ধারা, কৃষ্টি, বোধ-বিত্ত এবং চাওয়া-পাওয়া সবকিছুকেই সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর করে তুলেছে। কৃত্রিম আবেগ প্রসূত ঐক্যকে সাময়িক রাজনৈতিক কাজে

www.pathagar.com

ব্যবহার করা গেলেও রূঢ় বাস্তবতা ধর্মের এ বিভাজনকে কোনক্রমেই অতিক্রম করতে দেয় না। সুতরাং স্থায়ী শান্তির স্বার্থে উপমহাদেশের ধর্মভিত্তিক পারিসরিক রাজনৈতিক বিভাজন অপরিহার্য।" জিন্নাহ্‌র ভাষায় দ্বিজাতি-তত্ত্বের স্বরূপ এভাবে ফুটে উঠে ঃ

"We maintain and hold that Muslims and Hindus are two major nations by any definition or text of a nation. We are a nation of a hundred million and what is more, we are nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture... customs... history and traditions, aptitudes and ambitions. In short, we have our distinctive outlook on life and of life." (Hasan, 1945).

এ 'দ্বিজাতি-তত্ত্ব' ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি, যার প্রথম সূত্রপাত ঘটে কায়েদে আজমের তত্ত্বটি উপস্থাপনারও বহু আগে। ১৭৬১ সনের পানিপথের তৃতীয় মহাসমরে মহারাষ্ট্রের মারাঠা শক্তিপুঞ্জের নেতৃত্বে যখন ভারতের হিন্দু জাগরণের রূপায়ন বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সুদূর আফগানের আহ্‌মদ শাহ আবদালীর নেতৃত্বে নানা ভাষা আর নানা বর্ণ, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন হতবল ভারতিয় মুসলিম জনগোষ্ঠী স্বীয় অস্তিত্বের স্বার্থে আবার জীবনপণ যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দিয়েছিল ঐ হিন্দু পুনর্জাগরণ প্রক্রিয়াকে। এখানে, পানিপথের ঐ ইতিহাসে আমরা দ্বিজাতি-তত্ত্বের অস্তিত্ব দেখতে পাই। ধর্মের ভিত্তিতে ঐ মহাসমরে সুদৃঢ় পাঠানমুল্লুকের দুররাণী আর পাখতুনদের সাথে বাংলার বাঙালি মুসলমান, রোহিলাখণ্ডের আর অযোধ্যার মুসলমান, হায়দারাবাদের দক্ষিণী মুসলমান, কেরালার মুনলা মুসলমান এবং ভারত বর্ষের বিহারী, অহমি নানা জাতের নানা ভাষার ইসলামপন্থিদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে একাকার হয়ে যেতে দেখি। অবশ্য হাতে গোনা স্বার্থান্ধ ইব্রাহীম কার্দির মত ব্যতিক্রম সব যুগেই ছিল। ঠিক অন্যপক্ষে, মারাঠাশক্তির সাথে আমরা দেখি, "যবন-ম্লেচ্ছ" উচ্ছেদে একাট্টা হয়ে জাঠ, রাজপুত, মৈথিলী, কানাড়ি এমন কি বাঙালি-অহমী হিন্দুদেরও তুমুল ধর্মযুদ্ধে অংশ নিতে। ১৭৬১-এর পানিপথে এভাবে আমরা দ্বিজাতি-তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই।

www.pathagar.com

তার কয়েক বছর আগে ১৭৫৭-র পলাশীর প্রান্তরেও যে দ্বিজাতিত্ত্বের ছায়া ছিল না তা কেউই হলফ করে বলতে পারে না। বৃটিশ পক্ষের এদেশিয় দোসর জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভের চানক্য চাল শুধুমাত্র বৈষয়িক সম্পর্কোদ্ভূত ছিল তা বলা যায় না, কেননা পরবর্তীতে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্যদের বৃটিশ-তোষণ এবং বিনিময়ে বিদেশি বেনিয়া প্রভুদের "মুসলিম পীড়ন ও হিন্দু লালন" নীতি বাংলায় দ্বিজাতিত্ত্বের অস্তিত্বের জন্ম দেয়। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানরা তাদের স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার জন্যে আবার দ্বিজাতি-তত্ত্বকে প্রকৃতভাবে প্রকাশ করে মহামতি সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আজাদি আন্দোলনের উষালগ্নে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাষাণময় পাহাড়ি প্রান্তরে যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে বালাকোটের জিহাদের ময়দানে। ১৮৩০-'৩৫-এর এই জনজাগরণে পাঞ্জাবী, পাখতুন, বাঙালি, বিহারী মুপলা, সিন্ধি আর বালুচী, আহমী, ভারতের সকল ভাষা, বর্ণ আর অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র তৌহিদী চেতনায় একতাবদ্ধ হয়ে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে রত হয়েছিল। ব্রিটিশ বিতাড়নের ঐ মহাসংগ্রামে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানরা একাকার হয়ে গেলেও ভারতবর্ষের হিন্দু জনগোষ্ঠীকে তখন পুরোপুরি দেখতে পাই শত্রুপক্ষে। শিখরা তো আগাগোড়াই ইংরেজদের হয়ে "যবন নিধনে নিয়োজিত" ছিল। এখানেও তো দেখা যায় দ্বিজাতি-তত্ত্বেরও বেশি। এই ঘটনার প্রায় দেড়শত বছর পর, এই সেদিন মাত্র–যখন "ধর্মনিরপেক্ষ" (?) ভারতের হিন্দু সৈন্যরা শিখ জাতির কা'বা স্বরূপ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে 'Operation Blue Star' নামক অভিযান চালিয়ে পবিত্র শিখ তীর্থকে গুঁড়িয়ে দেয় তখন ভারতের অন্যতম সাংবাদিক,লেখক ও বুদ্ধিজীবী খুশওয়ান্ত সিংকে সক্ষেদে বলতে শুনি "... আসলে ভারতে দ্বিজাতি-তত্ত্ব নয় .... ত্রি-জাতি তত্ত্ব কিংবা বহুজাতি তত্ত্বই বাস্তব সম্মত ....." (Illustrated Weekly of India, 1984)। শিখ বুদ্ধিজীবী খুশওয়ান্ত সিং-এর এই ঘোষণার বহু পূর্বেই বাঙালি মুসলমানের অবিসংবাদিত নেতা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান ও মাওলানা ভাষানীও দ্বিজাতি-তত্ত্বের যথার্থতাকে স্বীকার করে তা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন। এমন কি তারাও বিশ্বাস করতেন এখানে এই উপমহাদেশে দ্বিজাতি-তত্ত্ব ছাড়াও বহু জাতি-তত্ত্ব বিরাজ করছে (Hashem, 1974)। তাই আমরা দেখতে পাই

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দী আর তাঁর শিষ্য শেখ মুজিবুর রহমান এমনকি মাওলানা ভাসানীর মত উদারপন্থি বাঙালি মুসলমান নেতৃবৃন্দকে কায়েদে আজমের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমা স্বৈর-শাসক ও লুটেরা আধিপত্যবাদীদের স্বার্থপরতা, শোষণ ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এক যথার্থ ও বাস্তবসম্মত উদ্যোগে তৎপর হয়ে ওঠে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রস্তাবিত ১৯৪০ সালের "লাহোর প্রস্তাব"-এর রূপরেখায়ই চিত্রায়ন ছিল এবং কোনক্রমেই তা জিন্নাহর দ্বিজাতি-তত্ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, এই দ্বিজাতি-তত্ত্ব ভুল হলে বাংলাদেশ এতদিন "ধর্মনিরপেক্ষ" (?) ভারতে লীন হয়ে যেত। বাঙালি মুসলমানরা প্রথমে পাকিস্তানে এবং পরে স্বাধীন বাংলাদেশে সার্বভৌম সত্তায় আত্মপ্রকাশ করে। এ দেশের কোন নেতা বা এখানকার ৯৯.৯৯% জনগোষ্ঠীই কোন সময়েই নিজ অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে ভারতে মিশে যাবার কল্পনাও করেনি। একই সাথে জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি-তত্ত্বটির বাস্তবতার সাক্ষী হয়ে ভারতবর্ষের হিন্দু বাঙালিরা আজও হিন্দুস্তানের একটি পশ্চাদপদ প্রদেশ হিসাবে পরম শান্তিতে (?) মুখ বুঁজে "হিন্দি-প্রভাবিত ব্রাহ্মণ্যশক্তি ভারতের অংশ" হিসাবে বসবাস করে আসছে। সেখানে ২১ ফেব্রুয়ারি থাকলেও কোন ভাষা দিবস নেই। মারোয়ারী আর ইউপিওয়ালাদের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রচণ্ড আগ্রাসনের মুখেও তারা শুধুমাত্র পবিত্র হিন্দুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আজ "সাপ্তাহিক (পাক্ষিক?) দেশ" "আনন্দবাজার" ও "যুগান্তর"-এর অন্তরে তাদের বাঙালিত্বকে অন্তরীণ করে টিকে রয়েছে। এদেশের জ্ঞানপাপী কতিপয় একজাতিবাদী অসাম্প্রদায়িক (নাকি ইসলাম বিদ্বেষী?) নামধারী বুদ্ধিজীবী (স্বার্থজীবী) রা কি একবারও ভেবে দেখেন না যে, যদি জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি-তত্ত্ব ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ হত তবে কবেই "এপার বাংলা" "ওপার বাংলা" একাকার হয়ে যেত এবং বাঙালি জাতি '৪৭-এর ভুল কে শুধরে নিতে কবেই মহা তৎপরতায় দ্বিজাতি-তাত্ত্বিক সীমানাকে "রাবার দিয়ে" মুছে ফেলতো এবং তাদের স্বপ্নের "স্বাধীন বঙ্গভূমি" নয়তো "মহাভারতবর্ষ" রচনা করতো। না, তাঁদের সে স্বপ্ন দুঃস্বপ্নই রয়ে গেছে এবং চিরদিনই মরীচিকা হয়ে থাকবে। কারণ, ধর্ম নামের সবচেয়ে শক্তিমান সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা অত্যন্ত শক্তভাবে এখানে সীমারেখা টেনে দিয়েছে। এ সীমারেখা এমনই শক্তিশালী এবং এর মূল এমনিই সুগ্রোথিত যে সত্তর কিংবা

www.pathagar.com

শত বছরের লৌহ যবনিকার সমাজতান্ত্রিক বার্লিন প্রাচীর চুরমার হয়ে গেলেও আজও ধর্মের সীমানার বসনিয়া, চেচেনিয়া কিংবা কাজাখিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক সীমানাগুলো স্বাধীন সত্তায় বেরিয়ে ইসলামী ঐক্যে একীভূত হয়ে চলেছে। ঠিক একইভাবে ধর্মের ভিত্তিতেই জায়নিস্ট ইহুদীরাষ্ট্র ইজরায়েল অস্তিত্বের সংগ্রামে নিয়োজিত। খ্রিস্টান হয়েও সুসভ্য (?) ইউরোপের ক্যাথলিক-প্রোটেস্টানদের দ্বিজাতি-তত্ত্বে বিভক্ত হয়ে রয়েছে আয়ারল্যান্ড ডাবলিন ও বেলফাস্টে। ধর্মনিরপেক্ষ (?) ও গণতন্ত্রী ভারতের খালিস্তান ও কাশ্মিরে শিখ ও মুসলিম আজাদিকামীদের রক্ত ঝরছে; হিন্দু-স্বয়ং সেবক ও হিন্দু রাম রাজ্য পন্থিদের ধর্মোন্মাদনায় আজও গুড়ো হচ্ছে অমৃতসরের শিখ গুরুদ্বোয়ারা কিংবা মুসলিম বাবরী মসজিদ। আর তাই, এই দ্বিজাতি-তত্ত্বের কারণেই অস্তিত্বমান আমরা, বাংলাদেশিরা, স্বাধীন সার্বভৌম সীমানার মধ্যে হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই সাম্য-মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ। কোন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাই আমাদের বাস্তবসম্মত ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারবেনা।

www.pathagar.com

Figure 1 : Location Map of South Asia & Bangladesh

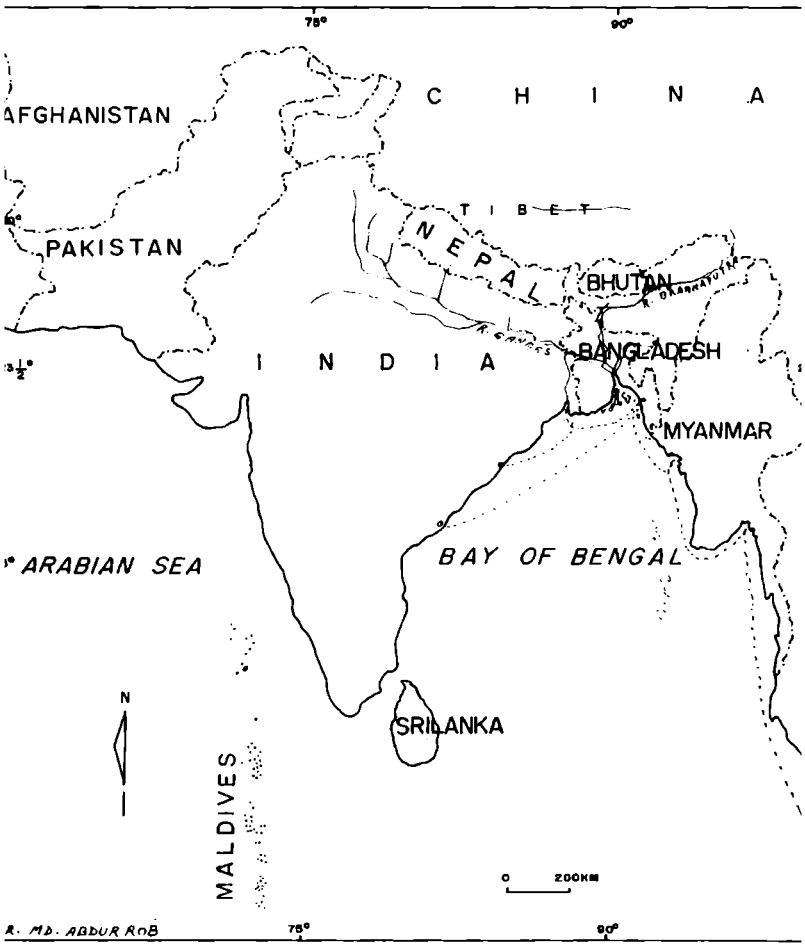

www.pathagar.com

Figure 3 : Location of Chittagong Port

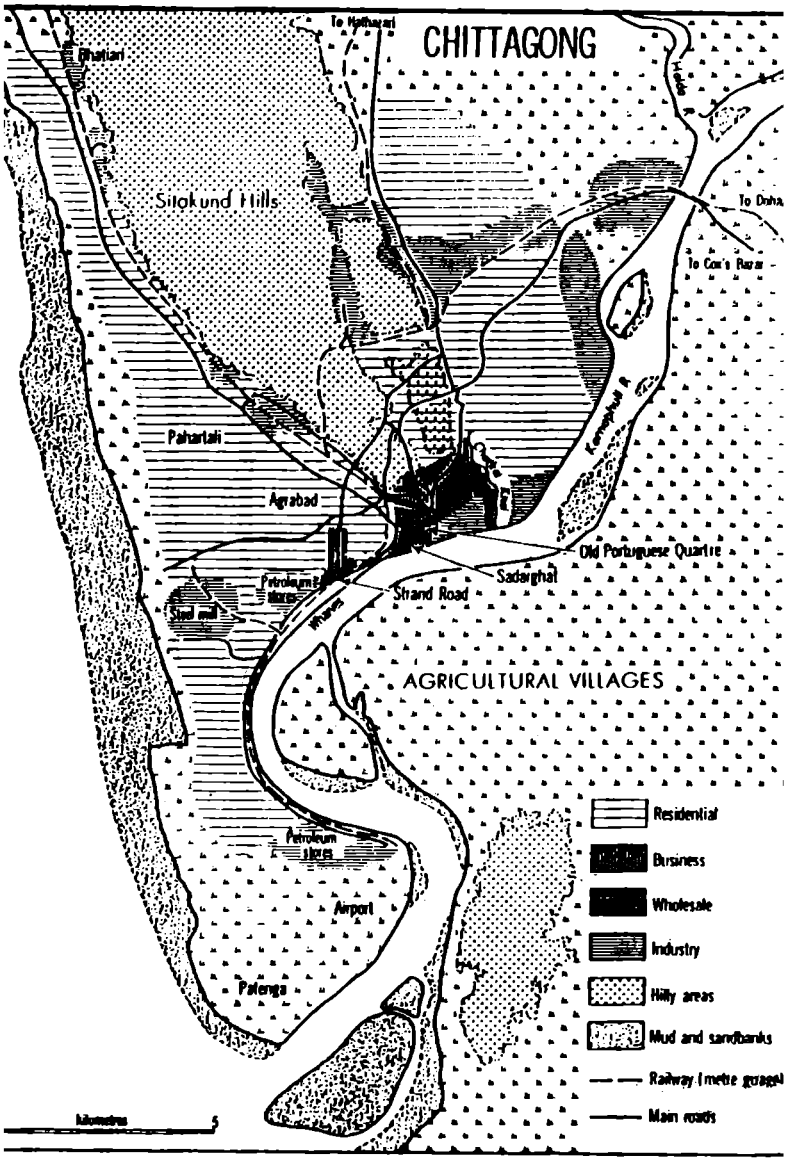

www.pathagar.com

Figure 5 : Changed or New Route Map of Asian Highway

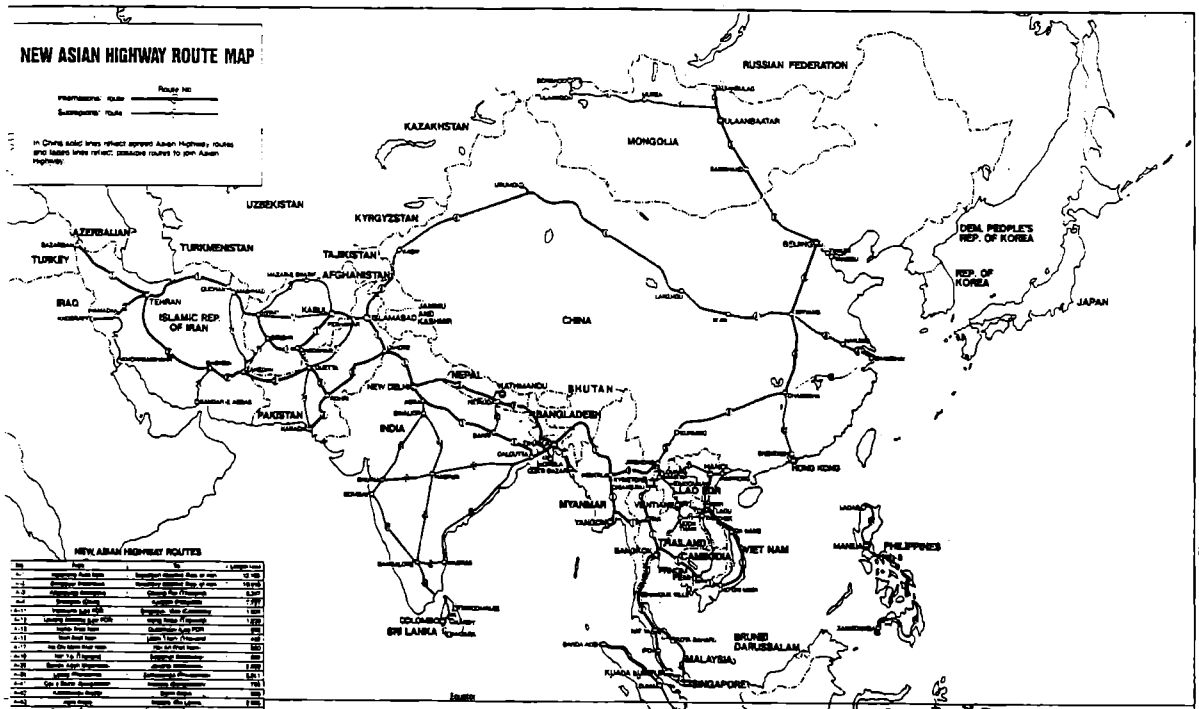

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মধ্য-স্রোত পদ্ধতি

ভারতের মধ্য-রেখা পদ্ধতি

www.pathagar.com

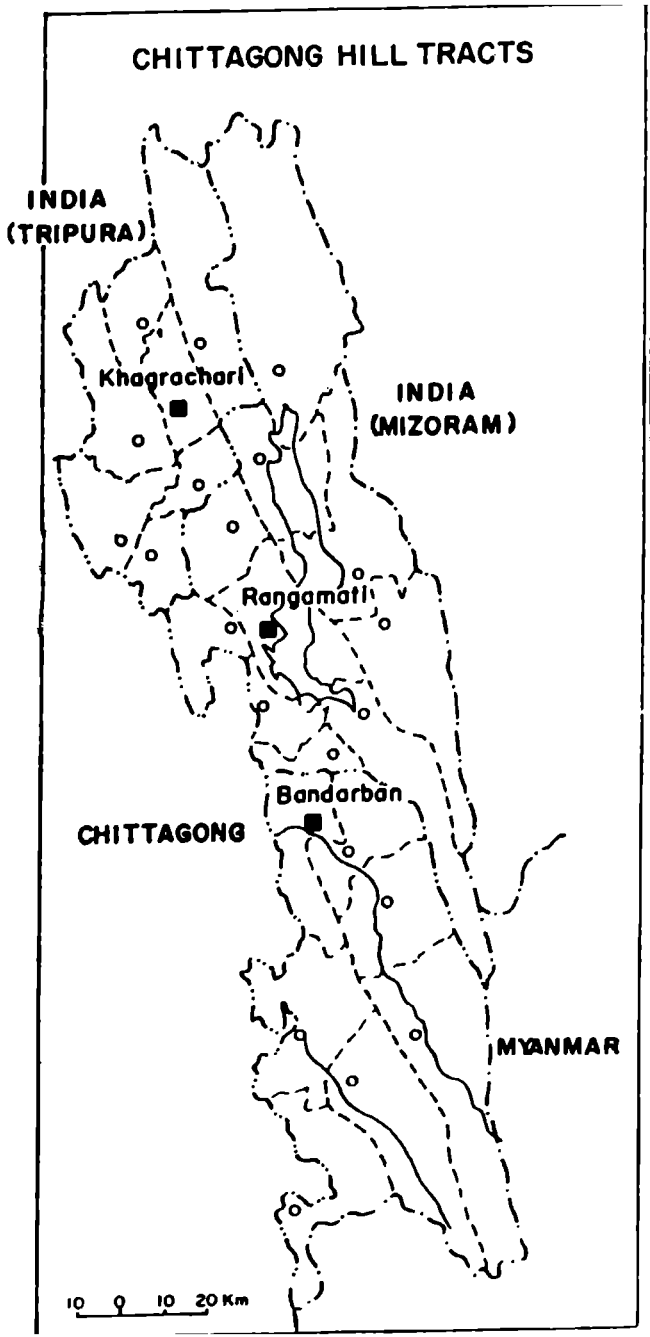

www.pathagar.com

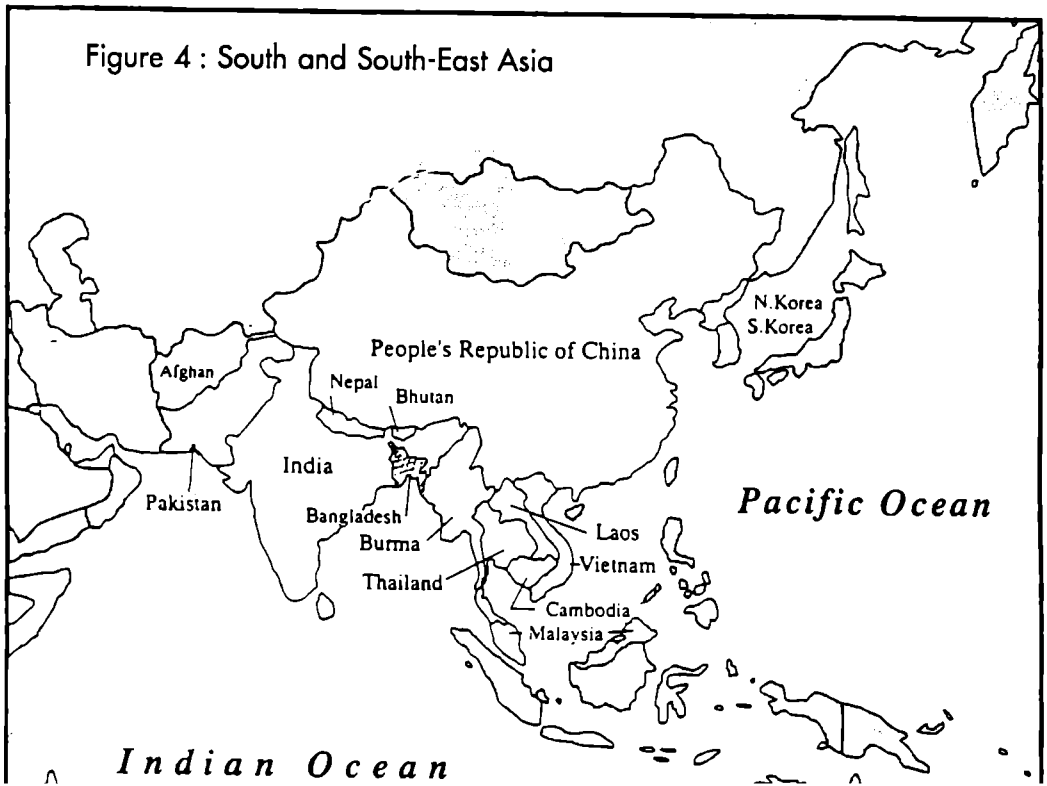

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ আবদুর রব সিলেটের ঐতিহাসিক 'দি এইডেড মাল্টিলেটারেল হাই স্কুল' ও 'সিলেট সরকারি এম.সি. কলেজ' থেকে তাঁর প্রারম্ভিক লেখাপড়া সম্পন্ন করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল বিষয়ে বি.এসসি. (সম্মান) ও এম.এসসি. (থিসিস) ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ভারতের বিখ্যাত আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে যথাক্রমে১৯৮৯ এবং ১৯৯২ সালে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি নেন। জীবনের সব ক'টি প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিতেই ডঃ রব প্রথম শ্রেণীর ফলাফল লাভ করেন। তাঁর পিএইচ.ডি. থিসিসের বিষয় ছিল "FLUVIAL GEOMORPHOLOGY OF THE GANGETIC DELTA"। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভূগোলবিদ ডঃ রব দেশ-বিদেশের বহুসংখ্যক জার্নালে গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিককালে তিনি দেশের বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় পরিবেশ এবং ভূ-রাজনীতির উপর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করে চলেছেন। তাছাড়া বাংলা একাডেমী থেকে তার একখানা গবেষণাধর্মী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং একই প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর অন্য-আর একখানা বই প্রকাশের পথে।

ISBN 984-31-0583-4